দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ
১৩৭৬

দাম সাড়ে পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদপট
তরুণ দাস

প্রকাশক
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা-৭

মুদ্রক
পরেশচন্দ্র বসু
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১/১ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী

মুখবন্ধ

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী একটি বিশেষ মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আমাদের নিজেদের কৃতার্থ বোধ করছি। কারণ, যাঁরা মহাপুরুষ, যাঁরা জাতীয় জীবনকে বহুল ভাবে উন্নত করেছেন, যাঁদের অনির্বাণ আদর্শের আলোকে আমাদের তমিস্রাচ্ছন্ন জীবনপথ নিত্যই আলোকিত হয়ে উঠেছে, তাঁদের পুণ্য নাম, ধন্য জীবন, অনন্য চরিত্র স্মরণে মননে অনুসরণে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত উদ্বুদ্ধ উৎসাহিত হই। এরূপই একজন মহাপুরুষ ছিলেন সর্বজনপরিচিত সর্বজনপ্রিয় সর্বজনবরেণ্য দ্বারকানাথ—যাঁর বিবিধ বিচিত্র অভিনব সাহস পুণ্য সুবুদ্ধিপ্রসূত কার্যকলাপে দেশ নূতন পথের সন্ধান লাভ করেছিল, নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল, নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল, নূতন ব্রতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, নূতন সিদ্ধিতে বিমণ্ডিত হয়েছিল। আজকের নানা সমস্যাসঙ্কুল, উদ্বেগাকুল পরিস্থিতিতে বর্তমান জীবনীগ্রন্থটির প্রয়োজন নিঃসন্দেহে সমধিক।

'দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী' গ্রন্থটির প্রাচীন পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে আসে। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর পূর্বপুরুষের প্রসঙ্গে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করে এই জীবনী রচনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তাঁর এই পাণ্ডুলিপিটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রকাশের জন্যে শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ও রবীন্দ্রভারতীর তৎকালীন উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন। তাঁদের নির্দেশানুসারে এই জীবনীগ্রন্থটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারী অর্থানুকূল্যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় গ্রন্থের সুলভ মূল্য-নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
জোড়াসাঁকো

রমা চৌধুরী
উপাচার্যা

ভূমিকা

বর্তমান গ্রন্থখানির প্রকাশনের পেছনে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। সেটি দিয়ে এই ভুমিকার সূত্রপাত করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর সত্ব অধিকার ক'রে যখন সেখানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় তখন একে একে ঠাকুর পরিবারের বিভিন্ন শাখা সেখান হতে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তাদের অন্যতম ছিল বর্তমান গ্রন্থের লেখক ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার। একটি মানুষ নিয়েই তখন সেই পরিবার গঠিত ছিল। তিনি হলেন গ্রন্থকারের বিধবা পুত্রবধূ শ্রীমতী মেনকা ঠাকুর। তাঁর বদান্যতা উল্লেখযোগ্য। পারিবারিক আবাস ছেড়ে চলে যাবার সময় তিনি ক্ষিতীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত নানা পারিবারিক তথ্য এবং তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারখানি রবীন্দ্রভারতীকে দান ক'রে যান। ঠাকুর পরিবারের মানুষ হয়ে পরিবার সম্পর্কিত তথ্যের সংগ্রহশীল তাঁর মত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখা যায় না। তাঁর সংগৃহীত তথ্যগুলি তাঁর ইতিহাসে অনুরাগ ও নির্বাচন দক্ষতার সুন্দর পরিচয় দেয়। সেগুলি এখন রবীন্দ্রভারতীর প্রদর্শশালায় সযত্নে রক্ষিত। তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থগুলি সংখ্যায় কয়েক হাজার ছিল। তাতে অনেক দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান পুস্তক আছে। ম্যাকস মূলার কৃত ঋগবেদের অনুবাদ তার অন্যতম। এই গ্রন্থগুলি একটি পৃথক সংগ্রহের আকারে রবীন্দ্রভারতীর গ্রন্থালয়ে রক্ষিত আছে।

শ্রীমতী মেনকা ঠাকুর যে সব কাগজপত্র দিয়ে যান তার মধ্যে বর্তমান গ্রন্থখানির মুল রচনা এবং প্রকাশনের জন্য একটি পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়। তার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হতে দেখা যায় সেটি রচনা হয়েছিল ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু কেন যে সেটি এতকাল প্রকাশিত হয় নি তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি! সে যাই হক তার বিষয় বস্তু হলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বিশিষ্টতম পূর্বপুরুষ এবং লেখক হলেন তাঁরই উত্তর পুরুষদের মধ্যে একজন। একদিকে বিষয়ের এইভাবে যেমন গুরুত্ব আছে অন্য দিক হতে গ্রন্থখানির তথ্যগত মূল্যও যথেষ্ট। এইসব কারণ বিবেচনা ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের

কর্তৃপক্ষ গ্রন্থখানি প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারই ফলে গ্রন্থখানি রচনার দীর্ঘকাল পরে আজ প্রকাশ হতে চলেছে।

মহর্ষির তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ অকালে আকস্মিক ভাবে অনেকগুলি পুত্র কন্যা রেখে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁদের তিনটি পুত্র হলেন হিতেন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথ। ক্ষিতীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে। তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ছিলেন আজীবন সাহিত্যসাধক। অবশ্য সেকালে ঠাকুর পরিবারের প্রায় সকলেই সাহিত্যচর্চা করতেন। তবে মনে হয় তাঁর সাহিত্যে অনুরাগ খুবই গভীর ছিল, কারণ দেখা যায় সংখ্যার দিক হতে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরেই সম্ভবত তাঁর স্থান হয়। দেখা যায় বর্তমান গ্রন্থখানি ছাড়া তিনি ত্রিশখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত ভাষণের পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত সংখ্যা হল চল্লিশ। তাঁর রচনার বিষয়ও ছিল বহু এবং বিচিত্র। কাব্য, সন্দর্ভ, ধর্ম, ইতিহাস, শিক্ষা, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি হল তার বিষয়। দেখা যায় তাঁর রুচি বহুমুখী ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে: 'ব্রাহ্মধর্মের বিবৃতি', 'আত্মধর্ম ও অজ্ঞেয়বাদ' 'ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃতি' 'আর্য ও সাহিত্য', 'আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ'। এ হতেই তাঁর গ্রন্থগুলির আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপকতা বেশ পরিস্ফুট হবে।

দ্বারকানাথ ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের তিন দিকপালের অন্যতম। তিন পুরুষে এই পরিবারের তিনটি মানুষকে কেন্দ্র ক'রে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন আবর্তিত হত। তাঁরা হলেন যথাক্রমে দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। দ্বারকানাথ দুই যুগের সন্ধিক্ষণের মানুষ। এ বিষয় বাংলা দেশে তাঁর ভূমিকা খানিকটা রামমোহনের সঙ্গে তুলনীয়। সেকাল নিজেকে লুকিয়ে তখন চলতে শুরু করেছে এবং একালের পথ প্রস্তুত হচ্ছে। বাংলার তথা ভারতের আধুনিক যুগের প্রবর্তনে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। শুধু তাই নয় তাঁর চরিত্রে নানাগুণের সমাবেশ, তাঁর ক্রিয়াক্ষেত্রের ব্যাপকতা এবং সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁকে অনন্য সাধারণ ক'রে গড়ে তুলেছিল। এহেন মানুষের জীবনী নিয়ে ব্যাপক আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাঁর সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

হল কিশোরীচাঁদ মিত্র রচিত তাঁর জীবনী। ক্ষিতীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে তিনি তাঁর গ্রন্থে নূতন ভাবে আলোকপাত করেছেন। দ্বিতীয়ত এ বিষয় সম্বন্ধে তিনি যে তথ্য সংগ্রহ ক'রে রেখে গেছেন তা বিশেষভাবেই উত্তরপুরুষের মূল্যবান উত্তরাধিকার হিসাবে বিবেচিত হবার যোগ্য।

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রথম বৈশিষ্ট্য হল তা পরিবারেরই একজন উত্তরপুরুষ রচিত পরিবারের বিশিষ্ট পূর্বপুরুষের জীবনী। যে দৃষ্টি কোণ হতে তা লেখা হয়েছে পরিবারের বাহিরের মানুষের রচনায় তা পাওয়া সম্ভব নয়। তাতে পাই দ্বারকানাথের উদ্দেশে নিবেদিত তাঁরই উত্তরপুরুষের শ্রদ্ধাঞ্জলি। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই গ্রন্থে দ্বারকানাথের জীবনী সমকালীন পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে আলোচনা হয়েছে। মানুষ অনেকখানি তার পরিবেশের দ্বারা প্রভাবান্বিত। তাকে ভালো ক'রে বুঝতে হলে তার পরিবেশের সহিত যুক্ত করেই তার আলোচনা প্রশস্ত। এই নীতি এখানে পালিত হয়ে গ্রন্থের উৎকর্ষ সাধন করেছে। তৃতীয়ত এই গ্রন্থের আলোচনার ক্ষেত্র খুব ব্যাপক। দ্বারকানাথের বহুমুখী প্রতিভার নানা সম্ভাব্য ক্ষেত্র হতে সংগৃহীত হয়ে এখানে স্থাপিত হয়েছে। এই গ্রন্থ হতে আমরা জানতে পারি তিনি প্রথম 'জাষ্টিস অফ দি পিস' হয়েছিলেন, জানতে পারি সতীদাহ প্রথা বিলোপে তাঁরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

এত যত্ন সত্বেও মনে হয় দ্বারকানাথের জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় গ্রন্থে স্থান পায় নি। তাদের মধ্যে কিছু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেকালের সামাজিক জীবনে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য সাধারণ। ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে তিনি সমান জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর বাগান-বাড়ীর উৎসব সেকালে স্মরণীয় ঘটনা। তাঁর নানা জনহিতকর কাজে দানও তাঁকে বিশেষ জনপ্রিয় করেছিল। সব থেকে লক্ষণীয় অনুল্লেখ হল তাঁর প্রবাসে যাপিত শেষ জীবনের কথা। তিনি শেষ জীবনে দুবার বিলাতে যান এবং সেখানেই ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট দেহরক্ষা করেন। সেখানে প্রথমবার যাবার পর তিনি যে অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তা সেকালের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতীয় প্রজার পক্ষে পাওয়া দুর্লভ বস্তু ছিল। তিনি যে সমাদর পান বর্তমান যুগে ক্ষমতাবান জাতির প্রতিনিধির পক্ষেও তা দুর্লভ। সে বিষয়ে তিনি অনেক তথ্যও সংগ্রহ করেছিলেন; কিন্তু কেন যে তা তাঁর

গ্রন্থে ব্যবহার করলেন না বোঝা যায় না। সে যাই হক এই অনুল্লেখ সত্ত্বেও তাঁর এই 'দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী' গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদর লাভের যে যোগ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
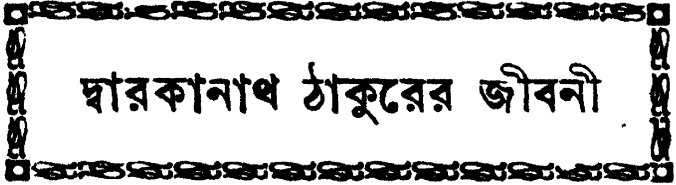
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

পুষ্পরাগ
১ বালিগঞ্জ টেরেস, কলিকাতা-১৯

সূচীপত্র

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঠাকুর পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফী 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' এবং 'পীরালীদিগের ইতিহাস' নামক যথাক্রমে স্বরচিত গ্রন্থদ্বয়ে পীরালীদিগের বিস্তারিত বংশবিবরণ প্রকাশ করিবেন বলিয়া আমাকে আশ্বাস দিয়াছেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থের এক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে এবং শেষোক্ত গ্রন্থ এখনও রচনাধীন। আমরা নিশ্চিন্তমনে তাঁহাদের গবেষণার ফল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারি। বর্ত্তমানকালে ইতিহাস ও জীবনচরিত লেখকগণ গবেষণার মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন, তাহাতেই আশা করা যায় যে তাঁহাদের পুস্তকে উল্লিখিত ঘটনাগুলি অনেকাংশে নির্ভুল হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইতিপূর্ব্বে যে সকল বঙ্গীয় ইতিহাস লেখক অথবা জীবনী সংগ্রহকার আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ পুস্তকই ভ্রান্তপ্রমাদে পরিপূর্ণ। সেই সকল পুস্তক অবলম্বন করা অন্ধ কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের ন্যায় কার্য্য হইবে। একটি দৃষ্টান্ত সম্মুখে পড়িল, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করিব। লেখকের পূজ্যপাদ পিতামহদেব শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আট পুত্র ও পাঁচ কন্যা, তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্রের বাল্যকালেই দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। ৺লোকনাথ ঘোষ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ভারতীয় জমিদার' প্রভৃতির বংশাবলী বিষয়ক পুস্তকে[১] দেবেন্দ্রনাথের পাঁচ পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বারকানাথের মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথের দুই পুত্র সত্ত্বেও তাঁহাদের নাম

১ The Modern History of the Indian Chiefs and Rajas, Lokenath Ghose Part II—1881, Cal.

উল্লিখিত হয় নাই। অথচ এইরূপ গ্রন্থসকল ভবিষ্যতে বংশাবলী সংগ্রহে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে। যেখানে জিজ্ঞাসামাত্রে সত্যলাভ সম্ভব ছিল, সেখানে এরূপ ভ্রম নিতান্ত দোষাবহ বিবেচনা করি।

যখন এত নিকটের ঘটনায় এত ভ্রম, তখন সেই সুদূর ভট্ট-নারায়ণের সমকালীন ঘটনাবলী লইয়া যে বাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা থাকিবে, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। প্রশ্ন এই যে সর্ব্বপ্রথম কোন্ কোন্ ব্রাহ্মণ আদিশূরের রাজত্বকালে গৌড়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কাহারও মতে ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধাতিথি ও সৌভরি এই পঞ্চব্রাহ্মণ এবং কাহারও মতে ইহাঁদের যথাক্রমে স্বস্ব পুত্র ভট্টনারায়ণ, শ্রীগর্ষ, দক্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভ—এই ব্রাহ্মণপঞ্চক কান্যকুব্জ হইতে আহূত হইয়া প্রথম গৌড়ে আসেন। আমাদিগের আলোচনার ফলে অনুমান হয় যে প্রথমোক্ত পঞ্চব্রাহ্মণই সর্ব্বাগ্রে গৌড়দেশে আহূত হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক যে কোন্ রাজার রাজত্বকালে তাহার নির্ণয় হয় না। কাহারও মতে রাজস্থূয় যজ্ঞ, কাহারও মতে অনাবৃষ্টি নিবারণ পূর্ব্বক বৃষ্টি আনয়নকারী যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য ক্ষিতীশ প্রভৃতি রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিলেন।[২] আদিশূরই যে ক্ষিতীশ প্রভৃতিকে আনাইয়াছিলেন, তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে রাজার কালেই তাঁহারা আগমন করুন না কেন, সম্ভবত কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়াই তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল, অথবা তাঁহাদের যজ্ঞের বিশেষ কোন ফল দৃষ্ট না হওয়াতে তাঁহাদের খ্যাতিলাভ ঘটে নাই। পুত্রেষ্টিযাগ সমাধার জন্য যে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, ইহা প্রায় সর্ব্ববাদ সম্মত। এই পঞ্চব্রাহ্মণের আবির্ভাব যে দ্বিতীয় আবির্ভাব তৎসমর্থক একটি শ্লোক পাওয়া যায়—তাহাতে 'পুনরায়' ব্রাহ্মণ প্রেরণ

২ কল্পনা—ষষ্ঠ বৎসর ১ম ও ২য় সংখ্যা—শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিত বংশাবলী প্রবন্ধ দেখুন।

করিবার প্রার্থনা উল্লিখিত আছে।[৩] পুত্রেষ্টির পর রাজা আদিশূরের মহিষী সুপুত্র প্রসব করাতে শেষাগত পঞ্চব্রাহ্মণের যশোবিস্তার ঘটিল। ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিই এই শেষাগত পঞ্চব্রাহ্মণ। ভট্টনারায়ণ ক্ষিতীশের পঞ্চম পুত্র, অপর চার পুত্রের নাম দামোদর, শৌরী, বিশ্বম্ভর এবং শঙ্কর।[৪]

ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি শেষোক্ত পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনকাল লইয়াও বিস্তর বিরোধ দৃষ্ট হয়। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে আছে যে ৯৯৯ শতাব্দে ব্রাহ্মণপঞ্চকের আগমন ঘটিয়াছিল।[৫] সম্বন্ধনির্ণয়কার নানা সুযুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বলেন যে ৯৯৯ শতাব্দের অর্থে ৯৯৯ সম্বৎ বুঝিতে হইবে। মোটের উপর বলিতে পারি যে বিদ্যানিধি-প্রদর্শিত যুক্তিগুলি অসঙ্গত বোধ হয় না।[৬] আমরা একটি যুক্তি এইখানে উল্লেখ করিব। সম্বতের সহিত শকের অন্তর ১৩৫ এবং সম্বতের সহিত খৃষ্টাব্দের অন্তর ৫৭ বৎসর। এই হিসাবে আদিশূরের পুত্রেষ্টির বৎসর ৯৯৯ সম্বৎ ধরিলে ৯৪২ খৃষ্টাব্দ হয়। আইন-ই-আকবরীর মতে

নৃপতি সুকৃতিসারঃ স্বীয় বংশাবতারঃ
প্রবল বলবিচারো বীরসিংহোঽতিধীরঃ।
ময়ি বর্ষিতবান্ তে ভূমিদেবান্ সভৃত্যান্
পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং নিতান্তম্॥ কল্পনা—৬ষ্ঠ বৎসর—২য় সংখ্যা।

শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপো বাৎস্যো ভারদ্বাজস্তথাপরঃ।
সাবর্ণিঃ কথিতাঃ পূর্ব্বং গোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
তত্রাদৌ সর্বতো মন্যঃ শাণ্ডিল্যো মুনিসত্তমঃ।
তত্র জাতঃ কলিব্যাসো বেদব্যাস ইবাপরঃ॥
তৎসুতো বামদেবোঽভূন্মহাদেবশ্চ তৎসুতঃ।
ক্ষিতীশস্তস্য পুত্রোঽভূদাগতো গৌড়রাজ্যকে॥
তস্যামী বহবঃ পুত্রা জাতাঃ সর্বগুণান্বিতাঃ।
দামোদরস্তথা শৌরী বিশ্বম্ভর উদারধীঃ।
শঙ্করো লোকবিখ্যাতো ভট্টনারায়ণোঽপি চ॥
সম্বন্ধনির্ণয়োদ্ধৃত কুলরমার বচন। ২য় সং—২৯২ পৃঃ

৫ শ্রীমদাদিশূরো নবনবত্যধিকনবশতীশতাব্দে পঞ্চব্রাহ্মণানানয়ামাস।

৬ পণ্ডিত শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত সম্বন্ধনির্ণয়—২য় সংস্করণ ২১৩ পৃষ্ঠা।

১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালের রাজ্যপ্রাপ্তিকাল ধরিলে পুত্রেষ্টির বৎসরকে ৯৯৯ শক বা ১০৭৭ খৃষ্টাব্দ ধরা যাইতে পারে না।

ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণের যোদ্ধবেশে আগমনের কোন কথা না থাকিয়া ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির বিষয়ে তাহা উল্লেখ থাকায় আমাদের অনুমান হয় যে শেষোক্তদিগের আগমনকালে পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমান-দিগের অভ্যুত্থানের সূত্রপাতকালে অরাজকতারও বিশেষ সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। ইহাতে বোধ হয় যে মুসলমানদিগের অভ্যুদয়ের প্রত্যুষকালে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির গৌড়দেশে আবির্ভাব হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণপঞ্চকের প্রথম পদার্পণ স্থান লইয়াও মতভেদ আছে। আমাদের সিদ্ধান্ত যথাস্থানে বলিয়া আসিয়াছি। নগেন্দ্র বসু তাঁহার 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'এ বলেন—"প্রসিদ্ধ মালদহ নগরের দুই ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে ও গৌড় নগর হইতে ৮ ক্রোশ উত্তরে ফিরোজাবাদ নামে এক অতি প্রাচীন স্থান আছে। স্থানীয় লোকেরা এই স্থানকে 'পোঁড়োবা' বা 'পুঁড়োবা' (বড় পুঁড়ো) নামে অভিহিত করে। এই স্থানের এক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ও মালদহের আড়াইক্রোশ উত্তরে 'বারদোয়ারী পুঁড়োবার' ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। পোঁড়োবা অথবা পুঁড়োবা শব্দ 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন' অথবা 'পুণ্ড্রবর্দ্ধন' শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। স্থানীয় লোকেরাও বলিয়া থাকেন যে এখানে বহুকাল গৌড়ের রাজগণ আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ, বহুতর ভাস্কর ও শিল্পসমাযুক্ত ভগ্নমন্দিরাদির নিদর্শন বহুসংখ্যক কূপতড়াগাদির প্রাচীন গর্ভ এখানকার হিন্দুরাজত্বের অতীত কীর্ত্তিবিশেষরূপে ঘোষণা করিতেছে। এই ধ্বংসাবশেষ *'পুঁড়োবার বারদোয়ারী' হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে গঙ্গাতট পর্য্যন্ত প্রায়* ১২ ক্রোশের অধিক স্থান জুড়িয়া আছে।

"বর্ত্তমান পুঁড়োবা নামক স্থান, যাহাকে আমরা প্রাচীন পৌণ্ড-বর্দ্ধন নগর বলিয়া স্থির করিয়াছি, তাহা এখানকার গঙ্গাস্রোত হইতে প্রায় ৭।৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কিন্তু এখনকার নদীর অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। বর্ত্তমান মালদহ সহরের

পরপারে সে কালিন্দী নদী বহিতেছে, এক সময়ে ভাগীরথী এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইত। মালদহের দুই ক্রোশ পশ্চিমে ভাগীরথীপুর নামে একখানি গণ্ডগ্রাম রহিয়াছে। তাহারই কিছুদূরে ভাগীরথা নামে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বুড়ীগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব্বকালে এই ভাগীরথা দিয়াই গঙ্গায় মূলস্রোত বহিত ও মালদার পার্শ্বে প্রবাহিত মহানন্দার অদূরে কালিন্দীর সহিত মিলিত ছিল। সুতরাং বহু জনাকীর্ণ বিখ্যাত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর গঙ্গার অনতিদূরে ও মহানন্দার তট হইতে বর্ত্তমান 'বারদোয়ারী' পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল, তাহা অসম্ভব নহে। পুঁড়োবার বারদোয়ারীর একক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে 'হোমদীঘী' বা 'হোমংদীঘী' নামে এক প্রাচীন স্থান আছে, কেহ কেহ মনে করেন এখানে আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণ হোম করিতেন।" শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্র বাবু এইরূপ আলোচনার পর অনুমান করিয়াছেন যে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (বর্ত্তমান পুঁড়োবা নামক স্থানে) প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন। রামপাল সম্বন্ধীয় জনশ্রুতিকে পরিত্যাগ করিয়া পুঁড়োবা সম্বন্ধীয় জনশ্রুতিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না।

ক্ষিতীশপুত্র ভট্টনারায়ণ 'বেণীসংহার'-প্রণেতা কিনা এই বিষয়ে সংশয়াকর্ষক কয়েকটি কথা পণ্ডিত রামনাথ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। 'বেণীসংহার'এর তিনটি শ্লোক 'ধ্বন্যালোক' নামক অলঙ্কার-গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই 'ধ্বন্যালোক'এর বৃহৎ প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্ষিনী টীকা ১০১৫ খৃষ্টাব্দে (৪১১৫ কলিগতাব্দে) রচিত হয়। সুতরাং 'বেণীসংহার' অত্যন্ত পুরাতন গ্রন্থ এবং সুতরাং ইহা ক্ষিতীশপুত্র ভট্টনারায়ণের রচনা হইতে পারে না। পণ্ডিতবর জগমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ও 'বেণীসংহার' নাটকের তৎকৃতসংস্করণের মুখবন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই অথবা কোন যুক্তি প্রদর্শন না করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে ভট্টরামেশ্বরের পুত্র ভট্টনারায়ণ 'বেণীসংহার'এর প্রণেতা।

'ধ্বন্যালোক'ঘটিত আপত্তি আমাদের নিকট বিশেষ বলবান বোধ হইতেছে না। যে তিনটি শ্লোক 'ধ্বন্যালোক' ও 'বেণীসংহার' উভয় গ্রন্থেই স্থান পাইয়াছে, সেই তিনটি শ্লোক যে কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত 'ধ্বন্যালোক'এর কুত্রাপি তাহার উল্লেখ নাই। 'ধ্বন্যালোক' যদি-বা 'বেণীসংহার'এর সমসাময়িক না হয়, তবে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে উক্ত তিনটি শ্লোক প্রাচীন রচনা এবং উভয় গ্রন্থকার স্ব স্ব গ্রন্থে প্রয়োজন সাধনার্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপনিষদসমূহ এবং গীতা প্রভৃতি দৃষ্টি করিলে বুঝা যাইবে যে এরূপ করা তখনকার কালে কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার ছিল না।

দ্বিতীয় আপত্তি যে 'বেণীসংহার' ভট্টরামেশ্বর-পুত্রের রচনা, তাহার কোন প্রমাণ দেখা যায় না। 'বেণীসংহার'এর প্রারম্ভে গ্রন্থকর্ত্তার যে সামান্য আত্মপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে "এই পুস্তক ভট্টনারায়ণের কীর্ত্তি" মাত্র বলিয়াই উল্লেখ আছে। জয়ন্তী নিবাসী শ্রীরামচন্দ্র ঘটক চূড়ামণি অনুগ্রহপূর্ব্বক রাজা আদিশূরের নিকটে ভট্টনারায়ণের আত্মপরিচয় প্রকাশক একটি শ্লোক লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাতেও 'বেণীসংহার'-প্রণেতা ভট্টনারায়ণ মাত্র বলিয়াই উল্লেখ আছে।[৭] এই শ্লোকটি যে কোন্ গ্রন্থে আছে তাহার অনুসন্ধান পাই নাই।

কেহ কেহ বলেন যে ঠাকুর গোষ্ঠী বন্দ্যগাঁই অর্থাৎ ভট্টনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। আমরাও এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি। কিন্তু কেহ বা বলেন যে ঠাকুর গোষ্ঠীর গাঁই কুসুমকুলি এবং কেহ বা বলেন কুশারি। কুসুমকুলী হইলে ঠাকুরগোষ্ঠীর প্রকৃত পূর্ব্বপুরুষ হইবেন নান এবং কুশারি হইলে কোয়। ইহাঁরা সকলেই অবশ্য ভট্টনারায়ণের পুত্র। ভবানীপুর নিবাসী শ্রীনাথ

বেণীসংহার নামা পরমরসযুতো গ্রন্থ একঃ প্রসিদ্ধঃ
ভো রাজন্ মৎকৃতোঽসৌ রসিকগুণতো যত্নতো গৃহ্যতে যঃ।
নাম্নাহং ভট্টনারায়ণ ইতি বিদিতশ্চারুশাণ্ডিল্যগোত্রো
বেদে শাস্ত্রে পুরাণে বহুনি চ নিপুণঃ স্বস্তি বঃস্তাৎ কিমন্যৎ ॥

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে ঠাকুরগোষ্ঠী কুশারি গাঁই। বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা খুলনার সন্নিকটস্থ বালন্দা পরগণার দুর্গাপ্রসাদ ও তারাপ্রসাদ চৌধুরীর জমিদারী পীঠাভোগে আসিয়া বসতি করেন। ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর[৮] পীঠাভোগস্থ জ্ঞাতি-বর্গকে সাহায্য করিতেন এবং ঐ গ্রামের পত্তনি লইবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। শ্রীনাথবাবু তাঁহার এই মতের পরিপোষক বিশেষ কোন যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। হইতে পারে যে পীঠাভোগের কুশারি বংশীয় অনেককে সাহায্য করিতেন এবং হয়তো তিনি তাহাদিগকে নিজ জ্ঞাতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন, কিন্তু তাই বলিয়া যে সেই কুশারিগণ ঠাকুরগোষ্ঠীর সত্যসত্যই জ্ঞাতি ও পূর্ব্বপুরুষ এমন কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না। অনেকগুলি বংশাবলীতে আমরা আদিবরাহ হইতেই ঠাকুর গোষ্ঠীর উৎপত্তি প্রদর্শিত দেখি। আমরা অনেকগুলি বংশাবলী আলোচনা করিয়া একটি বংশাবলী প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইয়াছি, কারণ সেই সকল বংশাবলীর পরস্পরের মধ্যে অনেকাংশ ঐক্য দৃষ্ট হয় না। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'A brief account of the Tagore family' নামক পুস্তিকার উপসংহারে আছে যে "তদুল্লিখিত বিষয়গুলি পারিবারিক কাগজপত্র হইতে প্রধান পারিবারিক পুরোহিত, প্রধান পারিবারিক ঘটক এবং প্রধান পারিবারিক ভাট কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বিদ্বান ও মান্য ঘটক বংশীধর বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছে।" জানি না, ইহা কাহার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইরূপ স্পষ্টভাষায় এই পুস্তিকাখানিকে প্রামাণ্য করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা ইহাতে প্রদত্ত বংশাবলীর বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দিহান আছি। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক যে বংশাবলী সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা বিদ্যাবাগীশ

৮ ইনি ঠাকুর পরিবারের পাথুরিয়াঘাটা শাখার মানুষ। সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের খুল্লতাত ছিলেন।

মহাশয়ের সংস্করণ 'বেণীসংহার' নাটকের প্রারম্ভেই প্রদত্ত হইয়াছে। আবার পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি 'কল্পনা' নামক মাসিক পত্রিকার ৭.৮ম সংখ্যায় ভট্টনারায়ণ হইতে রামমোহন রায় প্রভৃতির একটি বংশাবলী দিয়াছেন। আমাদের পারিবারিক ভাটের নিকটেও একটি বংশাবলী পাইয়াছি। এই সকলের মধ্যে আমরা বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সঙ্কলিত বংশাবলীকেই অপেক্ষাকৃত নির্ভুল ও সুতরাং প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। বর্ত্তমানে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ চলিতেছে—৯৪১ খৃষ্টাব্দ অবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ৯৬১ বৎসরের ব্যবধান। গড়ে ৩০ বৎসর করিয়া এক এক পুরুষের পরমায়ু ধরিলে এই ব্যবধানকালে অন্তত ৩১ পুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক। আমাদিগের প্রস্তুত বংশাবলী অনুসারে ভট্টনারায়ণ অবধি আজ পর্য্যন্ত ৩২ পুরুষই পাওয়া যাইবে।[৯]

ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ষোড়শ পুরুষ হইতেছেন হলায়ুধ। অনেকেই শাণ্ডিল্য গোত্রীয় হলায়ুধকে 'ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব'এর রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। 'ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব' গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকারের যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে, তিনি বাৎস্যগোত্রসম্ভূত। তাঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয়।[১০]

উপরোল্লিখিত ইংরাজী ভাষায় রচিত 'ঠাকুর গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত বিবরণে' ধনঞ্জয় ও তৎপুত্র হলায়ুধকে শাণ্ডিল্য গোত্র ও ভট্টনারায়ণের বংশোৎপন্ন বলা হইয়াছে। আশ্চর্য্য! আমাদের প্রদত্ত বংশাবলীতেও হলায়ুধ নাম দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহার পিতার নাম রামরূপ। বাৎস্য-গোত্রসম্ভূত ধনঞ্জয় পুত্র হলায়ুধ 'মীমাংসা সর্ব্বস্ব', 'বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব'

৯ বংশলতার জন্য পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

১০ বংশো বাৎস্যমুনের্মুনেরিব সদাচারস্থবিশ্রামভূ:
ধর্মাধ্যক্ষো ধনঞ্জয়: সমজনি জ্যায়ান্ পর: জ্যোতিষ:।
গোষ্ঠীষু দৈবতমমলমতি ধৈর্য্যসম্পদাং বসতি:
প্রকৃতিরিব পরমপুংসস্তস্যাভূত্বজ্জ্বলা গৃহিনী॥
বভূব তস্যা প্রকৃতের্মহানিব
শ্রয়ো বিলাসায়তনং হলায়ুধ:।

প্রভৃতি 'সর্ব্বস্ব' নামাত্মক কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় পশুপতি ও ঈশান ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ যে ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় কোন পুস্তক লিখিয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এদিকে আমরা দেখি যে 'কবিরহস্য' নামক ধাতুগ্রন্থে গ্রন্থকার স্বীয় পরিচয় প্রদানকালে কেবল ব্রাহ্মণ হলায়ুধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু 'সর্ব্বস্ব' গ্রন্থের কোনই উল্লেখ করেন নাই।[১১] আমাদিগের অনুমান হয় যে এই 'অভিধান রত্নমালা' এবং 'কবিরহস্য' গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা হলায়ুধই শাণ্ডিল্যগোত্রীয়, 'ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব' প্রণেতা নহে।

পূজ্যপাদ পিতামহদেব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গৃহে পরিবারস্থ পুত্রকন্যাদিগকে উপদেশদানকালে বলিয়াছিলেন "আমার প্রপিতামহ নীলমণি ঠাকুর, তিনি তাঁহার ভ্রাতা দর্পনারায়ণের সহিত কলহ করিয়া এইস্থানে আমাদের ভদ্রাসন স্থাপিত করিলেন। বিশ্বস্ত-হৃদয়ে তিনি দর্পনারায়ণের নিকট অনেক মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যর্পণ করিতে পরে অস্বীকার করিলেন; তিনি কহিলেন. তুমি আমার নিকটে মুদ্রা রাখ নাই। তাহাতে আমার প্রপিতামহ এইমাত্র বলিলেন 'তুমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া বলিলে আমি আর তোমাকে কিছুই বলিব না।' তিনি তাহাই করিলেন; সুতরাং ইনি কেবল ইঁহার আপনার একটি শালগ্রাম ঠাকুরকে তাঁহাদিগের গৃহ হইতে সঙ্গে করিয়া আসিয়া এই গৃহে স্থাপিত করিলেন।" এদিকে জেম্‌স্ ফারল সাহেব স্বপ্রণীত 'Tagore Family' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে নীলমণি ঠাকুর পৈতৃক সম্পত্তি ও গচ্ছিত মুদ্রার বিনিময়ে এক লক্ষ মুদ্রা পাইয়াছিলেন। শেষোক্ত কথা সঙ্গত বোধ হয় না, কারণ তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় তেজস্বী পুরুষ ভদ্রাসন স্থাপন বিষয়ে অপর এক ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। আমি নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের ফলে বুঝিয়াছি যে চাকুরীর অবসানে নীলমণি ঠাকুর সমুদয় বিষয়ের

১১ ইতি সমাপ্তমবাপ্ত গুণোদয়ং কবিরহস্যমিদং রসিকপ্রিয়ম্।
সদাভিধাননিধানো হলায়ুধদ্বিজবরস্য কৃষ্ণঃ সুকাতার্থিণঃ॥

(তেজারতীদ্বারা বর্দ্ধিত বিষয়েরও) অর্দ্ধাংশ প্রার্থনা করাতে দর্পনারায়ণ তাহা দিতে অস্বীকার করিলেন। পরিশেষে কলহের কারণে দর্পনারায়ণ শেষে নীলমণির গচ্ছিত টাকা পর্য্যন্ত দিতে অস্বীকার করিলে দত্তদিগের মধ্যস্থতায় কিছু দিতে রাজী হইলেন। পাছে দর্পনারায়ণকে মিথ্যা বলিতে হয় এই ভয়ে ভ্রাতার সহিত মকর্দ্দমা না করিয়া লক্ষ্মীজনার্দ্দন বিগ্রহ লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। এই বিগ্রহ আজও শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে সেবা প্রাপ্ত হইতেছেন। গোকুল দত্তের [১২] নিকটে স্থান প্রাপ্তে ভদ্রাসন স্থাপনার পর নীলমণি পুনরায় অর্থোপার্জনের জন্য প্রবাসে গমন করিলে লোকে দর্পনারায়ণকে অত্যন্ত নিন্দা করিতে থাকিলে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিণামে কিছু দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমাদিগের বাটীর পার্শ্বস্থ জমি তৎকালাবধি দত্তদিগেরই ছিল শুনিতে পাই, এখনও আমাদের বাটীর সন্নিহিত অনেক জমি ৺শিবকৃষ্ণ দত্তের বংশধরেরা ভোগ করিতেছেন।

নেড়া দিদি (নীলমনির মেয়ে) বলিয়াছেন নীলমণি একবার একটা বাড়ী করিবার মনস্থ করিয়া ভিত্তি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ৫০,০০০৲ টাকার সোনা পাইলেন। সেটা তিনি নিজের মেয়ের জন্য রাখিবেন স্থির করিলেন। দর্পনারায়ণ রাগ করিয়া খাতা পত্র সমস্ত পুড়াইয়া দিলেন এবং একটি পয়সাও দিতে অস্বীকার করিলেন। নীলমণি বলিলেন যে তোমাকে ছেলের মত দেখি, তোমার নামে আবার নালিস করিব কি? নীলমণি তো রাগ করে কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পিছনে শুঁড়িদের বাড়ীতে বসিলেন। তাহারা ব্যতিব্যস্ত যে ব্রাহ্মণ অনাহারে থাকিতে তাহারা খায় বা কি করে এবং তাহাদের বাড়ীতে ব্রাহ্মণই বা খায় কি করে। অবশেষে তাহারা দয়া পরবশ হইয়া জোড়াসাঁকোতে তাহাদের এক টুকরো জমি ছিল, তাহাই প্রদান করিল। সম্ভবত সামান্য মুল্যে তিনি কিনিয়াছিলেন। প্রথম দুর্গাপূজা খোলার ঘরে হয়।[১৩]

১২ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাটীর উত্তরপূর্ব্ব কোণে ৺শিবকৃষ্ণ দত্তের (দাঁ) পিতা।

১৩ এই গল্প রমানাথ ঠাকুরের বধূকে নেড়াদিদি নিজে গল্প করেছেন।

পীরালী পরিচয়

ভারতবাসীদের আর সে মনুষ্যত্ব নাই। এখন তাহারা আলস্যের পাশজালে আবৃত দেহ। সেই আলস্যের মধ্য দিয়া অহিফেনজনিত স্বপ্নের মত দেখিতে পায় যে অমুকের পীরালী দোষ, অমুকের তিন পুরুষে সকলেরই সব দোষ দেখিতে পায়, দেখিতে পায় না কেবল নিজের দোষ। আর দেখিতে পায় না অপরের মহত্ত্ব এবং আর পাঁচজনে কি প্রকারে উন্নতি করিতেছে। অনেকে পীরালীদিগকে পীরালী বলিয়া লজ্জা দিবার চেষ্টা পান। দুঃখের বিষয় যে পীরালীদের মধ্যে অধিকাংশই এত কাপুরুষ যে, পীরালী নামে অভিহিত হইলে তাঁহারা লজ্জায় মরিয়া যান। আমি তো লজ্জার কোনই কারণ দেখি না। পূর্ব্বপুরুষেরা কোন কারণে পীরালী উপাধি পাইয়াছেন, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক—অবশ্য মন্দ হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না—তাহার জন্য লজ্জা পাইব কেন? প্রত্যুত আমরা গৌরব করিয়া বলিব যে হাঁ আমরা পীরালী, আমাদিগের মধ্যে অমুক অমুক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অ-পীরালীগণ যদি পীরালীদিগকে লজ্জা দিতে চান, তবে পীরালীগণও কুলীন প্রভৃতিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ গ্রন্থোল্লিখিত ঘটনাসমূহের উল্লেখ করিয়াও লজ্জা দিতে পারেন। আমাদের মতে এরূপ করা ইতর জনের উপযুক্ত। পীরালীর ইতিবৃত্ত ইচ্ছা হয় অনুসন্ধান কর, কুলীনের ইতিবৃত্ত ইচ্ছা হয় আবিষ্কার কর, কিন্তু পরস্পরের প্রতি তজ্জন্য গালিবর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া একত্র মিলিত হইয়া যাও। ভারতমাতা আনন্দে বিহ্বলা হউন।

জনসাধারণে প্রায় একেবারে ভুলিয়া যায় যে কলিকাতার ঠাকুরগোষ্ঠী একেবারেই আদি পীরালী নহেন। পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ যশোহর নিবাসী পীরালী রায়চৌধুরী বংশে বিবাহ করিয়া নিজ বংশে

পীরালী সংস্পর্শ আনয়ন করিলেন। ইহা ব্যতীত ঠাকুরগোষ্ঠীর সহিত পীরালীত্বের আর কোনই সম্পর্ক ছিল না। বর্ত্তমানে পীরালা ঠাকুরগোষ্ঠী নানাবিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করাতে লোকদৃষ্টিতে ঠাকুর ও পীরালী এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে।

রায়চৌধুরী বংশই বা পীরালী হইলেন কেন? এ বিষয়ে অনেকগুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই সকল প্রবাদের অধিকাংশ প্রলাপোক্তি মাত্র। একটি প্রবাদ এই যে, ভট্টনারায়ণের অধস্তন চতুর্বিংশতিতম পুরুষ জগন্নাথ পশ্চিমে ছিলেন এবং পরে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণের বঙ্গদেশে আসিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তিলাভের বিষয় স্মরণ পূর্ব্বক বঙ্গদেশে আসিয়া ঈশবপুরের শূদ্ররাজা সুধারামের কন্যাকে বিবাহ করিয়া পীরালীত্ব লাভ করিলেন। এই প্রবাদটি প্রলাপোক্তি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আশ্চর্য্য এই যে ৺কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় তাঁহার দ্বারকানাথ জীবনীতে এই ঘটনাকে পীরালীত্বের কারণ বলিয়া ইহাতে জাল ঐতিহাসিক মোহর দিয়াছেন। শূদ্ররাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া মুসলমানী পীরালী উপাধিলাভের কোনই কারণ দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত শূদ্রকন্যাকে ব্রাহ্মণ সন্তান বিবাহ করিলে তদ্‌বংশীয়গণ নিশ্চয়ই এক সঙ্কর জাতির মধ্যে পড়িয়া যাইত, কিন্তু তাহা ঘটে নাই। ভট্টনারায়ণের ৩ পুরুষ পরে যে এক বংশধরের হঠাৎ পশ্চিমে বাসের ইচ্ছা করিয়াছিল এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোন কোন বংশাবলীতে পুরুষোত্তমকে জগন্নাথের পুত্র বলিয়া উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই বংশাবলীর সঙ্কলয়িতাগণ বলেন যে জগন্নাথই প্রথম যশোহরে নিবাস স্থাপন করেন। পারিবারিক ঘটকের নিকটে প্রাপ্ত বংশাবলীতে দেখি যে পুরুষোত্তমের এক ভ্রাতার নাম ছিল জগন্নাথ। এই সকল পরস্পর বিরোধের কারণে এই ঘটনা নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া বিবেচনা করি।

কেহ কেহ বলেন যে রায়বংশের কোন পূর্বপুরুষ পীর-আলী নামক এক মুসলমান পূজিত দেবতার ভক্ত হওয়ায় পীরালী নাম পাইয়াছিলেন। বিস্তর হিন্দু পল্লীগ্রামবাসী নানা পীরের নিকট 'সিন্নী'

মানত করিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদের কোন মুসলমানী উপাধি লাভ হইয়াছে ?

তৃতীয় মত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের লিখিত এবং যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি কর্ত্তৃক তাঁহার 'Hindu Castes and Sects' নামক পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি বলেন যে ঘটকদিগের গ্রন্থ অনুসারে চেঙ্গুটিয়া পরগণার অন্তর্গত গুড়গ্রাম নিবাসী জানকীবল্লভ এবং কামদেব রায়চৌধুরী যশোহরের শ্রীকণ্ঠ রায়ের কোন পূর্ব্বপুরুষের বিরুদ্ধে মকদ্দমা আনিয়াছিলেন। এই মকদ্দমার তদন্ত করিবার জন্য তদানীন্তন জমিদার পীরালী খাঁ নামক এক আমীনকে প্রেরণ করিলেন। সেই আমীনের সঙ্গে গ্রামের অধিবাসীদের এক তর্ক উপস্থিত হইল যে ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজন হয় কিনা। কিছুকাল পরে পীরালী খাঁ বিস্তর লোক নিমন্ত্রণ করিয়া গোমাংসের গন্ধ আঘ্রাণ করাইয়াছিলেন। উপস্থিত সকলেরই জাতি নষ্ট হইল। জানকীবল্লভ এবং কামদেব আমীনের নিকট বসিয়া থাকাতে তাঁহাদের নামে অপবাদ রটিল যে তাঁহারা গোমাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া মুসলমান হইতে হইল। তাঁহারা জামাল খাঁ এবং কামাল খাঁ নাম ধারণ করিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ যশোহর জেলান্তর্গত চেঙ্গুটিয়া পরগণার মাগুরা এবং বাসুন্দিয়া গ্রামে অর্জুন খাঁ, দীননাথ খাঁ এইরূপ নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ক্রমের খাঁ চৌধুরীদের সঙ্গে ক্রিয়া করিয়া থাকেন, কোন মুসলমানের সঙ্গে করেন না। নিমন্ত্রণ সভায় উপস্থিত অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ পীরালী আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। পুরুষোত্তমও নাকি এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন। কেহ কেহ বা বলেন যে যশোহরে অবস্থিতি কালে পুরুষোত্তম একদিন গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে স্থানীয় চৌধুরীগণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া নিজেদের এক কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। পুরুষোত্তম কন্যাটিকে সুন্দরী দেখিয়া বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন। এই বিবাহের পর পুরুষোত্তম তাঁহার আদিম নিবাস পরিত্যাগ করিয়া যশোহরে উঠিয়া আসেন।

উপরোক্ত মতে পুরুষোত্তম সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মোটেই সপ্রমাণ নহে। পুরুষোত্তমকে বলপূর্ব্বক কন্যাদান অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তখনকার বাঙ্গালী এখনকার মত নির্জীব ছিল না। হঠাৎ একটি লোকের জাতি নষ্ট করিয়া দিল, আর কেহ একটি কথাও বলিল না—ইহাও কি কখনও সম্ভব? আমাদের অনুসন্ধানে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে, কোন কন্যাদায়গ্রস্ত পীরালী রায়চৌধুরী গঙ্গাস্নানে গিয়া দেখেন যে পুরুষোত্তমও স্নান করিতেছেন। পুরুষোত্তমকে উদার প্রকৃতি জানিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করাতে তিনি ভিক্ষা দিতে স্বীকার করায় রায়চৌধুরী কন্যাদায়ের কথা জানাইলেন। পুরুষোত্তম অগত্যা নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন।

চতুর্থ মত বিশ্বকোষে শ্রীযুক্ত বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফী বহু গবেষণার ফলে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে খাঁজাহানালী নামে এক ব্যক্তি দিল্লী দরবার হইতে সুন্দরবন আবাদ করিবার সনন্দ লইয়া যশোহরে আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি যশোহরের একপ্রান্ত হইতে রাস্তা করিয়া উভয় পার্শ্বের বন কাটিতে কাটিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জঙ্গল পথে জলের অভাব হওয়ায় প্রতি অর্দ্ধক্রোশ দূরে এক একটি পুষ্করিণী খনন করাইতে করাইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে বর্ত্তমান খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমা পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়া ঐ স্থানে জমিদারী স্থাপন করেন। এই খাঁজাহানালীর জমিদারীর পার্শ্বে যশোহরের চেঙ্গুটিয়া পরগণায় জমিদার রায়চৌধুরীগণ ব্যতীত আর কোন প্রবল জমিদার ছিল না। খাঁজাহানালী অতি বিস্তৃত জঙ্গলের অধিপতি হওয়ায় শীঘ্রই নবাব খাঁজাহানালী হইয়া পড়িলেন। সাধারণতঃ নবাব খাঞ্জেআলী নামে ইনি প্রসিদ্ধ। শেষে যখন জমিদারীর কতকটা সুব্যবস্থা হইল, তখন নবাব খাঁজাহানালী তৎপ্রদেশের হিন্দু-গণকে মুসলমান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক ব্রাহ্মণ সন্তান এই সময়ে নবাব খাঁজাহানের অতি প্রিয় পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইনিই অবশেষে নবাবের অনুরোধে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মহম্মদ তাহের নাম গ্রহণ করেন, মহম্মদ তাহের মুসলমান হইয়া বড়ই গোঁড়া

হইয়া পড়েন। ইহাঁর উদ্যোগে নবাব খাঁজাহানালী এই অংশে তিনশত ষাটটি মসজিদ ও অন্যান্য কীর্ত্তি স্থাপন করেন। ক্রমে মহম্মদ তাহের নবাবের উজীর হন এবং ইসলাম ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধিকামনায় বদ্ধপরিকর হওয়াতে মুসলমানের নিকট পীরআলী নামে খ্যাত হন।

পীরআলী উজীর হইয়া পুর্ব্বোক্ত রায়চৌধুরী বংশের কয়েক ব্যক্তিকে অনেক প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহম্মদ তাহের বা পীরআলী নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণ জাতিকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন এবং বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক বলিয়া এই জাতির কর্ম্মচারী পাইলে অন্যজাতির লোক রাখিতেন না। রায়চৌধুরী বংশের লোক-জন সমস্ত উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় অধস্তন কর্ম্মচারীগণের মধ্যে তাঁহাদের অনেক বিদ্বেষ্টা ছিল। এই রায়চৌধুরীগণের মধ্যে কামদেব ও জয়দেব নামক দুই ভ্রাতা অতি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। এক সময়ে রোজার উপবাসের মধ্যে একদিন উজীর পীর আলী খাঁ বারান্দায় বসিয়া আছেন; নিকটে কামদেব, জয়দেব প্রভৃতি কর্ম্মচারীও আছেন। এমন সময়ে কোন কর্ম্মচারী তাহার নিজের বাগানের ঘৃতকলম্বা লেবু উপহার দিল। পীরআলী লেবুটির আঘ্রাণ লইয়া বলিলেন 'আঃ কি সুগন্ধ!' রায়চৌধুরীদ্বয় নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা আপনাদের ধর্ম্মের ন্যায় অপরের ধর্ম্মকেও শ্রদ্ধা করিতেন। কামদেব রোজার দিন উপবাসকালে উজীর সাহেবকে লেবুর আঘ্রাণ লইতে দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, 'হুজুর, কি করিলেন? রোজার দিন লেবুর আঘ্রাণ লইলেন কেন?' উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, দোষ কি?' কামদেব উত্তর করিলেন 'আমাদের শাস্ত্রে বলে ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন হয়।' পীরআলী শুনিয়া অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন, কামদেব তাঁহার পূর্ব্বব্রাহ্মণত্ব স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছেন। কাজেই তিনি বিদ্রূপের প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করিলেন। সেদিন মজালস ভঙ্গ হইলে উজীর রায়চৌধুরীদ্বয়ের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহারই অধীনে রায়চৌধুরীদের অনেক শত্রু আছে।

তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া পীরআলী স্থির করিলেন যে উহাদিগকে জাতিচ্যুত করিতে পারিলে ঠিক প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

পরামর্শ স্থির হইলে, উজীর পীরআলী একদিন হিন্দু মুসলমান সমস্ত কর্ম্মচারী এবং মাতব্বর প্রজাদিগকে দরবারে আহ্বান করিলেন। দরবার গৃহের পার্শ্বে এক বৃহৎ গৃহে সুগন্ধ মসলা, পলাণ্ডু, রশুনাদি সাহায্যে গোমাংস রন্ধনের আদেশ দিলেন। দরবার গৃহ সেই গন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিল। প্রজা ও কর্ম্মচারী সকলেই উপস্থিত হইলেন এবং অনেকেই সেই গন্ধে নাসিকায় বস্ত্র দিয়া বসিলেন। কামদেব ও জয়দেব চৌধুরীও তদ্রূপ করিয়া বসিয়াছিলেন, অধিকন্তু উজীরের সম্মুখে বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পীরআলী মনে মনে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'চৌধুরী, ব্যাপার কি?' কামদেব মুখ বিকৃত করিয়া উত্তর দিলেন 'মাংসের গন্ধ।' উজীর বলিলেন 'আগে গন্ধ পাইয়া পরে মুখে কাপড় দিয়াছ ত? তাহা হইলে ঘ্রাণে অর্দ্ধ-ভোজন হইয়া গিয়াছে। আজ তোমাদেরও সকলেরই জাত গিয়াছে।" কামদেব চমকাইয়া উঠিলেন। উজীর সভার দিকে চাহিয়া বলিলেন 'কেমন, হিন্দুর শাস্ত্রানুসারে ইহা ঠিক?' বিদ্বেষীর দল সায় দিল। উজীর তখন দুই ভ্রাতাকে ধৃত করাইয়া বলপূর্ব্বক গোমাংস ভক্ষণ করাইলেন। এদিকে বিপদ গুরুতর বুঝিয়া অপর সকলে পলাইলেন। তৎপরে জাতিত্বের খোঁট হইল। গ্রামস্থ জাতক্রোধ লোকেরা সুযোগ পাইয়া একযোগে রায়চৌধুরী বংশকে পতিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত আচার ব্যবহার বন্ধ করিলেন। কামদেব ও জয়দেব মুসলমান হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই দেখিয়া নবাবের শরণাগত হইলেন। নবাব খাঁজাহানালী তাঁহাদের যথাক্রমে কামাল উদ্দীন খাঁ ও জামাল উদ্দীন খাঁ চৌধুরী নাম রাখিয়া যশোহর হইতে ৫ ক্রোশ দূরে সিংহিয়া গ্রাম জায়গীর দিয়া তথায় তাঁহাদিগকে বাস করাইলেন।

কামাল উদ্দীন খাঁ ও জামাল উদ্দীন খাঁ চৌধুরী নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা মুসলমান হইয়াও হিন্দু আচারেই চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বংশ এখনও ঐ গ্রামে আছে। বহুকাল পর্য্যন্ত

ইহাঁদের বংশে গোপাল খাঁ, হারাধন খাঁ ইত্যাদি নাম রাখা হইত, বিবাহে পীঁড়াচিত্র হইত, বৃদ্ধা স্ত্রীরা তুলসীগাছে জল দিত, ষষ্ঠীর ব্রত ও শিবরাত্রি করিত এবং চেঙ্গুটিয়া পরগণার অন্তর্গত তরফ বাহিরঘাটের মুস্তফী বংশের স্থাপিত বুড়াশিবের পূজা দিত। অন্য মুসলমানের সঙ্গে আদান প্রদান হইত না, উভয় ভ্রাতার বংশেই পরস্পর বিবাহ চলিত। কালে এই দুই ভ্রাতার বংশ বিস্তৃত হইয়া সাতক্ষীরা, মাগুরা, বাসুন্দিয়া, কালড়া, হুসেনপুর ও সিংহিয়া প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহাদের মধ্যে হিন্দু নাম ও হিন্দু আচার পরিত্যক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।

এই গোলমালে রায়চৌধুরী বংশই আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় স্বতন্ত্র এক থাক হইয়া পড়িল। পীর আলীর উৎপাতে এই গোলমাল ঘটায় রায়চৌধুরী বংশকে লোকে পীরালী আখ্যা প্রদান করিল।

উক্ত রায়চৌধুরীগণ গুড়গ্রামী সাধ্যশ্রোত্রিয়। সুরাই মেলের আশ্রয়স্থান, গুড়িশরণ কনকদণ্ডী গুড়বংশের সন্তান। পীরালী রায়-চৌধুরীগণ বলেন, তাঁহাদের আদিবাস হলদা মহেশপুর এবং বর্ত্তমান বাস চেঙ্গুটিয়া পরগণার দক্ষিণডিহি গ্রামে। এই দক্ষিণডিহিতে এখনও ইহাঁদের বংশ আছে। পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ এই রায়চৌধুরী বংশে বিবাহ করিয়া পীরালী হন। ক্রমে পীরালীগণ যশোহর জেলার নরেন্দ্রপুর, জগন্নাথপুর, মহাকাল, বাহিরঘাট, পোমভাগ প্রভৃতি গ্রামে এবং ২৪ পরগণার জগদ্দল, বাসুদেবপুর, মুলাজোড়, মালঞ্চ, মাইনগর ও হুগলী জেলার মহীয়াড়ী গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন।

উপরোক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ কিংবদন্তী হইতে আমরা মোটের উপর বুঝিতে পারি যে রায়চৌধুরীদের বিদ্বেষী অনেক লোক তাঁহাদের গ্রামে বাস করিত এবং তাহাদের সাহায্যে কোন কারণে পীরআলী গোমাংসের গন্ধ আঘ্রাণ করাইয়া রায়চৌধুরীদিগকে জাতিচ্যুত না হইলেও, গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত আচার ব্যবহারের বহির্ভূত করাইয়াছিলেন। হাবড়ানিবাসী বৃদ্ধ রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী মহাশয়ের

নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ হয় নিমন্ত্রণ সভায় উপস্থিত হন নাই অথবা গোলমালের সূত্রপাতেই কোন গতিকে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশ পীরালী হন নাই। যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণিও তাঁহার 'Hindu Castes and Sects' গ্রন্থে বিবেচনা করেন যে রায়চৌধুরীদের অনেক বিদ্বেষ্টা ছিল এবং তাহারাই মিলিত হইয়া গোমাংসঘ্রাণ-সূত্র ধরিয়া 'একঘরে' করিয়া দিল। এই 'একঘরে' হওয়াতে পীরালীদিগের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল তাহা তো বোধ হয় না। বরঞ্চ অনুমান হয় যে পীরালীগণ কুলীনদিগের উপর এই অত্যাচারের যথেষ্ট প্রতিশোধ তুলিয়াছিল—

ঘটকগণ মনের দুঃখে বলিয়াছেন—

"যথা রাঢ়ে সেরখানী পীরালীভগ্নতা ক্বচিৎ।
বঙ্গে শ্রীমন্তখানী চ ত্রিভির্দগ্ধা বসুন্ধরা॥"

কুলীনদিগের সন্তান ছলে বলে কৌশলে ধরিয়া আনিয়া কন্যা বিবাহ দেওয়া পীরালীদের মধ্যে অনেকদিন পর্য্যন্ত একটা অলিখিত নিয়মের মধ্যে ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বারকানাথের জন্ম

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে [১] দ্বারকানাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। বলিতে গেলে তিনি জ্ঞানোজ্জ্বল উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

ঈশ্বর যে বংশে দ্বারকানাথকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই বংশে তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচেতা, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং দয়ার সাগর মহাপুরুষের জন্মগ্রহণ কিছু আশ্চর্য্য নহে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভট্টনারায়ণ, যিনি আত্মসম্মান অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য রাজারও দান প্রত্যাখ্যান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই বংশে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি হৃদয়ের স্বাধীনতার বলে দয়াপরবশ হইয়া পীরালী চৌধুরীকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিতে গিয়া নিজবংশে পীরালী সংস্পর্শ আনয়ন করিতেও ভীত হইলেন না। এই বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন নীলমণি ঠাকুর, যিনি ধর্ম্মের নিকটে অগণিত মুদ্রাকেও অতি তুচ্ছজ্ঞানে পরিত্যাগ করিতে কাতর হন নাই। যাঁহার ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া ভক্তগণ মহর্ষি সম্বোধনে আনন্দ লাভ করেন, সেই দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথেরই পুত্র। এই দ্বারকানাথেরই পৌত্র হেমেন্দ্রনাথ, যিনি স্বীয় মাতার জীবনরক্ষার্থ নিজের বাহু হইতে মাংস খণ্ড কাটিয়া দিতেও দ্বিধা করেন নাই।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়া আসিয়াছি যে দ্বারকানাথ রামলোচনের পোষ্যপুত্র। ইহাঁর জন্মদাতা পিতার নাম রামমণি। বলা বাহুল্য, পিতামাতার গুণাগুণ সন্তানে অনেক অংশে বর্ত্তায়। রামমণি অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী বৈষয়িক ছিলেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহার ধর্ম্মভাবের অভাব ছিল তাহা নহে।

১ ১৭১৬ শক, ১৮৫১ সম্বৎ, ১২০১ বঙ্গাব্দে।

এ সংসারে কে প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য সত্ত্বেও পুত্রের মায়া কাটাইয়া পরের হস্তে সহজে অর্পণ করিয়া দেয়? আর, রামমণির পুত্রের সংখ্যাও যে অধিক ছিল তাহাও নহে। কেবলমাত্র, স্বীয় সহধর্ম্মিনীর প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ নিজ পুত্রকে ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরও নিজ পুত্রকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দিয়াছেন বটে, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে বিশেষ বক্তব্য এই যে সৌরীন্দ্রমোহনের অনেকগুলি সন্তান সন্ততি বিদ্যমান এবং তদতিরিক্ত সম্প্রদানকালে উভয় ভ্রাতার মধ্যে অতি গভীর প্রণয় ছিল। অবশ্য, নিজের পুত্র যে রামলোচনের বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইবে, এইভাবও পুত্রদানে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। যাহাই হউক, এই স্বার্থের বলিদান তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত দিয়াছিল তিনি এই আঘাতে উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইলেন। সহস্র কষ্টের মধ্যেও স্বার্থত্যাগের ভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে পাকা বিষয়বুদ্ধি বোধহয় দ্বারকানাথ স্বীয় জন্মদাতা পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। তাঁহার দত্তক পিতা রামলোচন স্বীয় পোষ্যপুত্রকে অল্পবয়স্ক রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন, সুতরাং তিনি দ্বারকানাথকে কিছু বিশেষ শিক্ষা প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে বাল্য বয়সে যাহা কিছু শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহা স্বীয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথের নিকটে এবং স্বীয় দত্তক মাতা রামলোচন-পত্নীর নিকটে। আমরা শুনিয়াছি যে রামমণি-পত্নী দ্বারকানাথের জন্মদান করিবার পর বৎসরেকের ভিতরেই তাঁহাকে স্বীয় জা-য়ের হস্তে সমর্পণ করিয়াই পরলোক গমন করেন এবং দ্বারকানাথের জন্মের সমকালেই রামলোচনেরও এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়া অতি অল্পদিনের ভিতরেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। সুতরাং দ্বারকানাথ দত্তক মাতার নিকটে স্তন্যদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের প্রাপ্য স্নেহও সম্পূর্ণই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার জন্মদাত্রী মাতা এবং দত্তক মাতা, উভয়েই অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিলেন। রামমণি-পত্নী দয়াবতী ও ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিলেন বলিয়াই

স্বীয় জা-য়ের দুঃখে বিগলিত হৃদয় হইয়া অকাতরে নিজপুত্রকে প্রদান করিতে পারিলেন। দ্বারকানাথ এই দয়ার ভাব চিরজীবন নিজ কার্য্যে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আর, যাঁহার স্তন্য পান করিয়া এবং স্নেহ-শিক্ষা পাইয়া তিনি জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে সিংহবিক্রমে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই রামলোচন-পত্নীর জীবনের চিত্র পূজ্যপাদ পিতামহদেব কর্ত্তৃক আত্মজীবনচরিতে সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। "দিদিমা আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে ব্যতীত আমিও আর কাহাকে জানিতাম না। আমার শয়ন উপবেশন ভোজন, সকলই তাঁহার নিকট হইত। তিনি কালীঘাটে যাইতেন, আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলে জগন্নাথ-ক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন আমি বড়ই কাঁদিতাম।

ধর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন, এবং প্রতিদিন শালগ্রামের জন্য স্বহস্তে পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিতেন। কখনো কখনো তিনি সংকল্প করিয়া উদয়াস্ত সাধন করিতেন; সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যের অস্তকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যকে অর্ঘ দিতেন। আমিও সে সময়ে ছাতের উপরে রৌদ্রতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম, এবং সেই সূর্য্য-অর্ঘ্যের মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গেল—

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দিদিমা এক এক দিন হরিবাসর করিতেন; সমস্ত রাত্রি কথা হইত এবং কীর্ত্তন হইত; তাহার শব্দে আমরা আর রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিতাম না।

"তিনি সংসারের সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করিতেন, এবং স্বহস্তে অনেক কার্য্য করিতেন। তাঁহার কার্য্য-দক্ষতার জন্য তাঁহার শাসনে গৃহের সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিত। পরে সকলের আহারান্তে তিনি স্বপাকে আহার করিতেন। আমিও তাঁহার হবিষ্যান্নের ভাগী ছিলাম।

তাঁহার সেই প্রসাদ আমার যেমন স্বাদু লাগিত তেমন আপনার খাওয়া ভাল লাগিত না।

"তাঁহার শরীর যেমন সুন্দর ছিল, কার্য্যেতে তেমনি তাঁহার পটুতা ছিল, এবং ধর্ম্মেতেও তাঁহার তেমনি আস্থা ছিল। কিন্তু তিনি মা-গোসাঁইয়ের সতত যাতায়াত বড় সহিতে পারিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মের অন্ধবিশ্বাসের সহিত একটু স্বাধীনতাও ছিল।

"আমি তাঁহার সহিত আমাদের পুরাতন বাড়ীতে 'গোপীনাথ' ঠাকুর দর্শনার্থে যাইতাম। কিন্তু আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে ভাল বাসিতাম না; তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া গবাক্ষ দিয়া শান্তভাবে সমস্ত দেখিতাম।"[২] এরূপ সুন্দর চিত্রের উপর টীকা টিপ্পনী অনাবশ্যক। রামলোচনের সহধর্ম্মিণী ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত হয়েন, সুতরাং ইহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব একচল্লিশ বৎসর ব্যাপিয়া দ্বারকানাথের চরিত্রগঠনে সহায়তা করিয়াছিল।

মহাপুরুষদিগের জন্মকাল যেন জগতের সমগ্র ঘটনারাশি সূচিত করিয়া দেয়—ঈশ্বর যেন নানা ব্যক্তির মধ্য দিয়া, নানা ঘটনার মধ্য দিয়া, প্রভূত অমঙ্গলরাশি ভেদ করিয়া নিজের মঙ্গল স্বরূপ প্রকাশ করিতে চাহেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। এই বৎসর হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ধিকাল বলিতে পারি। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহাকে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর মহাপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিব।[৩] এই উভয় মহাপুরুষেরই জন্মের সমসাময়িক ইতিহাস একবার সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখিব যে কিভাবে

২ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত।

৩ রামমোহন রায়ের জীবনী লেখক গ্রন্থের মধ্যে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দকে রামমোহন রায়ের জন্মকাল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু পরিশিষ্টে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দকেই জন্মকাল স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। আমরা রামমোহন রায়ের এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্মের সমসাময়িক অবস্থা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। রামমোহন রায়ের জীবনচরিত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—২য় সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

ইহাঁদের জন্ম সূচিত হইয়াছে, ইহাঁদের জীবনের মধ্যবিন্দু সম্বন্ধে ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয়।

যে সময়ে ইহাদের আবির্ভাব হয়, সেই সময়ে ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের এবং সুতরাং আমেরিকার এবং ইংলণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী চিরশত্রু ফ্রান্সের যাহা কিছু বিশেষ সম্পর্ক ছিল। আমরা এই তিনটি রাজ্যের এবং ভারতের কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করিয়া তৎকালীন জগতের আবহাওয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব। রামমোহন রায়ের জন্মাবধি দ্বারকানাথ ঠাকুরের আবির্ভাব পর্য্যন্ত সমগ্র সভ্য জগতে স্বাধীনতার একটা ঝটিকা প্রবাহিত হইয়াছিল। আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণ এই মন্ত্র ধরিয়াছিলেন যে ইংলণ্ড তাঁহাদিগকে শাসনকার্য্যে অধিকার প্রদান না করিলে তাঁহাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতে পারেন না। নানা গোলমালের পর ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য সমস্ত কর উঠাইয়া দিয়া কর বসাইবার অধিকার রক্ষার জন্য চায়ের উপর নামেমাত্র কর রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ঔপনিবেশিকগণ তাহাও তাঁহাদের মতবিরুদ্ধ বলিয়া ধরিলেন। অবশেষে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কতকগুলি জাহাজে চা পাঠাইলে তাঁহারা সেই সমস্ত চা সাগর গর্ভে ফেলিয়া দিয়া স্বাধীনতাসংগ্রামের সূত্রপাত করিয়া দিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেবহৃদয় জর্জ ওয়াসিংটন এই সংগ্রামের অধিনেতা হইয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। সংগ্রাম সূত্রপাত হইবার প্রায় দশ বৎসর পরে ইংলণ্ড আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন। যে দাসত্বপ্রথা সভ্য-জগতের ইতিহাস মসীলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, ইংলণ্ডেরই যত্নে, প্রাতঃস্মরণীয় উইলবার্ফোসের চেষ্টায় সেই দাসত্বপ্রথা নির্ম্মূল হইবার সূত্রপাত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে চতুর্দশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অখণ্ড সম্রাটতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি প্রজাগণের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল করিবার যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে

ষোড়শ লুই যখন সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, তখন দেখা গেল স্বাধীনতার তরঙ্গ অন্তঃসলিলে প্রবাহিত হইয়া ঘূর্ণাবর্ত্তের আকার ধারণ করিবার দিকে চলিয়াছে। অবশেষে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সেই ঘূর্ণাবর্ত্তে লুই স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া স্বাধীনতার মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিলেন। এই বৎসর অবধি ফ্রান্সে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া স্বাধীনতার জন্য অন্তরে ও বাহিরে সংগ্রাম চলিয়াছিল। তবে ফ্রান্স স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সহায় যে সেই স্বাধীনতার আকর 'মহান্ বৈ পুরুষঃ' পরমেশ্বর, ফ্রান্সের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহা জ্বলন্তরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। ভল্টেয়ার ও রূসো প্রভৃতি স্বাধীনতাবাদীদিগের গ্রন্থাবলী তদানীন্তন মনীষিবর্গ, রাজন্যবর্গ এবং জনসাধারণ নির্দ্দোষ 'বাদ' মাত্রে পূর্ণ বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য এই সকল স্বাধীনতা বিষয়ক মতামত লইয়া যথাতথা বাদানুবাদ করিতেন। তাঁহারা ভ্রান্তিবশতঃ বুঝিতেও পারেন নাই যে এই সকল মত জনসাধারণের হৃদয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সন্নিবিষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং কালে এই সকল মত স্বাধীনতার নামে এক মহা-বিপ্লব বাধাইয়া দিবে। সপ্তদশ শতাব্দীতে সমগ্র জগতকে যেন পরা-ধীনতার নীহারিকাসাগর আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভগবান যেন সেই সাগর মন্থন করিয়া ভীষণ হত্যা প্রভৃতি হলাহলের সঙ্গে পরিণামে স্বাধীনতারূপ অমৃত বাহির করিয়া উপযুক্ত পাত্রগণের হস্তে তাহার রক্ষণভার এবং ভোগাধিকার প্রদান করিলেন।

বলা বাহুল্য যে উপরোক্ত ঘটনাগুলি ইংলণ্ডকে বিশেষভাবেই স্পর্শ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাস-পাঠকগণের নিকট ইহা অজ্ঞাত নাই। ইহা ব্যতীত ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে আয়র্লণ্ড কয়েক বৎসরের জন্য একই রাজার অধীনে থাকিয়াও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল।

চতুর্দিকে এইরূপ স্বাধানতা বিস্তারের নানা কারণ ও উপায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সমবেত হইয়াছিল। এই সময়ে বিলাতে আর্করাইট

সুতার কল প্রস্তুত করিয়া কাপড়ের ব্যবসায়ে যেরূপ বিপ্লব আনিয়াছিলেন, সেইরূপ কার্টরাইট নামক এক পুরোহিত বস্ত্রবয়নের জন্য কলের তাঁত আবিষ্কার করিয়া ততোধিক বিপ্লব আনয়ন করিলেন। আবার, এই সময়েই ওয়াটসনের সুসংস্কৃত বাষ্পীয়-যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া জগতের পরিশ্রম শত-সহস্রগুণে লাঘব করিয়া দিল। নূতন নূতন অনেক যন্ত্রাদিও এই সময়ে নির্মিত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে স্বাধীনতার ভাব এবং প্রাকৃতিক শাক্তির জ্ঞান বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল।

এইবারে ভারতের তৎকালীন ঘটনাগুলি পর্য্যালোচনা করিব। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রকাশ্যভাবে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন। ইহা হইতেই বঙ্গের শাসনকার্য্যে প্রকৃতপক্ষে এক শৃঙ্খলা আসিল। এই বৎসরের পার্লামেণ্টের উদ্বোধনে রাজা ভারতের কথা মুখপাতেই উল্লেখ করিয়াছিলেন। ফলে, পরবৎসরেই পার্লামেণ্ট হইতে ‘রেগুলেটিং এক্ট’ নামক আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গেল। এই আইনের বলে ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথম বড়লাটের পদে বসিলেন। তাঁহার সভায় চারজন সদস্য লওয়া স্থির হইল। সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং তাহার প্রধান বিচারক একজন ও আর তিনজন নিম্নতন বিচারক রাখা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এখন ইংরাজ শাসনপ্রণালী পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতির পথে ধাবিত হইল। ইংরাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা অধিকারের পর নানা কারণে ইংরাজ ও মুসলমান উভয় প্রকার শাসন প্রণালী বহুকাল যাবৎ পাশাপাশি চলিয়াছিল। এইরূপ শাসনপ্রণালীর ফলে দেশের যে কিরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা বঙ্গের ইতিহাসে চির খোদিত থাকিবে।[৪] ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে, অনেকে বলেন যে এই শাসন

৪ It would be difficult, indeed to point out the vices of such a system. Natives and Europeans alike took advantage of it. There was no responsibility and no control. The strong preyed upon the weak, and the weak had none to look up to for protection. Misgovernment brought its wonted bitter fruit, and the revenue soon began to decline.

The Administration of the East India Company by John William Kaye, P. 80—1

প্রণালীরই দোষে, যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহাতে দুই মাসের মধ্যে কলিকাতার পথে অন্যূন ছিয়াত্তর হাজার লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। "এরূপ দুর্ভিক্ষ এদেশে আর হয় নাই। ১২৭৬ বঙ্গাব্দে ঘটিয়াছিল বলিয়া এই দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তুরে মম্বন্তর' নামে চিরদিন বাঙ্গালীর মনে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সেই ভয়ানক মহামারীর বিশেষ বর্ণনা এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত এই নয়মাসের মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় এক কোটী লোকের এবং কেবলমাত্র কলিকাতা নগরে ১৫ই জুলাই হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭৬০০০ লোকের মৃত্যু হয়। এরূপ হৃদয় বিদারক দৃশ্য কেহ কখনও দেখে নাই। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, খানা খন্দে, দলে দলে মানুষ মরিয়া পড়িয়া থাকিত; ফেলিবার লোক পাওয়া যাইত না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, নব-প্রতিষ্ঠিত ইংরাজরাজগণ এই মহামারী নিবারণের বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই।"[৫] কেবল নিবারণ করেন নাই নহে, তাহার পর বৎসরেই মৃতব্যক্তিগণের নিকট বাকী পড়া খাজনা অবশিষ্ট লোকের নিকট কড়ায় গণ্ডায় আদায় করা হইয়াছিল।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী গ্রহণ করিবার পর খাজাঞ্চীর অফিস ও তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র সকলই মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনীত হইল এবং এই সময় অবধি কলিকাতা বঙ্গের রাজধানী হইল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রেগুলেটিং এক্ট অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইল।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চার্টার এক্টের ফলে বড়লাট এবং প্রাদেশিক লাটগণের ক্ষমতা ও অধিকার আরও স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এই আইনের অধীনে লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত আইনের খসড়াসমুহ বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে সাধারণে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহা বড় কম কথা নহে। এই বৎসরেই লর্ড কর্ণওয়ালিস

৫ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

ডিরেক্টরদিগের অনুমতি পাইয়া চিরস্থায়ী রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া বঙ্গের চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। এই বৎসরেই কলিকাতার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।[৬] কলিকাতার পক্ষে এই বৎসর বিশেষ স্মরণীয়। জাষ্টিস অব দি পীস্ (Justice of the Peace) এই বৎসর নিযুক্ত হইয়া কলিকাতার ট্যাক্স ধার্য্য এবং পথ ঘাটের উন্নতি প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ করেন।[৭]

উপরে যে সকল ঘটনার কথা উল্লেখ করিলাম তাহা হইতে রাম-মোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর এই মহাপুরুষদ্বয়ের আবির্ভাবে মধ্যবর্ত্তী কালের দুইটি মধ্যবিন্দু দেখিতে পাই—একটি, স্বাধীনতা-বিস্তার এবং দ্বিতীয়টি শৃঙ্খলা সংস্থাপন। ভারতের, অন্তত বঙ্গদেশের পক্ষে আমরা উভয় মহাপুরুষেরই জীবনে এই দুইটি মূল মন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। বঙ্গবাসীদিগের উপযোগী স্বাধীনতা বিস্তার ও শৃঙ্খলা-স্থাপনের মন্ত্র ভগবান উভয় মহাপুরুষকেই প্রচুর পরিমাণে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন—বঙ্গদেশ তজ্জন্য গৌরবান্বিত হইয়াছে। এই দুই ব্যক্তিই উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের যেন মুখপত্র হইয়া জন্মিয়াছিলেন—ইহারা ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ যেন এই দরিদ্র বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

৬ Census Report 1901—Vol VII—P 52

৭ Census Report—P. 72

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাল্য জীবন

ঈশ্বরানুগৃহীত বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও সাময়িক অবস্থা বা পরিপার্শ্ব যদি দ্বারকানাথের অনুকূল না হইত, তাহা হইলে আজ আমাদিগকে তাঁহার জীবনী লিপিবদ্ধ করিতে হইত কিনা সন্দেহ। পরিপার্শ্বের গুণে মহাপুরুষের যোগ্যতা অভিব্যক্ত হয়। দ্বারকানাথ যদি তাঁহার জন্মকালের শতাব্দী অগ্রপশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিজের উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পাইতেন কিনা এবং সুতরাং মহাপুরুষের আসন গ্রহণে সমর্থ হইতেন কিনা সন্দেহ। নেপোলিয়ন যদি নিজ জন্মের শতাব্দী অগ্রপশ্চাৎ ভূমিষ্ঠ হইতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহার বীরত্ব কাহিনীতে পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইত কিনা সন্দেহ। লুথর স্বীয় জন্মকালে জন্মগ্রহণ না করিলে তাঁহাকে কখনই পোপ পূজার প্রতিবাদী ও স্বাধীনতার পতাকাধারী মূর্তিতে দেখিতে পাইতাম না। বিধাতার ইচ্ছার পরিপার্শ্ব অনুকূল না হইলে যোগ্যতমের যোগ্যতা অভিব্যক্ত হয় না, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হয় না।

পরিপার্শ্বের অনুকূলতা হয় কিসে? আপাতত শুনিতে বিসদৃশ লাগিলেও ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য যে মহাপুরুষগণ পরিপার্শ্বের প্রতিকূলতাতেই অনুকূলতা লাভ করেন। শক্তির উপযুক্ত প্রতিকূল বাধাপ্রাপ্ত হইলেই মহাপুরুষদিগের অন্তর্নিহিত তেজোরাশি সংহত ও সংবৃদ্ধ হইতে হইতে উপযুক্ত কালে সেই বাধা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলে। স্রোতস্বতী যতক্ষণ বাধা প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ তাহার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। গন্তব্যপথে বাধা পাইলেই তাহার অন্তর্নিহিত তেজ সংহত হইয়া উপযুক্ত সময়ে উদ্বেল হইয়া গ্রাম-পল্লী-নগর সমূহ যে কি প্রবল বেগে ভাসাইয়া দিতে পারে, সে ক্ষমতা যে কি ভয়ানক, তাহা

আজ কয়েক বৎসর গত হইল কাশ্মীরাঞ্চলের গহনা হ্রদের প্লাবনেই সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে।

দ্বারকানাথেরও বাল্যজীবনে পরিপার্শ্ব প্রতিপদে প্রতিকূল হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার রুদ্ধ ও সংহত শক্তি যথাকালে সেই সকল প্রতিকূল শক্তিকে অতিক্রম করিয়া স্বদেশকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উর্ব্বর করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুভক্ষণে ভগবান্ ইংরাজ জাতিকে এদেশের প্রভু করিয়া পাঠাইয়াছিলেন—দ্বারকানাথ বাধাসকল অতিক্রম করিবার চেষ্টায় ইংরাজদিগের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। দ্বারকানাথের পরিপার্শ্ব যে কতকটা প্রতিকূল ছিল এবং কিরূপে তাহারা অনুকূলতা করিবার অবসর পাইয়াছিল, তাহা "সেকালে" বঙ্গের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই অনেকটা হৃদ্গত হইবে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের প্রথম ফল ফলিয়াছিল; আমরা ইংরাজ অভ্যুদয়ের প্রারম্ভ অবধি হিন্দু কলেজের এই প্রথম ফল ফলিবার কাল পর্য্যন্ত "সেকাল" নামে অভিহিত করিব।[1] বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা সংক্ষেপে সেই অবস্থা দুই দিক দিয়া দেখিব—এক, তৎকালে বঙ্গের এবং কলিকাতার পথঘাট কি অবস্থায় ছিল; এবং দ্বিতীয়ত, বঙ্গের এবং কলিকাতার অধিবাসীদিগের মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থাই বা কিরূপ ছিল।

আজ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সকল বঙ্গবাসী জন্মগ্রহণ করিতেছে, বলিতে গেলে, তাহারা ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি গ্যাস ও তড়িতালোকে আলোকিত, তড়িত ট্রাম গাড়ী শোভিত, মস্তকোপরি তড়িতবাহী তার সমূহে বিক্ষত গগন এবং শতশত পুষ্করিণীর পরিবর্ত্তে মধ্যে মধ্যে চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ উদ্যানশোভিত ও বিশুদ্ধ জল প্রবাহী নলের দ্বারা পরিবৃত দেহ এই কলিকাতা নগর দেখিয়া দেখিয়া এমনি অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে যে, দ্বারকানাথ ঠাকুর কিরূপ কলিকাতায় বাল্যজীবন কাটাইয়াছিলেন, তাহা তাহারা কল্পনা করিতে পারিবে

১ অবস্থা বিবেচনায় এই কালের অগ্রপশ্চাৎ দশ কুড়ি বৎসরও প্রয়োজন মত এই "সেকালেরই" অন্তর্ভুক্ত ধরিব।

কিনা সন্দেহ। আজ বঙ্গের কত নগরে কলের জল এবং উজ্জ্বল গ্যাস বা তড়িতালোক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করিতেছে। আজ বঙ্গের কত নগর পল্লীর বক্ষ বিদারণ পূর্ব্বক রেলগাড়ী অসংখ্য যাত্রী ও মাল পাইয়া হুহু শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, এক মাসের পথকে একদিনে অতিক্রম করিতেছে, শত শত মাইল ব্যবহিত দেশ সমূহকে এক প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ করিবার অবসর প্রদান করিতেছে। "সেকালে" এই সকল ঘটনার সম্ভাবনা স্বপ্নেও অগোচর ছিল।

ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রকাশ্যরূপে দেওয়ানী গ্রহণের ফলে কলিকাতায় খাজাঞ্চীখানা উঠিয়া আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বলিতে গেলে কৃষ্ণনগর হিন্দুবঙ্গের এবং মুরশিদাবাদ মুসলবঙ্গের রাজধানী ছিল। অনুসন্ধানে যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে অনুমান হয় যে সেকালে রাজধানীগুলিরও পথঘাট অধিকাংশই সরু ও কাঁচা ছিল, এবং তাহাদের নিয়মিত সংস্কার ব্যবস্থাও ছিল না। যদি কোন রাজার এই সকল পূর্ত্তকার্য্যে দৈবাৎ মনোযোগ পড়িল, তবেই সেই একবারের জন্য তাহা সম্পন্ন হইল।

যখন রাজধানীরই এই অবস্থা, তখন বঙ্গের অন্যান্য ক্ষুদ্রনগর বা পল্লীগ্রামের পথঘাটের অবস্থা যে অতীব শোচনীয় ছিল, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। বলিতে গেলে, সেকালে সমগ্র বঙ্গদেশে একটি মাত্র সুপ্রশস্ত রাজপথ বিদ্যমান ছিল—তাহার বর্ত্তমান নাম গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড। এই পথ সর্ব্বপ্রথম দিল্লীর বাদশাহ শেরশাহ প্রস্তুত করান। গঙ্গানদীর গতি অবলম্বনে নির্মিত হওয়া বশত ইহা অত্যন্ত বক্রগতি হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত স্থলপথে তখন ঠগ ও ডাকাইতের হস্তে প্রাণহরণের বড়ই ভয় ছিল, এই কারণে সচরাচর লোকে স্থলপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৌকায় জলপথে দেশান্তরে যাত্রা করিত। অবশ্য ধনী লোকেরা অনেক লোকজন সঙ্গে লইয়া স্থলপথেও পাল্কী সাহায্যে যাত্রা করিতেন। যাহা হউক একমাত্র রাজ পথটি অনেকটা অব্যবহৃত হওয়ায় ক্রমশঃ ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন ডাক, পাল্কী প্রভৃতির সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তখনও পূজ্যপাদ পিতামহদেব কাশীযাত্রার বিষয়ে লিখিয়াছেন যে "১৪ দিনে অতিকষ্টে" কাশী পৌঁছিয়াছিলেন।[২]

বঙ্গদেশের প্রধানতম রাজপথের তো এই দুর্দ্দশা। আর, কলিকাতা তো উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত "বুড়ুনীয়া জলা" মাত্র ছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে পথঘাটের উন্নতি ও সংস্কার ব্যবস্থার সূত্রপাত হইল। তাহার পূর্ব্বে বহুকাল যাবৎ পূর্ব্বোক্ত রাজপথেরই অনুবর্ত্তনে নির্মিত এক কাঁচা রাজপথ বরাবর কালীঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ইহা ব্যতীত অপর কোন প্রশস্ত পথ ছিলই না। ইংরাজেরা সেকালে যে অংশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল (বর্ত্তমান লালদীঘী অঞ্চলে) সেই অংশে মাল বোঝাই করিবার জন্য দুএকটি ছোট খাটো গরুর গাড়ীর যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল মাত্র। এতদ্ব্যতীত যখন বর্গীদিগের ভয়ে "মারহাট্টা ডিচ্" নিখাত হয়, তখন তাহার মাটি লইয়া কলিকাতার পূর্ব্বসীমায় সার্কুলার রোড প্রস্তুত হয়। লালদীঘীর চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান এবং সার্কুলার রোড, এই দুইটি স্থান সাহেব-এবং বাঙ্গালী ধনীদিগের বায়ুসেবনের স্থান ছিল।

বলাবাহুল্য যে কলিকাতা যখন বুড়ুনী জলা ছিল, তখন নদীতীরে নৌকা লাগাইবার ঘাটের অভাব থাকা সম্ভব নহে। আর বাস্তবিকও চাঁদপাল ঘাট, পাথুরিয়া ঘাট, নিমতলা ঘাট প্রভৃতি প্রায় দশ বারোটি ঘাটের অস্তিত্ব ইংরাজ আগমনের প্রথমাবধি দৃষ্ট হয়।

কলিকাতাকে বসতির উপযুক্ত করিবার জন্য ইংরাজগণ বাঁধ প্রভৃতির সাহায্যে গঙ্গাস্রোত ভিতরে আসা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে জলার ভিতরের জল নির্দোষ রূপে বাহির করিবার উপায় করিতে পারেন নাই। এই কারণে সেকালের কলিকাতা

[২] মহর্ষিদেবের আত্মজীবন চরিত পৃঃ ৭৩

ভীষণ ম্যালেরিয়ার আধার হইয়াছিল। ইহার উপর গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য অসংখ্য পুষ্করিণী কাটা হইয়াছিল—সেই সকল পুষ্করিণীর পচা জলে যে কি অস্বাস্থ্যকর হইয়াছিল, তাহা একমুখে বলা যায় না। সহরের আবর্জ্জনারাশি যেখানে সেখানে স্তুপাকার হইয়া পচিতে থাকিত এবং যেখানে কোন প্রকার নালা নর্দ্দমা, সেইখানেই গলিত শবদিগের পরদিন পড়িয়া থাকিতে দৃষ্ট হইত। সে সকল অপসারিত করিবার উপায় ছিল হাড়গিলা পক্ষী! এই কারণে হাড়গিলা পাখী বধ করা আইন বিরুদ্ধ ছিল।

কলিকাতার স্বাস্থ্য অত্যন্ত মন্দ হইলেও সেকালে সাধারণতঃ বঙ্গদেশের স্বাস্থ্য বিশেষ খারাপ ছিল না, বরঞ্চ ভালই ছিল। যে সকল স্থান আজ ম্যালেরিয়ার প্রকোপে শ্মশানভূমি হইয়া পড়িয়াছে, সেই সকল স্থান সেকালে স্বাস্থ্য নিবাস ছিল। বর্দ্ধমান আজ ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণে জর্জ্জরিত, এককালে সেখানে লোকে স্বাস্থ্যের জন্য, বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়া বাস করিত—তখন লোকে দার্জ্জিলিং জানিত না। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে তখন ও বঙ্গদেশ রেলওয়ের লৌহনিগড়ে গ্রথিত দেহ হয় নাই। দেশের দূষিত পদার্থ সকল অসংখ্য নালা খাল প্রভৃতি নৈসর্গিক নর্দ্দমার সাহায্যে ধৌত হইয়া যাইত। কলিকাতার ভিতরেও সাহেবদিগের অপেক্ষা স্বদেশীয়দিগের স্বাস্থ্য অনেক ভাল ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে এক বৎসর কলিকাতাবাসী বারশত সাহেবের মধ্যে চারিশত সাহেব মারা গিয়াছিল। তদানীন্তন ইংরাজদিগের চিত্ত বিনোদনের অবলম্বন ছিল মদ্য ও ব্যভিচার। তাঁহারা মদ্য বিশুদ্ধ পান করিয়া ভাবিতেন যে এই উপায়ে রোগের হস্ত হইতে মুক্ত থাকিবেন। মদ্য ও তদানুষঙ্গিক দোষসমূহ সেকালে স্বদেশীয়গণের মধ্যে নিতান্তই অপ্রচলিত ছিল। ইহা ব্যতীত তখন আহারীয় সকল যেমন সস্তা ছিল, লোকেও সেইরূপ অল্পেতে সন্তুষ্ট হইত এবং পরিশ্রম করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। প্রয়োজনে দুইতিন ক্রোশ হাঁটিয়াই ক্লান্ত হইত না। সেকালে গাড়ী ঘোড়া অতি ধনী লোকেই

রাখিতে পারিত। বেশ্যা রাখা সেকালের ধনীদের মধ্যে একটি প্রচলিত প্রথা এবং অহঙ্কারের বিষয় হইলেও ব্যভিচার তেমন ছিল না। বারাঙ্গনাগৃহে ধনী ব্যক্তি অপর পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের সহিত গল্পগুজব করিয়া পান-তামাক খাইয়া চলিয়া আসিতেন। বারাঙ্গনা গৃহ যদি প্রকৃতই ব্যভিচারগৃহ মাত্র হইত, তাহা হইলে য়ুরোপীয়গণের আগমনের বহুপূর্ব্বেই 'ফেরিঙ্গী' রোগের প্রতাপ ভারতবাসীগণ অনুভব করিতে পারিতেন। সেকালের ৺রাজনারায়ণ বসু মহোদয় বলিয়াছেন "সেকালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত; এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। বেশ্যাগমন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ বেশ্যা সংখ্যার বৃদ্ধি। পূর্ব্বে গ্রামের প্রান্তে দুই এক ঘর বেশ্যা দৃষ্ট হইত; এক্ষণে পল্লী গ্রামে বেশ্যার সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও এই পাপ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে।"[৩]

এইবারে কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, বঙ্গের তদানীন্তন অধিবাসী-দিকের মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা আলোচনা করিব। প্রথমত আমরা ইংরাজদিগের কথা বলি। সেকালের ভারতবাসী ইংরাজগণ দুর্নীতির আধার ছিলেন—গবর্ণর জেনারেল হইতে নিম্নতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত। মদ্য ও ব্যভিচার যাঁহাদিগের বামে ও দক্ষিণে তাঁহারা যে দুর্নীতিপরায়ণ হইবেন, ইহা কি আর অধিক কথা? ঘুষের তো কথাই ছিল না। যে নবাব যত অধিক ঘুষ দিতে পারিবে, তাহাকেই সিংহাসনে বসান হইল। একবার একটি ইংরাজ কর্ম্মচারী নিজের গাড়ী এক নবাবকে দশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন। ইহার উপর সেকালের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট (অথবা রাজ কর্ম্মচারীদিগের) ক্ষমতাই বা কি ছিল! লর্ড মেকলে বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট তখন ইচ্ছা করিলেই যাহার তাহার বধ সাধন করিতে পারিতেন। অগত্যা

৩ রাজনারায়ণ বসু, সেকাল ও একাল

তাঁহাদের অধীনস্থ দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের নীতি তাঁহাদের সংস্পর্শে যে ক্রমে বিগড়াইয়া যাইবে, ইহা স্বভাব সিদ্ধ। কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, লবণ বিভাগে ৩৫৲ টাকার চাকরীর জন্য ইউরোপীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগকে মাসিক ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। সেকালে বিলাতে এদেশ হইতে যাইতে ছয় মাস এবং অন্যূন দুইটি হাজার টাকা কেবল জাহাজ ভাড়া লাগিত। আবার ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন এত অল্প ছিল যে অনেকে প্রদীপ জ্বালিবার খরচের অভাবে সন্ধ্যা হইতেই মশারির আশ্রয় লইতেন। তাহার উপর বাধ্য হইয়া বাবুয়ানা করিতে হইত—চারজন সাহেবের জন্য সেকালে ১১০ জন চাকর রাখা হইত। আর, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রতাপে সকলে ভীত—আজ যে আছে, কাল হয় তো সে নাই। এই সকল কারণে ইংরাজগণ ঘুষ লইয়া হউক বা অন্য যে কোন উপায়ে হউক কিছু অর্থ রোজগার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নবাবের মত কাটাইতে পারিলেই সন্তুষ্ট। তখন জুয়াখেলা একটা প্রধান ভব্যতার অঙ্গ ছিল। এইভাবে গঠিত হইলে দুর্নীতি নিশ্চয়ই প্রশ্রয় পাইবে। যেখানে দুর্নীতি সেইখানেই অশান্তিও অবশ্যম্ভাবী। বাস্তবিকই, সেকাল কি ভায়ানক অশান্তির কাল গিয়াছে—আজ যে জমিদার, কাল সে হয়তো পথের ভিখারী। সাহেবদিগের মাথা অর্থাভাবে ও দুশ্চিন্তায় সর্ব্বদাই সপ্তমে চড়িয়া থাকিত। বর্ত্তমানকালে তাঁহাদের মাথা ঠাণ্ডা করিবার দুইটি প্রধান উপায়ের বড়ই অভাব ছিল—বরফ ও টানা পাখা।[৪] ইহা ব্যতীত যে প্রথা মানবের মনুষ্যত্ব হরণ করিয়া লয়, সেই নিষ্ঠুর ক্রীতদাস রাখিবার প্রথাও বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল—এমন কি, অনেকে বিক্রয়ের জন্য ক্রীতদাসের পাল তৈয়ার করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

৪ বরফ ১৮৩২ সালে প্রথম আমেরিকা হইতে আনীত হইয়া দুইআনা সের বিক্রীত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে অতিকষ্টে এদেশে বরফ প্রস্তুত হইত বটে, কিন্তু তাহার মূল্য দৈনিক আট সের লইলে মাসিক ৩০০৲ টাকা। Spry Vol. 1,190—3.

টানা পাখা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ অবধি প্রচলিত হইতে দৃষ্ট হয়। Busled—P. 128.

এই তো গেল সেকালের ইংরাজদের কথা। এখন সেকালের বাঙ্গালীদিগের অবস্থা বলি। কলিকাতায় বাঙ্গালীগণের অনেকেই কোন না কোন কারণে ইংরাজদিগের সহিত সংস্পর্শে আসিতে বাধ্য হইত। যাহাদিগকে সর্ব্বদাই আদালতে, কাছারীতে যাইতে হইত, তাহারা ক্রমশ সংস্পর্শবলে ইংরাজদিগের দোষ সকল পাইতে লাগিল —গুণ অনুকরণ করা সাধারণের সহজে সাধ্যায়ত্ব হয় না। বিশেষত তখনকার ইংরাজগণ বাধ্য হইয়া বাঙ্গালীদের সহিত একেবারে মিশিয়া যাইতেন। কোন একটা যুদ্ধ জয় হইলে ঠাকুর পূজা হইত; অফিস সকালে বিকালে বসিত। মেকলে প্রভৃতি ইংরাজগণ এই শ্রেণীর বাঙ্গালীদিগকে চক্ষের সমক্ষে রাখিয়া সকল বাঙ্গালী জাতিকে মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর, ঘুষখোর প্রভৃতি গালি দিয়া নিজেদেরই অসত্যপ্রিয়তা ও সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন।

প্রকৃত পক্ষে কলিকাতার স্বাস্থ্য খারাপ ছিল বলিয়া যেমন সমগ্র বঙ্গদেশ অস্বাস্থ্যকর ছিল না, সেইরূপ সেকালের ইংরাজদিগের পার্শ্বচর বাঙ্গালীগণ সহবাসগুণে দুর্নীতি পরায়ণ হইয়াছিল বলিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতি সেরূপ ছিল না, প্রত্যুত শান্তিপ্রিয়তা ও সুনীতি-পরায়ণতাই তাহাদের প্রধান গুণ ছিল। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে নীলমণি ঠাকুর মকর্দ্দমা করা অপেক্ষা নিজ প্রাপ্যও অনায়াসে ত্যাগ করিলেন। রামমোহন রায়ও তাঁহার স্বলিখিত জীবন চরিতে লিখিতেছেন যে "তাঁহারা (তাঁহার মাতামহ বংশীয়েরা) বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মচিন্তাতে অনুরত ছিলেন। সাংসারিক আড়ম্বরের প্রলোভন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অঙ্গ অপেক্ষা, তাঁহারা মানসিক শান্তি শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া আসিয়াছেন।" বিলাতে সাক্ষ্যদানকালেও তিনি বলিয়াছেন যে যতই সহর হইতে এবং জমিদারী কাছারী হইতে দূরে যাওয়া যায়, ততই লোকদিগকে নির্দ্দোষ, মিতাচারী এবং সুনীতিপরায়ণ দেখা যায়।[৫] আদালতের কর্ম্মচারীগণ যে ঘুষখোর

[৫] Ram Mohun Roy—II. P. 593 Mary Carpenter

হইতে, অন্যান্য কারণের মধ্যে তাহাদের বেতনের অল্পতা একটি গুরুতর কারণ ছিল। নিম্নতন বিচারকগণের বেতন ছিল মাসিক ১০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত। একটা পাল্কী রাখিবার খরচই তখন মাসিক কুড়ি ত্রিশ টাকা পড়িত।[৬] ভক্তিভাজন ৺রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ও বলেন যে "সে কালের লোকদিগের ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থা দৃষ্ট হইত।...সে কালে ধর্ম্মবিষয়ে, ভিতরে একখান বাহিরে একখান, এরূপ ছিল না। তখনকার ভট্টাচার্য্যগণ অতি সরল স্বভাব ছিলেন...তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্র অতি প্রগাঢ়রূপে জানিতেন এবং অতি সরল ও সদাশয় ছিলেন"।[৭] ইহার পর তিনি সেকালের ভট্টচার্য্যদিগের সরলতার বিষয়ে তিনটি সুন্দর গল্প দিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সাধারণত বাঙ্গালীরা কিছু মন্দ ছিল না, বরঞ্চ চরিত্র প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উন্নত ছিল। আর বাস্তবিক, তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে রামমোহন রায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতিকেই বা সহায় পাইলেন কিরূপে? সে সময়ে বিদ্বান পণ্ডিতলোকের মধ্যে বেদান্তভাবই ছিল, তাই তাঁহারা "অজ্ঞ লোকের বুদ্ধি ভেদ" করিতে ইচ্ছা করিতেন না, কাজেই কুসংস্কার সমূহের রাজত্ব অব্যাহত থাকিত। জনসাধারণের মধ্যে যে কুসংস্কার রাজত্ব করিত, তাহারই বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "তখন অন্ধকারের কাল, দ্বিপ্রহরা রজনীর কাল; এখন আমরা সে সময়ের ভাব বুঝিয়া ও বুঝাইতে পারি না, যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নামে সকলে খড়্গহস্ত হইত। বঙ্গভূমি নিবিড়ান্ধকারাবৃত অরণ্যভূমি ছিল; ভ্রষ্টাচারের পিশাচসকল তাহাতে রাজত্ব করিত।" এই সময়েরই বাবুদিগের চিত্র অঙ্কিত করিয়া কুললক্ষণ পরিচায়ক শ্লোকের অনুকরণে একটি শ্লোক প্রচলিত হইয়াছিল—

"মুনিয়া, বুলবুল, আখড়াই গান,
খোস পোশাকী, মেলামীদান,

৬ Ram Mohun Roy II. 528 Mary Carpenter

৭ রাজনারায়ণ বসু, সেকাল আর একাল

আড়ী, খুড়ী, কানন, ভোজন,
এই নবোধা বাবু লক্ষণ।”

রামমোহন রায়ের অথবা দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমকালে যদি সাধারণ বঙ্গবাসী সর্ব্বাংশে দুশ্চরিত্রই হইত, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের পরবর্ত্তী পুরুষের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামদুলাল সরকার, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি চরিত্রবীর, উদ্যোগী কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর মহাপুরুষদিগের জন্মগ্রহণ সম্ভব হইত না। হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বাঙ্গালীগণ যে সংযত জীবনযাপন করিতেন তাহারই ফলে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজের সংস্পর্শে পড়িয়া এবং বিশেষত হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের প্রারম্ভকালে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারই ফলে আজকাল এই দরিদ্র বঙ্গদেশে মহাপুরুষের দুর্ভিক্ষ পড়িয়া গিয়াছে। ঈমার্শন ঠিকই বলিয়াছেন যে, যেকালে নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেকালে তাঁহার জন্মগ্রহণে প্রত্যেক অধিবাসীই এক একটি ক্ষুদ্র নেপোলিয়ন হইয়াছিলেন। যেকালে এই বঙ্গদেশে রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম হইয়াছিল, সেকাল সত্য সত্য অন্ধকারাচ্ছন্ন কাল হইতে পারে না—সেকালের এই বঙ্গের প্রত্যেক অধিবাসীই এই সকল মহাপুরুষের গুণ সমূহের কিছু না কিছু অধিকারী ছিলেন। মহাপুরুষগণ স্বজাতির প্রতিনিধি মাত্র—স্বজাতির গুণাবলী সংহত হইয়া মহাপুরুষে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রকাশ লাভ করে। সেকালেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর এবং রামপ্রসাদ সেন। সেকালেই হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, কমলাকান্ত চূড়ামণি, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের আবির্ভাব।

যাই হৌক্, আদালত, কাছারী প্রভৃতি অফিসের ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং তাঁহাদের পার্শ্বচর বাঙ্গালীদিগের মধ্যেও যে সকল দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়াছিল, দ্বারকানাথের জন্মকাল অবধি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা উপায়ে সেই সকল দূর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সুনীতি প্রবর্ত্তনের বিশেষ চেষ্টা হইয়া আসিতেছে এবং ১৮০৫ সালের মধ্যে লর্ড ওয়েলেসলী সমগ্র ভারতে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া ভারতের নব্যযুগের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের বাল্যকাল যেমন সেকালের পল্লীগ্রামের সুনীতির মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়াছিল, দ্বারকানাথের বাল্যকাল ইংরাজ প্রবর্ত্তিত নব্য শাসন যুগের সুনীতির বাতাসে ক্রীড়া করিবার অবসর পাইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দ্বারকানাথের বিদ্যাশিক্ষা

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন তাঁহার উন্নতির শিখরে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন এই বঙ্গদেশে বিদ্যাশিক্ষার অভূতপূর্ব্ব বিস্তৃতি দেখিয়া কত না আনন্দ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা তেমনই বিঘ্নসঙ্কুল ছিল। সচরাচর বালকগণ পঞ্চম হইতে অষ্টম বর্ষের মধ্যে 'হাতেখড়ি' লাভ করিয়া পাঠশালায় প্রেরিত হইত। ধনীলোকের গৃহেই অধিকাংশ স্থলে পাঠশালা বসিত, সুতরাং ধনী সন্তানদিগের বাটী ছাড়িয়া স্থানান্তরে পাঠশালায় পড়িতে যাইতে হইত না।

পণ্ডিতবর শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় সেকালের পাঠশালার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদান করিলাম। "সচরাচর বর্দ্ধমান জেলা হইতে কায়স্থ জাতীয় গুরুগণ আসিতেন। তাঁহারা আসিয়া কোনও ভদ্র গৃহস্থের গৃহে বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিতেন। প্রাতে ও অপরাহ্নে পাঠশালা বসিত। একমাত্র শিক্ষক গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে মধ্যস্থলে একটি খুঁটি ঠেসান দিয়া বসিয়া থাকিতেন। সর্দ্দার পড়ুয়ারা অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর বালকেরা সময়ে সময়ে শিক্ষকতা কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিত। বালকেরা স্বীয় স্বীয় মাদুর পাতিয়া বসিয়া লিখিত। লিখিত এই জন্যও বলিতেছি, তৎকালে পাঠ্যগ্রন্থ বা পড়িবার রীতি ছিল না। কিছুদিন পাঠশালে লিখিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানগণ টোলে গিয়া ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিত, এবং যাঁহারা সন্তানদিগকে রাজকার্য্যের জন্য শিক্ষিত করিতে চাহিতেন, তাঁহারা তাহাগিদকে পারসী পড়িতে দিতেন। যাহারা জমিদারী সরকারে কর্ম্ম করিতে বা বিষয় বাণিজ্যে নিযুক্ত হইতে চাহিত, তাহারাই শেষ পর্য্যন্ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালে থাকিত।

"পাঠশালে পাঠনার রীতি এই ছিল যে, বালকেরা প্রথমে মাটিতে খড়ি দিয়া বর্ণ পরিচয় করিত, তৎপরে তালপত্রে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তবর্ণ, শটিকা, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া প্রভৃতি লিখিত; তৎপর তালপত্র হইতে কদলীপত্রে উন্নীত হইত; তখন তেরিজ, জমাখরচ, শুভঙ্করী, কাঠাকালী, বিঘাকালী প্রভৃতি শিখিত; সর্ব্বশেষে কাগজে উন্নীত হইয়া চিঠিপত্র লিখিতে শিখিত ;...

"তৎকালের গুরুমহাশয়গণ বর্ত্তমান স্কুলসমূহের শিক্ষকগণের ন্যায় কোনও কমিটি বা কোনও ব্যক্তির নিকট নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইতেন না। প্রত্যেক গৃহস্থ আপন আপন বালককে বা বালকদিগকে পাঠশালে দিবার সময় গুরুমহাশয়ের সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতেন। এইরূপে মাসে সামান্য ১০।১২ টাকা আয় হইত। তৎপরে যাত্রা, মহোৎসব, পার্ব্বণ, বা পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে উপরি কিছু কিছু জুটিত। তাহাতেই গুরুমহাশয়দিগের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। অনেক স্থলে এইরূপ ঘটিত যে, যে ছেলে লুকাইয়া গুরুমহাশয়কে যত দিতে পারিত, সে তত তাঁহার প্রিয় হইত। সে অনুপস্থিত থাকিলে বা পাঠে অমনোযোগী হইলেও সমুচিত সাজা পাইত না। যে সকল বালক কিছু দিতে পারিত না, তাহাদিগকে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। উঠিতে বসিতে, নড়িতে চড়িতে, গুরুমহাশয়ের বেত্র তাহাদের পৃষ্ঠে পড়িত। হাতছড়ি লাড়ুগোপাল, ত্রিভঙ্গ প্রভৃতি সাজার বিবিধ প্রকার ও প্রণালী ছিল। পাঠশালে আসিতে বিলম্ব হইলে হাতছড়ি খাইতে হইত; অর্থাৎ আসন পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে গুরুমহাশয়ের সমক্ষে দক্ষিণ হস্তের পাতা পাতিয়া দাঁড়াইতে হইত, অমনি সপাসপ্, পাঁচ বা দশ ঘা বেত তদুপরি পড়িত। এই গেল হাতছড়ি। লাড়ুগোপাল আর এক প্রকার। অপরাধী বালককে গোপালের ন্যায় অর্থাৎ চতুষ্পদশালী শিশুর ন্যায় দুই পদ ও এক হস্তের উপরে রাখিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তে একখানি এগার ইঞ্চি ইট বা অপর কোন ভারী দ্রব্য চাপাইয়া দেওয়া হইত; হাত ভারিয়া গেলে, বা কোনও প্রকারে ভারী দ্রব্যটি স্বস্থানভ্রষ্ট

হইলে তাহার পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক গুরুতর বেত্র প্রহার করা হইত। ত্রিভঙ্গ আর এক প্রকার। শ্যামের বঙ্কিম মূর্ত্তির ন্যায় বালককে এক পায়ে দণ্ডায়মান করিয়া হস্তে একটি গুরুদ্রব্য দেওয়া হইত; একটু হেলিলে বা বারেক মাত্র পা খানি মাটিতে ফেলিলে অমনি পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র তুলিয়া কঠিন বেত্রাঘাত করা হইত। কোন কোনও গুরু ইহার অপেক্ষাও গুরুতর শাস্তি প্রদান করিতেন; তাহাকে চ্যাংদোলা বলিত। কোনও বালক প্রহারের ভয়ে পাঠশালা হইতে পালাইলে বা পাঠশালে না আসিলে এই চ্যাংদোলা সাজা পাইত। তাহা এই, তাহাকে বন্দী করিবার জন্য চারি পাঁচ জন অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্ক ও বলধান ছাত্র প্রেরিত হইত। তাহারা তাহাকে ঘরে, বাহিরে, পথে, ঘাটে বা বৃক্ষশাখায়, যেখানে পাইত সেখান হইতে বন্দী করিয়া আনিত। আনিবার সময় তাহাকে হাঁটিয়া আসিতে দিত না, হাতে পায়ে ধরিয়া ঝুলাইয়া আনিত। তাহার নাম চ্যাংদোলা। এই চ্যাংদোলা অবস্থাতে বালক পাঠশালে উপস্থিত হইবামাত্র গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে সেই অসহায় বালককে আক্রমণ করিতেন। এই প্রহার এক এক সময়ে এত গুরুতর হইত যে, হতভাগ্য বালক ভয়ে বা প্রহারের যাতনায় মলমূত্রে ক্লিন্ন হইয়া যাইত।

"১৮৩৪ সালে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, মিষ্টার উইলিয়ম এডামকে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শনার্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি পাঠশালা সকলের পরিদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি রিপোর্ট প্রেরণ করেন। তাহাতে প্রায় চতুর্দ্দশ প্রকার সাজা দিবার প্রণালীর উল্লেখ দেখা যায়। তাহার অনেকগুলির বিবরণ শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বালক মাটিতে বসিয়া নিজের একখানা পা নিজের স্কন্ধে চাপাইয়া থাকিবে; বা নিজের উরুর তল দিয়া নিজের হাত চালাইয়া নিজের কান ধরিয়া থাকিবে; বা তাহার হাত পা বাঁধিয়া পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র তুলিয়া জলবিছুটী দেওয়া হইবে, সে চুলকাইতে পারিবে না; বা একটা থলের মধ্যে একটা বিড়ালের

সঙ্গে বালককে পুরিয়া মাটিতে গড়ান হইবে এবং বালক বিড়ালের নখর ও দ্রংষ্ট্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।"[১]

দ্বারকানাথ ঠাকুরকে বাল্যকালে এই প্রকার ভীতিজনক নরকে একবার প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। রাধানাথ ঠাকুর তাঁহাকে রাজকার্য্যের উপযোগী করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। এই পাঠশালায় পাণ্ডিত্য লাভের পর তিনি উপযুক্ত মৌলবীর নিকট পারসী ও আরবী সুন্দররূপে শিক্ষা করিলেন। পারসী ও আরবী ভাষায় কথা কহিতে বা লিখিতে তিনি কোন প্রকার বাধ্য বোধ করিতেন না। তৎপরে শেরবোর্ণ সাহেবের বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিখিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। ইংরাজী ভাষা তখন রাজভাষা হইতে চলিয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে এই ভাষা ভাল করিয়াই শিখিতে হইয়াছিল। সম্ভবত শেরবোর্ণ সাহেবের নিকটে দ্বারকানাথ বিশেষ যত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে আজীবন পেন্সন প্রদান করিয়াছিলেন। শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুল চিৎপুর রোডে স্থাপিত ছিল। এখানে "Enfield's Spelling", "Reading Book", "Tooteenamah or Tales of the Parrot" "Universal Letter Writer", "Complete Letter Book", এবং "Royal English Grammar" এই কয়েকটি পুস্তক তাঁহাকে পড়িতে হইয়াছিল। বোধ হয় শেরবোর্ণ সাহেবের স্কুলেই সেকালে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষা হইত। তিনি সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় ইংরাজী স্কুল খুলেন এবং তাঁহারই নাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধিও লাভ করিয়াছিল।

সচরাচর সেকালে "সর্ব্বপ্রথমে লোকের ইংরাজী পড়িতে হইলে, টামস্ ডিস্ প্রণীত স্পেলিং বুক, স্কুলমাষ্টর, কামরূপা ও তুতিনামা এই সকল পুস্তক পাঠ করিতে হইত। 'স্কুলমাষ্টর' পুস্তকে সকলই ছিল, গ্রামার, স্পেলিং ও রীডর। কামরূপাতে এক রাজপুত্রের গল্প লিখিত ছিল। তুতিনামা ঐ নামের পারসিক পুস্তকের ইংরাজী

১ শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃষ্ঠা ৪

অনুবাদ। কেহ যদি অত্যন্ত অধিক পড়িতেন, তিনি আরবি নাইট পড়িতেন। যিনি রয়েল গ্রামার পড়িতেন, লোকে মনে করিত, তাঁহার মত বিদ্বান্ আর কেহ নাই। Grammar, Logic ও Rhetoric অর্থাৎ ব্যাকরণ, ন্যায় ও অলঙ্কার এই তিন বিষয়ে তখন কতকগুলি উত্তম পুস্তক রচিত হইয়াছিল। তাহাদের নাম Port Royal Grammar, Port Royal Logic ইত্যাদি। লোকে বলিত 'রয়েল গ্রামার ময়াল সাপ'; যেমন ময়াল সাপ বৃহৎ সাপ, তেমনি রয়েল গ্রামার পড়া অনেক বিদ্যার কর্ম্ম। তখন স্পেলিংএর প্রতি লোকের বড় মনেযোগ ছিল। বিবাহ সভায় এই বিষয়ে বড় পীড়াপীড়ি হইত। কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, How do you spell Nebuchadnezzar ? কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন, How do you spell Xerxes ? ঐ সকল শব্দ ও Xenophon, Kamschatka প্রভৃতি শব্দের বানান জিজ্ঞাসা দ্বারা লোকের বিদ্যার পরীক্ষা হইত। তখন ঐরূপ সভায় ইংরাজীওয়ালারা পরস্পর এই বলিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিতেন, 'What denomination put your papa ?' তখন শব্দের অর্থ মুখস্থ করিবার বিবিধ প্রণালী ছিল। যথা—

(একটি একটি শব্দের এক একটি অর্থ)—

গাড (God)—ঈশ্বর ; লার্ড (Lord)—ঈশ্বর
কম্ (Come)—আইস ; গো (Go)—যাও
আই (I)—আমি ; ইউ (You)—তুমি। ইত্যাদি।

এক একটি ইংরাজী শব্দের কতকগুলি অর্থও একেবারে সাধিতে হইত। যথা Well—আচ্ছা, ভাল, পাতকো ; Bear—সহ, বহ, ভল্লুক। সেকালের লোকেরা যাহার উচ্চারণ সমান মনে করিতেন, এমন কতকগুলি ইংরাজী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ একবারে অভ্যাস করিতেন। যথা—ফ্লোর (Flower) ফুল, ফ্লোর (Flour) ময়দা, ফ্লোর (Floor) মেজে। তাঁহারা 'Flower', 'Flour', 'Floor' এই তিন শব্দ একরকম উচ্চারণ করিতেন। তখন লোকে ডিক্‌ষনরি মুখস্থ করিত। তাঁহারা এক এক জনে

Walking Dictionary অর্থাৎ সচল অভিধান ছিলেন। তখন ঘোষাণোর রীতি ছিল। ঘোষাণোর অর্থ পয়ার ছন্দে গ্রথিত, কোন দ্রব্যশ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত দ্রব্যের ইংরাজী নাম সুর করিয়া মুখস্ত বলা। আপনি এক স্কুল দেখিতে গেলেন, স্কুলমাষ্টার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ঘোষাব ? গ্যার্ডেন (Garden) ঘোষাব, না স্পাইস্ (Spice) ঘোষাব ?' ইহার অর্থ, উদ্যানজাত সকল দ্রব্যের নাম মুখস্থ বলাব, না সকল মশলার নাম মুখস্থ বলাব ? যদি স্থির হইল গ্যার্ডেন ঘোষাও, তবে সর্দ্দার পোড়ো চেঁচিয়ে বলিল, 'পমকিন (Pumpkin) লাউকুমড়ো', অমনি আর সকলে বলিয়া উঠিল, 'পমকিন—লাউকুমড়ো' ;—সর্দ্দার পোড়ো বলিল, 'কোকোম্বর (Cucumber) শসা', আর সকলে অমনি বলিল, 'কোকোম্বর শসা'। সর্দ্দার পোড়ো বলিল, 'ব্রিঞ্জেল (Brinjal) বার্ত্তাকু', আর সকলে অমনি বলিল, 'ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু।' সর্দ্দার পোড়ো বলিল, 'প্লোম্যান (Ploughman) চাসা', আর সকলে অমনি বলিল, 'প্লোম্যান চাসা'। এই সকল শব্দগুলি একত্র করিলে একটি কবিতা উৎপন্ন হয়।—

পম্‌কিন লাউকুমড়া, কোকোম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল বার্ত্তাকু, প্লোমেন চাসা ॥

কখন কখন সঙ্গীত আকারে ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালা অর্থ বসান হইত। যথা—

খাম্বাজ রাগিণী—তাল ঠুংরি

নাই (Nigh) কাছে, নিয়র (Near) কাছে, নিয়রেষ্ট (Nearest) অতি কাছে, কট্ (Cut) কাট্, কট্ (Cot) খাট্, ফলোয়িং (Following) পাছে।

এছাড়া আবার 'আরবি নাইটের পালা' হইত, অর্থাৎ তবলা ঢোলক মন্দিরা লইয়া ইংরাজী পয়ারে লিখিত আরবিয়ান নাইটের গল্প বাসায় বাসায় গান করিয়া বেড়ান হইত।

'The chronicles of the Sassanians
That extended their dominions.'

এইরূপ পয়ারে উল্লিখিত আরবি নাইটের পালা রচিত হইত।"[২]

রাজনারায়ণ বসু মহোদয় আরো বলেন যে "ইংরাজদিগের যে সকল সরকার থাকিত, তাহাদের ভাষা ও কথোপকথন আরো চমৎকার ছিল। একজন সাহেব তাঁহার সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। সরকার বলিল—মাষ্টর ক্যান্ লিব্, মাষ্টর ক্যান্ ডাই (Master can live, Master can die) অর্থাৎ মনিব আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন, অথবা মারিয়া ফেলিতে পারেন। সাহেব 'what, master can die ?' এই কথা বলিয়া সরকারকে মারিবার জন্য লাঠী উচাইলেন। সরকারের তখন মনে পড়িল 'ডাই' শব্দের অন্য অর্থ আছে, তখন 'স্টাপ্ দেয়ার (Stop there) অর্থাৎ প্রহার করিতে লাঠী উঠাইও না, এই বলিয়া হাত উচু করিল, তৎপরে অঙ্গুলি দ্বারা আপনাকে দেখাইয়া বলিল, 'ডাই মি' (Die me) অর্থাৎ আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারেন। 'ইফ্ মাষ্টর ডাই, দেন আই ডাই, মাই কো ডাই, মাই ব্লাকষ্টোন ডাই, মাই ফোর্টীন জেনারেষণ ডাই।' (If master die, then I die, my cow die, my blakestone die, my fourteen generation die) অর্থাৎ যদ্যপি মনিব মরেন, তবে আমি মরিব, আমার কো অর্থাৎ গরু মরিবে, আমার ব্লাকষ্টোন অর্থাৎ বাড়ীর শালগ্রাম ঠাকুর মরিবেন, আমার ফোর্টীম্ জেনারেষণ অর্থাৎ চোদ্দ পুরুষ মরিবে। একবার রথের দিবস এক সরকার কামাই করে। পরদিন সে আইলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাল কেন আইস নাই?' সরকার রথের ব্যাপার কিরূপে বুঝাইবে ভাবিয়া আকুল। শেষে বলিয়া উঠিল, 'চর্চ্চ' (Church)। রথের আকার গির্জার মত, 'তাই কথাটি বুঝাইবার পক্ষে বড় উপায় হইল। কিন্তু চর্চ্চ বলিলে ইটের গাঁথুনি বুঝায়, এ জন্য পরক্ষণেই বলা হইল 'উডেন চর্চ্চ' অর্থাৎ কাষ্ঠের গির্জ্জা। তাহা হইলেও বুঝা গেল না; তখন তাহাকে আরো ব্যাখ্যা করিতে হইল—'থি ষ্টারিস্

২ রাজনারায়ণ বসু, সেকাল আর একাল।

হাই' (Three stories high)। 'গাড আলমাইটি সিট অপন্' (God Almighty sit upon) অর্থাৎ জগন্নাথ দেব বসিয়া আছেন, 'লাং লাং রোপ' (Long long rope), 'থৌজণ্ড মেন ক্যাচ্' (Thousand men catch), 'পুল পুল পুল' (Pull, pull, pull), 'রনাওয়ে রনাওয়ে' (Run away, run away), 'হরি হরি বোল—হরি হরি বোল।"

দ্বারকানাথ ইংরাজী ভাষায় এইরূপ টুকরো টাকরা শিক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না, তাই যথাসময়ে রামমোহন রায়ের বন্ধু উইলিয়াম এডাম, এবং শ্রীযুক্ত জে, জি, গর্ডন, জেম্‌স্ কলডার সাহেবদিগের নিকট ভাল করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিলেন। মেকিণ্টস বার্ণ কোম্পানী তখনকার অন্যতম প্রধান কুঠী ছিল—শেষোক্ত সাহেব-দ্বয় এই কুঠীর অংশীদার ছিল। আমরা শুনিয়াছি যে তিনি রুশীয় ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এত উত্তমরূপে ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন যে শ্রীযুক্ত রিকার্ড সাহেব তাঁহার "ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় সত্য" (Facts about India) নামক পুস্তকে ভারতবর্ষীয়দিগের ইংরাজী শিক্ষার দৃষ্টান্তস্থলে রামমোহন রায় এবং রাধাকান্ত দেবের চিঠির সঙ্গে ইঁহারও লিখিত চিঠি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

জমিদারী

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দ্বারকানাথের পালকপিতা তাঁহাকে অল্প বয়সে রাখিয়াই পরলোকগমন করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাধানাথ বিষয়সম্পত্তিগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া যথাসময়ে দ্বারকানাথের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন। রামলোচন ঠাকুর যে খুব বিস্তৃত জমিদারীর অধিকারী ছিলেন তাহা নহে, তবে জমিদারীগুলি নিতান্তও ছোট খাটো ছিল না। আমরা শুনিয়াছি যে প্রায় ষোল বৎসর বয়সে তিনি জমিদারীর কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সমুহ এই সামান্য জমিদারীতে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না।

পৈতৃক বিষয় দুইটি মাত্র—এক কুষ্ঠিয়ার অন্তর্গত বিরাহিমপুর পরগণা এবং দ্বিতীয় কটকের অন্তর্গত পাণ্ডুয়া ও বালিয়া দুইটি মহাল। যে সময়ে তিনি এই পৈতৃক বিষয়গুলি স্বহস্তে গ্রহণ করেন, সে সময়ে ইহাদের আয় অতি সামান্য ছিল—সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ত্রিশ সহস্র টাকা হইবে। ইহার উপর আবার বিরাহিমপুরের প্রজাগণ বরাবর দুর্বৃত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ—সহজে খাজানা আদায় করিতে চায় না। ইহার অধিবাসী অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। কথায় কথায় জোট বাঁধে এবং জমিদারকে খাজানা হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করে।

একবার এই বিরাহিমপুরের প্রজারা একজোট হইয়া জমিদারের খাজানা আদায় করিতে অস্বীকার করিয়া তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেটের সরেজমীনে তদন্ত করিবার প্রার্থনার সহিত এক দরখাস্ত করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সশরীরে আসিয়া একেবারে গ্রামের মধ্যস্থলে তাঁবু খাটাইয়া প্রজাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা তো

একে পায় তো আরে চায়। তাহারা তো একেবারে কাঁদিয়া পড়িয়া জমিদারের নায়েব গোমস্তাদিগের অত্যাচার কাহিনী সকল বর্ণনা করিয়া তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিল। সাহেব মহোদয় উভয় পক্ষ না শুনিয়াই প্রজাদিগের দুঃখে বিগলিত হৃদয় হইয়া পড়িলেন। এইখানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে জমিদার ও প্রজার মধ্যে কোন বিবাদ উপস্থিত হইলেই তদানীন্তন বিচারকগণ কথায় কথায় প্রজার পক্ষ, ন্যায় হউক বা অন্যায় হউক, সমর্থন করিতেন— ইহা একটা ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখনও যে এই ফ্যাশান একেবারে উঠিয়া গিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর প্রজাগণকে অভয়দান করিয়া তাহাদিগের আন্যায় কার্য্যে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

ভারতবর্ষ সিপাহী বিদ্রোহের পর প্রত্যক্ষভাবে মহারাণীর অধীনে আসিবার পূর্ব্বে অনেক ম্যাজিষ্ট্রেটেরই খুঁজিলে নানা দোষ পাওয়া যাইত। দ্বারকানাথ ম্যাজিষ্ট্রেটের পূর্ব্ব জীবন অনুসন্ধানপূর্ব্বক বাহির করিয়া দেখিলেন যে ইনি অনেকগুলি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছেন। এইখন প্রস্তুত হইয়া দ্বারকানাথ বিরাহিমপুরে গিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিরা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে কেবল খাজানা আদায় না করিবার জন্য এই একজোট হইয়াছে—ইহাতে যে কেবল তাঁহার নিজের ক্ষতি হইতেছে তাহা নহে, ঐ অঞ্চলের শান্তিভঙ্গেরও সম্ভাবনা আছে এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই একজোট ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য সাহার্য্য প্রার্থনা করিলেন।

মাজিষ্ট্রেট প্রত্যুত্তরে দ্বারকানাথকে আমলাদিগের হস্ত হইতে প্রজারক্ষণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। দ্বারকানাথ পুনরায় বুঝাইলেন যে প্রজাদিগের নালিসের কোন ভিত্তি নাই এবং তাঁহাকে খাজানা আদায়ের অধিকার প্রত্যর্পণ করিলে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে। ইহাতেও যখন সাহেব বাহাদুরের দুর্মতি অটুট থাকিল, তখন দ্বারকানাথ ধীরে ধীরে তাঁহাকে পূর্ব্ব জীবনের কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিয়া পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টের হস্তে সমর্পণ

করিবার ভীতি প্রদর্শন করাতেই সাহেব একেবারে নরম হইয়া গেলেন, জমিদারের সহায়তা করিলেন, শান্তি পুনঃ স্থাপিত হইল—বিরাহিমপুর পদাবনত হইল।

এই বিরাহিমপুর অনেকদিন যাবৎ তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছে ও বিরক্তির কারণ হইয়াছে দেখিতে পাই। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দেখি রাইস নামক এক ইংরাজ সওদাগরকে সাধারণভাবে এই বিরাহিমপুরের ম্যানেজার স্বরূপে রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন, বোধ হয় এই আশায় যে, সাহেব দেখিয়া প্রজাগণ ভয়ে 'সায়েস্তা' থাকিবে। এই বৎসর এপ্রিল মাসে দেখি প্রজারা পুনরায় এক জোট হইয়া যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট 'ইস্তফা' দিয়া আসিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সেইগুলি আবার তাহাদের নালিসের কারণ অনুসন্ধানের জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুরকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি প্রজাদিগের বদমায়েসী সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াও রাইস্ সাহেবকে তন্ন তন্ন করিয়া এই বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য পত্র লিখিলেন।

কেবল যে প্রজাদিগের দমনের জন্য তাহা নহে, বোধ হয়, পার্শ্বস্থ নীলকরদিগের সাহেবদিগের কবল হইতে জমিদারী ও নিজ প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্যও সাহেব কর্ম্মচারী রাখা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার স্বোপার্জিত সাহাজাদপুর পরগণার প্রজাগণ যতদূর শুনা যায়, আবহমানকাল অতীব নিরীহ, কিন্তু এই ১৮৩৬ সালে সেখানেও দেখি মিলার নামক এক সাহেবকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিতেছেন। তাঁহাকে যে উপদেশপূর্ণ একটি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে নীলকুঠী নির্ম্মাণ করাইবারও উপদেশ আছে।

এই মিলার সাহেবের বেতন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল মাসিক দেড়শত টাকা এবং নীলকুঠীতে যত টাকার কাজ হইবে, তাহার শতকরা দশ টাকা কমিশন।

এই সাহাজাদপুর পরগণা এবং সন্নিকটবর্ত্তী কালীগ্রাম পরগণা, এই দুইটি তাঁহার স্বোপার্জিত বিষয়। তাঁহার বিষয় বুদ্ধির পরিচয় এই যে এই দুইটি পরগণা যেমন লাভবান্, তেমনি এই দুইটিতে আয়

বাড়িবারও বিলক্ষণ পথ আছে এবং প্রজাগণও অতি শান্তশিষ্ট— বিরাহিমপুরের প্রজাগণের ন্যায় উদ্ধত নহে।

উপরোক্ত দুইটি জমিদারী ব্যতীত আরও কতকগুলি জমিদারী তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ছিল—রংপুরান্তর্গত স্বরূপপুর, মণ্ডল ঘাটের তের আনা অংশ, দ্বারবাসিনী, জগদীশপুর, যশোহরের মহম্মদসাহী, কটকের সরগরা প্রভৃতি।

তাঁহার সমুদয় সম্পত্তির মধ্যে পৈতৃক দুইটি বিষয় এবং স্বোপার্জ্জিত দুইটি বিষয় সাহাজাদপুর ও কালীগ্রাম, এই কয়টি বিলাত যাইবার পূর্ব্বে ট্রষ্ট সম্পত্তি করিয়া যান। পৈত্রিক বিষয়ে তাঁহার নিজের ব্যবসায়ে লাভ লোকসানের জন্য হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে বিবেচনা করিয়াছিলেন। স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির মধ্যে উল্লিখিত ট্রষ্ট সম্পত্তি দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পমূল্য ছিল, কিন্তু তাহার পতিত অংশ হাসিল করিলে পরে লাভের সম্ভাবনা ছিল। এখন ব্যবসায়ের লোকসানের ফলে যদি তখন বিক্রয় করা হইত, তাহা হইলে তাহাতে বিশেষ লাভ হইত না অথচ পরে লাভের সম্ভাবনা আছে, ইহাই ভাবিয়া এই দুইটিও ট্রষ্ট সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে তিনি কিরূপ খাঁটী লোক ছিলেন—সাধারণ যে সকল লোক তাঁহার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও ঠকাইতে চাহেন নাই; ব্যবসায় করিতে গেলেই লোকসানের ভয় আছে—প্রয়োজন হইলে যে সকল বিষয় হইতে অনেকটা দেনা শোধ হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল জমিদারী ট্রষ্ট বহির্ভূত রাখিলেন। এদিকে ঐ কয়েকটি স্বল্পমূল্য জমিদারী ট্রষ্ট সম্পত্তি করিয়া, গৃহস্থালী ও পুত্রাদির প্রতি স্নেহ করুণারও সুন্দর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেনার দরুন ট্রষ্ট সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। ট্রষ্ট সম্পত্তির মধ্যে পূজ্যপাদ পিতামহদেব কয়েক বৎসর হইল স্বীয় মধ্যম ভ্রাতার বংশধরগণকে তাঁহাদের প্রাপ্য অংশ ভাগ করিয়াছিলেন।

জমিদারীর ভার অল্পবয়সে তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হওয়ায় একটা

উপকার হইয়াছিল। সেকালে তাঁহার মতো জমিদারী কার্য্যে পারদর্শী আর কোন জমিদার ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার এই শিক্ষাকার্য্যে আর একটি সুবিধা হইয়াছিল যে তিনি তাঁহার নিজের জমিদারীর একমাত্র মালিক ছিলেন। কথায় কথায় অপরের মতামতের উপর নির্ভর করিতে হইত না—কোন কার্য্য ভাল বুঝিলে তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার অধিকার তাঁহার ছিল।

জমিদারী ভালরূপে রক্ষা করিতে গেলেই দেশের আইন-কানুন জানা অত্যাবশ্যক। সেকালের অন্যতম প্রধান ব্যারিষ্টার কাটলার ফার্গুসন সাহেবের নিকট প্রধানত আইন সম্বন্ধীয় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার নিকট দ্বারকানাথ আইন বিজ্ঞান বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত জমিদারীর কার্য্যসূত্রে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্ত্তিত রেগুলেষানগুলি এবং সুপ্রীম কোর্ট, সদর কোর্ট ও জেলা-কোর্ট প্রভৃতি আদালতসমূহের প্রবর্ত্তিত বিধিগুলি তাঁহাকে তন্ন তন্ন করিয়া আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল।

মহাপুরুষের একটি গুণ এইখানে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে বিষয় ধরিতেন তাহা সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিতেন এবং তদ্বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য ব্যয়কৃপণ হইতেন না। ঐ যে ইংরাজী এতটুকু শিখিলাম, ইহাতেই কাজ চলিয়া যাইতেছে ভাবিয়া আর অধিক শিখিবার প্রয়োজন নাই অথবা প্রয়োজনের অধিক শিখিবার খরচ বাজে খরচ বলিয়া তিনি ভাবিতেন না। সস্তা জিনিস পরিণামে মহার্ঘ্য হয়, ইহা সত্য। যে বিষয় শিখিব, সেই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করিলে যেরূপ সহজে ও যত ভাল শিখিতে পারিব, দশজন অপকৃষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট কখনই ভালরূপ শিখিতে পারিব না—প্রত্যুত সময় ও অর্থের অপব্যয় মাত্র। দ্বারকানাথ ইহা বুঝিয়া ইংরাজীও শিখিলেন আসল বিলাতী সাহেবের নিকট এবং আইন কানুনও শিখিলেন এক শ্রেষ্ঠ আইন-ব্যবসায়ী ব্যারিষ্টারের নিকট।

দ্বারকানাথ এইরূপে ইংরাজী, জমিদারী আইনকানুনের ব্যবস্থা

সম্যক্ আয়ত্ত করাতে অনেক বড় বড় জমিদার তাঁহাকে তাঁহাদের জমিদারীর মকর্দ্দমা-সংক্রান্ত ব্যবস্থা-প্রতিনিধি করিলেন এবং তিনিও এইরূপে সেই সকল জমিদারকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে প্রাণপণে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সকল জমিদারের মধ্যে বগড়ী পরগণার জমিদার বাগবাজার নিবাসী দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় ; যশোহরের রাজা বরদাকান্ত রায় এবং কাশিমবাজারের কুমার হরিনাথ রায়, এই কয়জনই উল্লেখযোগ্য। কুমার হরিনাথের সঙ্গে এই সময়ে একটি বৃহৎ জমিদারী লইয়া তাঁহার জ্ঞাতিগণের বিবাদ লাগিয়া গিয়াছিল।

বলা বাহুল্য যে এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে গেলে সর্ব্বকালেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সত্যের উপর নির্ভরশীলতা, অথচ লোকজনকে আপ্যায়িত করিবার ক্ষমতা, এই সমুদয় গুণের সমাবেশ চাই। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময়ে দলাদলির কিছু প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহার উপর আদালতের ন্যায় বিচার ভাগ্যের কথা ছিল, তখন কৃতকার্যতা লাভ প্রার্থনা করিলে উপরোক্ত গুণসমূহ যে কত অধিক পরিমাণে আবশ্যক তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, দ্বারকানাথ নিজ গুণে বঙ্গদেশ এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাণী কাত্যায়নী, রাজা বরদাকান্ত প্রভৃতি বিস্তৃত ভূম্যাধিকারীদিগের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ও ব্যবস্থাদাতা হইয়া পড়িলেন এবং বিশেষ চেষ্টা-চরিত্রের ফলে অনেকগুলি জমিদারী রক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়াতে ব্যবস্থাভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহার সুনাম চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তাঁহার চেষ্টা যে প্রায় ফলবতী হইত, তাহার কারণ এই যে তিনি যে বিষয়টি ধরিতেন, তাহা সম্পূর্ণ না করিয়া অন্যকার্য্যে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতেন না। রাজা বরদাকান্তের বিষয় অনেক কাল যাবৎ তাঁহার হস্তে ছিল। বোধ হয় একবার ম্যাক্সওয়েল নামক একজন সাহেবকে কিছুদিনের জন্য বরদাকান্ত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অকৃতকার্য্য হওয়ায় দ্বারকানাথের হস্তে বরদাকান্তকে পুনরায় আসিতে হইয়াছিল।

তিনি এই সকল কার্য্যের দ্বারা যেমন স্বদেশীয়দিগের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন, সেইরূপ ইংরাজদিগের নিকটেও কাজের লোক বলিয়া

প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে দেশীয় ভূম্যাধিকারী-দিগের ব্যবস্থাসচিব হওয়া যেরূপ সহজ হইয়াছিল, ইংরাজদিগের সহিত ব্যবসায়ে যোগ দেওয়াও তেমনি সহজ হইয়াছিল। তখনও নিজে কোন কোম্পানী বা কুঠী করেন নাই। এ সময়ে তিনি নিজেই বিলাতী কুঠীর অর্ডার অনুযায়ী নীল, রেশম প্রভৃতি কিনিয়া বিলাতে পাঠাইতেন। এইরূপে নানা কার্য্যে লিপ্ত থাকায় দেশীয় ও কি সরকারী, কি বে-সরকারী ইংরাজ সকলেরই মধ্যে নিজ নাম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জমিদারের ছেলে বলিয়া যে কেবল টাকা গুণিতে এবং অবশিষ্ট সময় আলস্যে কাটাইতে হইবে, তিনি নিজ জীবনে তাহার স্থায়ী প্রতিবাদ স্বরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। সেই অল্প বয়সেও তিনি সময় নষ্ট করিতে জানিতেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় রংপুরের কালেক্টরের সেরেস্তাদারী পদ হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। তদানীন্তন কালে এই পদই দেশীয়দিগের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ পদ ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে ইহা স্থিরীকৃত হয়। সুতরাং রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই এই সর্ব্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হওয়াতে নিশ্চয়ই তাঁহার খ্যাতি দেশীয়দিগের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার উপর, আবার সেকালের দেশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা ভাল ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন। তিনি ১৮০৬ সালের মধ্যে ইংরাজী ভাষা বিশুদ্ধরূপে লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি রংপুরের কলেক্টর জন ডিগবি সাহেবের সম্পাদকীয়তায় বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। এই ঘটনা নিশ্চয়ই সে সময় বিদেশীয় ও স্বদেশীয় ভদ্রলোকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। রংপুরে থাকিতে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তারের সভা করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা রামমোহন রায়কে তাঁহার কলিকাতায় আগমনের পূর্ব্বেই ভদ্র সাধারণের নিকট অন্তত নামে পরিচিত করিয়া রাখিয়াছিল। কাজেই তিনি কলিকাতায় আগমন করিলে পর এখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত সহজেই আলাপ পরিচয় হইল। তিনি আবার ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করাতে আলাপ পরিচয়ের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

বলা বাহুল্য যে লৌহ ও চুম্বক যেমন পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ চল্লিশ বেয়াল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রৌঢ় এবং কুড়ি বাইশ বৎসরের উৎসাহী যুবক পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

সেই যে উভয়ের মধ্যে বন্ধুতা সংঘটিত হইয়াছিল, আজীবন তাহার বিচ্ছেদ তো হয়ই নাই, প্রত্যুত তাহা সর্ব্বথা প্রগাঢ়তাই লাভ করিয়াছিল। আমাদের অনুমান হয় যে রামমোহনের দৃষ্টান্ত ও খুব সম্ভবত তাঁহার পরামর্শেরও অনুসরণে তাঁহার কলিকাতায় আগমনের দুই চার বৎসরের মধ্যেই যখন চব্বিশ পরগণার কালেক্টরের অধীনে সেরেস্তাদারের পদ খালি হইল, তখনই দ্বারকানাথ চেষ্টা করিয়া সহজেই তাহা লাভ করিলেন। জেলার কলেক্টর সেকালে স্থানীয় নিমকি বিভাগেরও কর্ত্তা ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর যাঁহার অধীনে কর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহারই সম্বন্ধসূত্রে প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত শ্রীযুক্ত প্লাউডেন মহোদয়। প্লাউডেনের অধীনে দ্বারকানাথ ছয় বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাজে প্লাউডেন সাহেব এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে আজীবন স্থায়ী বন্ধুতা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া তদানীন্তন সদর বোর্ডের সেক্রেটারী হেনরী মেরিডিথ পার্কার সাহেব নিমকি বোর্ডের দেওয়ান করিয়াছিলেন। সে সময়ে নিমকি বিভাগে নিতান্ত অল্প বেতনে লোক জন নিযুক্ত হইত। বলা বাহুল্য যে এই কারণে ঘুষের স্রোত খরতর বেগে প্রবাহিত হইত। আমি ইতিপূর্বেই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া আসিয়াছি যে ৩৫৲ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী তাঁহার উপরিতন সাহেব কর্ম্মচারীকে মাসিক ৫০০ টাকা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন —তিনি নিজে কোন্ না আর ৫০০ টাকা মুনাফা করিবেন? যে বিভাগে এরূপ বন্দোবস্ত, সে বিভাগে কেবল ঘুষ কেন, তহবিল তছরূপ প্রভৃতি উপদ্রবেরও সর্ব্বদাই ভয় থাকে। দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন প্লাউডেনের নিকট কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময়ে নিমকি বোর্ডে তদানীন্তন দেওয়ানের অনেক টাকার তহবিল তছরূপ ঘটিল। পার্কার দেখিলেন সমস্ত নিমকি বিভাগের সম্পূর্ণ নূতন বন্দোবস্ত না করিলে এরকম ঘুষ, চুরি প্রভৃতির উপদ্রব কিছুতেই নিবারিত হইবে না। জমিদার, আইনজ্ঞ, কর্ম্মদক্ষ ও ধর্ম্মভীরু দ্বারকানাথের মতো আর

দ্বিতীয় কোন্ ব্যক্তিকে এ কার্য্যে সহায় পাইবেন? অনেক বৎসর তিনি বোর্ডের দেওয়ান থাকিয়া পরওয়ানা বাহির করা, তাহার হিসাব রাখা প্রভৃতি সকল বিষয়েই এমন পাকা বন্দোবস্ত করিলেন যে তাহাতেই তাঁহার বন্দোবস্তী বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। পার্কার সাহেব তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হইয়া গিয়া তাঁহাকে নিজের বন্ধুমধ্যে পরিগণিত করিলেন। জমিদারীর আদায় তহশীলের কার্য্য পরিদর্শন করা যাঁহার অভ্যস্ত ছিল, তাঁহার পক্ষে ইহা বিশেষ গুরুতর হয় নাই। অবশেষ নিজের সাংসারিক কার্য্যের গুরুভারে এবং চাকরীর পরিবর্ত্তে স্বাধীনভাবে জীবিকা সংস্থান করিতে ইচ্ছুক হইয়া ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এক পত্র লিখিলেন। তাঁহাকে অবসর প্রদান করা মঞ্জুর হইল।

তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিবার কালে চক্ষু বুজিয়া কার্য্য করিতেন না, চারিদিকে চক্ষুকর্ণ খুলিয়া কাজ করিতেন। ইংরাজ আমলের সেই প্রথম সময়ে নানা কারণে অনেক জমিদারী বিক্রয়ের ফলে হস্তান্তরিত হইতেছিল। প্রজারা রাতারাতি জিনিসপত্র সরাইয়া রাখাতে জমিদারগণ খাজানা আদায় করিতে পারিতেন না এবং যথাসময়ে গবর্ণমেণ্টের খাজানা দিতে অক্ষম হওয়ায় জমিদারী সকল নীলামে চড়িতে লাগিল। আরও কারণ এই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কালে অনেকগুলি হঠাৎ নবাব জমিদার হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা স্বভাবত অলস এবং জমিদারী কার্য্যকলাপ গোমস্তাদের উপর ভার দিয়া নিশ্চিত থাকিত। অথচ টাকার প্রয়োজন হইলেই প্রজাগণের উপর অত্যাচারের সীমা থাকিত না। আবার অনেক সময়ে গোমস্তাগণ জমিদারের প্রদত্ত খাজানার টাকা গবর্ণমেণ্টকে না দিয়া নিজে ভাঙ্গিয়া খাইয়া ফেলিল এবং জমিদার খাজানা দেওয়া হইয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন; সহসা দিনের দিন শুনিলেন যে তাঁহার জমিদারী বাকী খাজনার জন্য নীলামে চড়িয়াছে। তখন তাহা রক্ষা করিবার কোনই উপায় করিতে পারিলেন না।

এখন দ্বারকানাথ ২৪ পরগণার কালেক্টরের সেরেস্তাদার হওয়াতে

কোন জমিদারীর কিরূপ আয়, সাতান কি নাতান, এই সকল বিষয় নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং যেই কোন জমিদারী সুবিধামত নীলামে উঠিল, অমনি তাহা কিনিয়া লইলেন। কিন্তু কালেক্টরের সেরেস্তাদার থাকিতে ঐরূপে জমিদারী ক্রয় করা তখনকার আইনসঙ্গত হউক বা না হউক, অন্তত নীতিসঙ্গত নহে। তাই আমরা দেখি যে তিনি নিমকি বোর্ডের দেওয়ান থাকিবার কালেই জমিদারী ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কালীগ্রাম ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এবং সাহাজাদপুর ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এবং অন্যান্য জমিদারীও এই সময়ের কাছাকাছি কেনা হইয়াছিল। এইরূপে চাকরী করিবার মধ্যেই অনেক জমিদারী কিনিয়া এক বিস্তৃত ভূম্যধিকারী হইয়া বসিলেন।

নিমকি বিভাগে কর্ম্ম করিবার প্রসঙ্গে অনেক লোকে তাঁহারও নামে জুয়াচুরী ও ঘুষের অপবাদ দিয়া থাকে। আমরা যতদূর অনুসন্ধানে জানিয়াছি, তাহাতে সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে তিনি একটি পয়সাও ঘুষ লয়েন নাই। অনেকগুলি ঘটনা তাঁহার উপার্জ্জনের সহায় হইয়াছিল। প্রথমত তিনি নিজে পৈতৃক জমিদারীর অধিকারী ছিলেন, তাহা হইতে বাৎসরিক আয় ন্যূনাধিক ষাট হাজার টাকা ছিল। সে সময়ে তাঁহার খরচ পরিবার হিসাবে ধরিলে বাৎসরিক দুই তিন হাজারের অধিক হইবে না। আমরা তৎস্থানে দশ হাজার টাকা ধরিলেও বৎসর বৎসর প্রায় পঞ্চাশ হাজার করিয়া সঞ্চিত করিবার অবসর ছিল। আনুমানিক চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তাঁহার পালক পিতার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে দেখি যে প্রতি দশ বৎসরে তাঁহার পাঁচ লক্ষ করিয়া টাকা জমিত। দ্বিতীয়ত, পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে সুবিধামত ক্রয় করিয়া ও অর্থসঞ্চয়ের অন্যতম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আরও দু একটি ধনাগমের বিশিষ্ট পন্থা সেকালে ছিল। তন্মধ্যে একটি এই যে, সেকালে কালেক্টরের দেওয়ানের কর্ম্মে অনেক আইনসঙ্গত 'উপরিলাভ' ছিল। উহাতে গবর্নমেণ্টের নিষেধ থাকা দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল। তৎপরে দশ বৎসর

দেওয়ানী কর্ম্ম করিয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয় করা কিছুই অসম্ভব ব্যাপার ছিল না। অন্যান্য লোকে তাহার অর্দ্ধেক অথবা চতুর্থাংশ-কাল কর্ম্ম করিয়া দশগুণ অধিক সম্পত্তি করা যাইত।[১] ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহোদয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এক পত্রে লিখিয়াছেন—"সেকালে দেওয়ানদিগের যে যে বিষয়ে উপরি পাওনা ছিল, সেই সেই বিষয়ে নাজীরের মিরণের ন্যায় পাওনার হার নির্দ্ধারিত ছিল, এবং সেই হার গবর্ণমেণ্টের জানিত ছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এরূপ উপার্জ্জনে আপত্তি করিতেন না।"

সেকালে আজকালকার মতো উকীল ব্যারিষ্টারে ছড়াছড়ি ছিল না। যে দুই একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন, বাঙ্গালীরা তখন সাহেব বলিয়া তাঁহাদের কাছে ঘেঁসিতেই সাহস করিতেন না। দ্বারকানাথ তখনকার বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় আইনজ্ঞ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ব্যবস্থাশাস্ত্রে তাঁহার আশ্চর্য পারদর্শিতা ছিল। সুতরাং লোকেরা প্রয়োজন হইলে, তাঁহার নিকটে আইন সম্বন্ধে পরামর্শ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আসিতেন। অবশ্য দ্বারকানাথের কতকগুলি বাঁধা ঘর ছিল, তদ্ব্যতীত যে সকল লোক তাঁহার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদেরও যথেষ্ট সুবিধা হইত এবং দ্বারকা-নাথের নিকট যে উপকার পাইতেন, তাহার প্রতিদানস্বরূপ তাঁহারা তাঁহাকে অর্থ প্রদান করিতেন। বলিতে গেলে দ্বারকানাথ নামে উকীল না হইলেও কার্য্যত একপ্রকার ওকালতী ব্যবসায় খুলিয়া-ছিলেন।

সেকালের ইতিহাস একটু গভীর ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তখন পারসী আরবী প্রভৃতি ভাষায় লিখিত আদালতের দরখাস্ত প্রভৃতি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিতে গেলে প্রতি লাইনের উপর অনুবাদের 'কষ্ট্' হিসাবে এক এক ডবল গিনি করিয়া হার নির্দ্দিষ্ট

১ History of the Brahmo Samaj by G. S. Leonard, P. 21; এবং রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ২৭ দ্রষ্টব্য।

ছিল। সদর আদালত এবং সুপ্রীম কোর্ট কলিকাতায় স্থাপিত হওয়া অবধি ইংরাজী ভাষায় দরখাস্ত করিবার সূত্রপাত হইয়াছে। দ্বারকানাথ যেরূপ লোকের বিশ্বাসপাত্র ছিলেন তাহাতে তাঁহার হস্তে সংখ্যাতীত দরখাস্ত অনুবাদের জন্য আসা কিছু অসম্ভব ছিল না। প্রতি দরখাস্তে গড়ে ২৫ লাইন করিয়া, যদি ধরা যায় যে, অন্তত দশখানি দরখাস্ত তাঁহার হস্তে দিন আসিত এবং প্রতি লাইনে এক মোহর করিয়া ধরিলেও প্রায় দৈনিক ২৫০ মোহর পাইতেন। দৈনিক তিনি ৫০০৲ পাইতেন ধরিলেও মাসিক প্রায় ১৫,০০০ পাইতেন। ইহার অর্দ্ধেক ধরিলেও বড় অল্প আয় নহে।

তবে যে তাঁহার দুর্নাম রটিয়াছিল তাহার কারণ আছে। যে কেহ কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রাপ্ত হইয়া নিম্নস্থ দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মচারীদিগকে পদ হইতে অপসারিত অথবা অন্য কোন প্রকারে শাস্তি প্রদান করিতে বাধ্য হয়েন, তিনিই এই কারণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই অপবাদ অতদূরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে ইহার কারণ সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু মনে উদিত হইতেছে তাহা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করি। বিশেষত আমি স্বীয় অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া এই বিষয়ে বিচার করিবার অধিকার রাখি।

একটা কোন অপবাদ উঠিলেই লোকে সহজেই ধরিয়া লয় এবং বলেও যে নিশ্চয়ই ইহার অন্তত এতটুকুও ভিত্তি আছে। আমরাও স্বীকার করি যে ভিত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের ভিত্তি। দুর্মতি দ্বিজিহ্বদিগের জিহ্বাই সেই ভিত্তি—সে ভিত্তির সহিত দুর্নামভাগীর বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকে না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই ঘটনাকে দৃষ্টান্ত স্থলে ধরি। খুব সম্ভবত দ্বারকানাথের নূতন বন্দোবস্ত মতে পুরাতন দেওয়ান ও কেরানী, যাহারা প্রত্যক্ষ তছরূপ কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তাহাদিগকে তাড়াইতে হইল। তাহারা জীবিকা হইতে বঞ্চিত হইয়া মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহারা নিজে যে সকল অপরাধে অপরাধী সেই সকল অপরাধ দ্বারকানাথের স্কন্ধে চাপাইয়া

বন্ধুবান্ধবের কাছে নিন্দা করিতে লাগিলেন। নিমকি বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান, সুতরাং অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় থাকা অত্যন্ত সম্ভব। যখন সেই লোক বলিল যে, দ্বারকানাথ ঘুষ লয় বা তহবিল তছরূপ করে অথবা লবণ চুরি করিয়া খাতাপত্রে ঠিক রাখে, তখন পাঁচজন লোক, বিশেষত যাহারা না জানে যে দ্বারকানাথের বন্দোবস্তের কারণে তাহাদের রুটী মারা গিয়াছে, তাহারা সকলেই বলিবে ও বিশ্বাস করিবে যে এই লোক নিমকি বিভাগের অন্ধিসন্ধি সকলই জানে এবং যখন এ বলিতেছে যে দ্বারকানাথ অপরাধী, তখন তাহা অভ্রান্ত সত্য! কেবল তাহাই নহে অপসৃত ব্যক্তিদিগের পৃষ্ঠপোষকগণ দ্বারকানাথের অপরাধ শত সহস্র জিহ্বায় এমন বাড়াইতে বাড়াইতে বলিয়া যাইবে যে ক্রমে জনসাধারণের তাহা শুনিতে শুনিতে সহজ বিশ্বাসের বিষয় দাঁড়াইয়া যাইবে। তাহাদের কি? তাহারা এক একটি নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি মিথ্যা রটনা করিতেছে, তাহা বাতাসের সঙ্গে তখন মিলাইয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার তরঙ্গ উঠিতে উঠিতে যে কতদূর পৌঁছায়, সে কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না। ইহাই তাহাদের মরণ কামড়। আমার অভিজ্ঞতায় জানিয়াছি যে মিথ্যার মধ্যে যাহাদের বাস এরূপ দ্বিজিহ্বগণের মিথ্যার উপরে যখন আঘাত পড়ে, তখন তাহারা জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা, (ইংরাজীতে যাহাকে deliberate lie বলে) বলিয়া দুর্নাম রটাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সত্যের অনুসন্ধান করে, যদি দ্বারকানাথ দোষী হয়েন, তাঁহাকে দোষী বল তাহাতে কাহারও কোনরূপ আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আজ হইতে বঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও যে—যে সকল মহাপুরুষ তোমাদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, যাঁহাদের জন্য তোমারা রাজার জাতির নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছ, স্বদেশ গৌরবমণ্ডিত হইয়াছে, বিনা অনুসন্ধানে, বিনা বিচারে তাঁহাদের নামে অপবাদ রটাইয়া দুর্নাম ঘোষণা করিয়া নিজেদের অঙ্গে কলঙ্কলেপন করিও না, আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইও না।

যে সময় তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের রাজত্বকাল। ইতিহাস যাঁহারা কিছু আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে বেণ্টিঙ্ক মহোদয় ভারত শাসনসংক্রান্ত সকল বিভাগেরই কলঙ্ক অপনোদনে জাগ্রত ছিলেন। সে সময়ে যদি দ্বারকানাথ যথার্থই কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতেন, তাহা হইলে সদর বোর্ডের সেক্রেটারি এবং সুতরাং বড়লাটের তাহা অগোচর থাকিত না। তাহা হইলে পদত্যাগ মঞ্জুর করিয়া ৭ই আগষ্ট তারিখে যে পত্র বোর্ড হইতে লেখা হইয়াছিল, আর কিছু না হউক, অন্তত সেরূপ প্রশংসাপূর্ণ পত্র পাইতেন না। বোর্ডের পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"I have the honour to acknowledge the receipt of your letter dated 1st instant, in which you express a wish to be relieved from the official duties now discharged by you, as Dewan to the Board of Customs, Salt, and Opium, the pressure of your private business rendering it inpracticable for you to devote so much of your attention to the affairs of the Board as to enable you to perform the duties attached to your appointment with satisfaction to yourself. I have laid your letter before the Board, and am directed by them to communicate to you their acceptance of your resignation. At the same time I am desired to convey the expression of the regret they feel in losing the services of an officer whose talents, zeal, and experience have been so long and diligently exerted in advancing the interests of the important branches of the Revenue over which the Board preside. As the high sense which the Board

entertain of your qualifications and integrity, and their appreciation of the advantage which the public interests have derived from your connection with this office are recorded in the proceedings of the Board, it would be superfluous to say more at present than that your past services have met with the cordial approbation of the Board."

ইহা ব্যতীত পার্কার সাহেব নিজে একখানি চিঠি লেখেন, তাহাতে স্পষ্টই দ্বারকানাথের নামে অপবাদের উল্লেখ আছে। পার্কার অপবাদের কথা জানিতেন এবং সেগুলিকে স্পষ্টই কাপুরুষোচিত ও প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা প্রবর্ত্তিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

My dear Dwarkanath,

Indeed, I canscientiously declare, that, if at any time I have been instrumental in saving you, as far as my position enabled me to do so, from the annoyance of those cowardly and vindictive attacks, to which yours peculiar situation exposed you, I have been actuated solely by what I thought due to justice and to the public service in which your assistance was so valuable, and your integrity, to any unprejudiced human being, beyond the shadow of a doubt. To say that I regret your loss in an office where your aid has been at once so valuable in itself, and so cheerfully, will but poorly express what I feel in losing your services.···

Sook Sangor
14th October 1834

Your Sincerely attached Friend
H. M. Parker

পার্কার সাহেব দ্বারকানাথের জীবনের মধ্যবিন্দু ধরিতে পারিয়াছিলেন—তাহা পরোপকার।

অপবাদ রটিবার তখন আরও একটি কারণ ঘটিয়াছিল; তাহা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সতীদাহ নিবারণ। এই দুইটি ঘটনায় তদানীন্তন হিন্দুসমাজে বড়ই আন্দোলন হইয়াছিল এবং এই সূত্রে হিন্দু সমাজে প্রবল দলাদলি ঘটিয়াছিল। বাস্তবিকই তখন রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ধর্ম্মসভার দলের অনেকেই ভাবিয়াছিলেন যে, সতীদাহ নিবারণের ফলে সত্যসত্যই ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইবে। অবশ্য এই সভায় এমন অনেক সভ্য ছিলেন যাঁহারা স্বার্থের জন্য, ধনীলোকের সহবাস লাভের আশায় এই সভায় প্রকৃতপক্ষে মোসাহেবী করিতে নিরত ছিলেন। সূর্য্যোত্তাপের অপেক্ষা সূর্য্যতপ্ত বালুকার উত্তাপ তীব্রতর। ধর্ম্মসভার প্রকৃতহিতৈষী সভ্য অপেক্ষা এই সকল মোসাহেব সভ্যদিকের আক্রমণ তীব্রতর ছিল। ইহা জানা কথা যে, যে সকল সম্ভ্রান্ত লোকের উৎসাহে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, দ্বারকানাথ তাঁহাদের মধ্যে এক জন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং যে দুই জন ভারতীয়ের সহায়তা লর্ড বেন্টিঙ্ককে সতীদাহ নিবারণে সক্ষম করিয়াছিল, তাঁহারা আর কেহ নহে, রাজা রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, ধর্ম্মসভার ক্রোধ যেমন রামমোহনের উপর পড়িয়াছিল সেইরূপ দ্বারকানাথেরও উপর পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় ইহা জানা কথা যে, ধর্ম্মসভার মোসাহেবগণ নিজ আশ্রয়দাতার মনোরঞ্জনের জন্য দ্বারকানাথের নামে অপবাদ রটাইতে কুণ্ঠিত হইবে না। বাস্তবিকও তিনি এবং আর কয়েকটি বন্ধু ব্রাহ্মসভার দল বলিয়া নাস্তিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[২]

২ নগেন্দ্র বসুর রাসোরা, পৃষ্ঠা—২৪১

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রামমোহন রায় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থায়ীরূপে বাস করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। পর বৎসর তিনি তাঁহার মাণিকতলার ভবনে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা সংস্থাপন করেন। এই সভার কারণে রামমোহন রায়ের অনেক বন্ধু তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। বাস্তবিক, এমন অনেক লোক তাঁহার বন্ধু হইয়াছিলেন, যাঁহারা দুইটা আমোদ প্রমোদ করিতে চাহিতেন এবং রামমোহনের নিকটে গিয়া তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত আরও পাঁচজনের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার অবসর খুঁজিতেন—তাঁহারা নৈয়ায়িকের 'ঢেঁকির কচকচি' শুনিতে আসিতেন না। কাজেই এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এক একটি করিয়া তাঁহার সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং অপর কয়েকটি বন্ধু তাঁহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিলেন না। দ্বারকানাথ এবং রামমোহন, উভয়ের হৃদয়ের তেজস্বিতা ও স্বাধীনতা পরস্পরকে আজীবন আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল।

সেই সময়ে, কেবল সেই সময়ে কেন, এখনও লোকে যে কিরূপ সহজে মিথ্যা বলিতে পারে এবং শ্রোতাগণ কিরূপ সহজে তাহা বিশ্বাস করে, এই 'আত্মীয় সভা'ই তাহার পরিচয় স্থল। 'আত্মীয় সভা'য় হইত উপনিষদ পাঠ ও সঙ্গীত। যে সকল বন্ধু তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, জয়কৃষ্ণ সিংহ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বিরোধী সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করিয়া সর্ব্বত্র এই মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, 'আত্মীয় সভা'য় গোবৎস হত্যা করা হয়। সেই সময়ে ইহা অনেক লোকেরই সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছিল। আমি পিতামহদেবের নিকট শুনিয়াছি যে তিনি

একবার রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তখন আহারে বসিয়াছিলেন। তাঁহার আহার স্থলে একমাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তৎ-পুত্রদিগের প্রবেশের অধিকার ছিল। তিনি পিতামহদেবকে বলিলেন—"ব্রাদার, এই দেখিতেছ আমি খাইতেছি রুটী ও মধু; কিন্তু এতক্ষণে হয়তো হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে যে আমি গোমাংস খাইতেছি।"

এই 'আত্মীয় সভা' নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যেও প্রায় চার বৎসর চলিয়া বন্ধ হইয়া গেল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে 'Precepts of Jesus, Guide to Peace and Happiness' পুস্তক প্রকাশ করিয়া খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের সহিত তর্কযুদ্ধ উপস্থিত করিলেন। এই যুদ্ধ কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে অন্যতম ব্যাপটিস্ট মিশনরি উইলিয়ম অ্যাডাম সাহেব রামমোহনের সহিত যুক্তিতর্কে পরাজয় স্বীকার করিয়া একেশ্বরবাদী হইলেন।[১] সেই অবধি রামমোহন রায় এবং তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ প্রতি রবিবারে অ্যাডাম সাহেবের বাটীতে উপাসনার জন্য মিলিত হইতেন। যে সকল ব্যক্তি উপাসনায় নিয়মিতরূপে যোগদান করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব নানা প্রসঙ্গে সেকালের সামাজিক ইতিহাসে উল্লেখ প্রাপ্ত হয়েন। একদিন সভা ভঙ্গ হইলে রামমোহন রায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, সঙ্গে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব গাড়ীতে ছিলেন। পথিমধ্যে চন্দ্রশেখর দেব বিদেশীয়ের উপাসনাস্থলের পরিবর্ত্তে নিজেদের একটি উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। রামমোহন রায়ের তাহা মনে লাগিল। তিনি তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও টাকীর রায় কালীনাথ মুন্সীর সহিত পরামর্শ করিয়া নিজ বাটীতে এই বিষয় স্থির করিবার জন্য এক সভা আহ্বান করিলেন। সভাতে দ্বারকানাথ

১ সাধারণ ক্রিশ্চানগণ যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন। রামমোহনের প্রতিপাদ্য ছিল এই বিশ্বাস হিন্দুদের সাকার উপাসনার সমস্থানীয়। অ্যাডাম তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই অর্থে তিনি একেশ্বরবাদী হইলেন।

ঠাকুর, রায় কালীনাথ মুন্সী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং হাবড়া নিবাসী মথুরানাথ মল্লিক এই মহৎ উদ্দেশ্যসাধন জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। চন্দ্রশেখর দেবের প্রতি ভার দেওয়া হইল যে, তিনি সিমলায় শিবনারায়ণ সরকারের বাটীর দক্ষিণে এক খণ্ড জমির মূল্য স্থির করেন। কিন্তু উক্ত স্থান, উদ্দেশ্যসাধন পক্ষে অনুকূল বলিয়া বোধ না হওয়াতে, জোড়াসাঁকো চিৎপুর রোডের উপর কমললোচন বসুর একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে উপাসনাসভা সংস্থাপিত হইল। এই সভা সংস্থাপনের অল্পদিন পরে যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইল। চিৎপুর রোডের পার্শ্বে এক খণ্ড ভূমি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন ক্রয় করিয়া তাহার উপর বর্ত্তমান সমাজগৃহ নির্মিত হইল।

জমির অধিকারী ব্রাহ্মসমাজের জন্যই নিম্নলিখিত পাঁচ জনের নামে কবলা লিখিয়া দেন—দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এবং রামমোহন রায়। তখনই দেখি যে চার কাঠা আধ পোয়া জমির দাম ৪২০০৲ টাকা অথবা প্রতি কাঠার মূল্য হাজার টাকা ছিল! অবশেষে সমাজগৃহ নির্মিত হইবার পর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী তারিখে উক্ত পাঁচ জন ট্রস্টডীডের দ্বারা রমানাথ ঠাকুর, রাধাপ্রসাদ রায় এবং টাকীর বৈকুণ্ঠনাথ রায় এই কয় জন ট্রস্টীর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন।

রামমোহন রায় শুনিয়াছি যে, সমাজে ইংরাজী ভাষায় ও ইংরাজ ধরনে উপাসনার ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। খুব সম্ভবত অ্যাডাম সাহেব যাহাতে পূর্ব্বের মত তাঁহাদেরই সঙ্গে উপাসনায় যোগদান করিতে পারেন এবং তৎসঙ্গে আরও অনেক ইউরোপীয় যাহাতে একেশ্বরবাদী হয়েন, এই সকল ভাবিয়াই ঐরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এরূপ ইংরাজী উপাসনার ব্যবস্থা হওয়া কিছু অসম্ভব ছিল না। হিন্দুকালেজের প্রথম ফল এই ১৮৩০ খৃষ্টাব্দেই ফলিয়াছিল এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ইংরাজী সভা, বক্তৃতা প্রভৃতির বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন,

ইহা ভাবিলে ব্রাহ্মসমাজে ইংরাজী উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা ছিল ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হইবে না। এরূপ ঘটিলে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ যে কি প্রকার দাঁড়াইত, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা অসম্ভব। তবে এইটুকু মনে হয় যে স্বদেশীয়দিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম অধিক প্রচার হইত না। প্রথম প্রথম হিন্দুকালেজের ছাত্রদের উৎসাহ হয়তো খুবই দেখা যাইত, তাহার পরে কালক্রমে সেই প্রথম উৎসাহের ধাক্কা নরম হইয়া গেলে ব্রাহ্মসমাজ বোধ হয় কিছুতেই দেশের মধ্যে জাতির মধ্যে স্থান না পাইয়া মরিয়া যাইত এবং সুতরাং বিজাতির মধ্যে, বিদেশীয়ের মধ্যেও তাহার প্রচার অসম্ভব হইত। মাতৃ-স্তন্যে বর্দ্ধিত না হইলে সন্তান কখনই সবল ও তেজস্বী হইতে পারে না।

যাই হৌক্, রামমোহন রায়ের সেরূপ ইচ্ছা থাকিলেও কেবল দ্বারকানাথেরই পরামর্শে অবশেষে একবাক্যে স্থির হইল যে বেদপাঠ, সম্বৎসরে ব্রাহ্মণ বিদায় প্রভৃতি স্বদেশ-প্রচলিত উপায় অবলম্বনে এবং দেশীয় ভাষার সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে হইবে। দ্বারকানাথের মত সুক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তির এরূপ পরামর্শ দেওয়া উপযুক্তই হইয়াছিল। বিশেষত আমি সেকালের কোন তথ্যজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে শুনিয়াছি যে, দ্বারকানাথ অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি দুইটি ঘণ্টা ধরিয়া জপ করিতেন, তাহা ছাড়া কর-জপ ও মানসিক জপ হইতে তিনি যতদূর সম্ভব আপনাকে বিযুক্ত রাখিতেন না। এমন কি প্রথমবার বিলাত যাইয়া যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেই বাটীর একটি ঘরে গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া ইষ্টমন্ত্র নিয়মিত জপ করিতেন। তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত নিয়মিত নিত্যকৃত্য হোমাদি করিতেন। তিনি বেশ জানিতেন যে ব্রহ্মজ্ঞানই হিন্দুধর্ম্মের সার, তাই তিনি বিপক্ষদলের শত গালি এবং নিজের লাভক্ষতি সমস্তই উপেক্ষা করিয়া রামমোহন রায়ের সহায় স্বরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং রামমোহন রায়ের পরেও ব্রাহ্মসমাজকে আপনার মত করিয়া পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন। যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ

সকলেই ক্রমে অন্তর্হিত হইলেন, তখনও কেবল তিনিই ইহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য মাসিক আশি টাকা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন এবং বৎসর বৎসর ব্রাহ্মণ বিদায় দিতেন। কিন্তু তথাপি একটা প্রবল নিষ্ঠার ভাব থাকাতে তিনি চিরজীবন যে প্রচলিত ধর্ম্মে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, তাহাকে কুসংস্কার বলিয়া সহসা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন নাই। শুনিয়াছি যে তিনি বিলাত যাইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মদ্য পান করা দূরে থাক, তাহা স্পর্শও করিতেন না। তিনি মাংসাদিও অধিক আহার করিতেন না। ক্রমে যখন তাঁহার ব্যবসায়ের বিস্তৃতির সঙ্গে বিস্তর সম্ভ্রান্ত ইংরাজ পুরুষ ও মহিলাদের সহিত আলাপ পরিচয় হইল, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাদের খাতির রাখিবার জন্য অল্প অল্প মদ্য পান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমে সাহেবী খানাতেও যোগ দিতেন। ইহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে ইঁহার সহধর্ম্মিনীর কার্য্যকলাপ যথেষ্ট সাক্ষ্য দিবে। যখন হইতে দ্বারকানাথ সাহেবদিগের সহিত খানায় যোগ দিলেন এবং মদ্য স্পর্শ করিলেন সেই দিন হইতে তাঁহার পত্নী নিজ সম্বন্ধ কার্য্যত বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে যথাস্থানে আরও বিবৃত করা যাইবে। আসল কথা এই যে, হয়তো কোন ইংরাজ মহিলা আসিয়া "Well Dwarkanath" বলিয়া হাতে একটা বিস্কুট গুঁজিয়া দিলেন, তখন তো আর তিনি ফেলিয়া দিয়া তাঁহার অপমান করিতে পারেন না। ইহার উপর রামমোহন রায়ের সহিত ঘনিষ্টতাও তাঁহার শুচি-বাইয়ের ভাব পরিত্যাগ করাইয়াছিল, কিন্তু বিলাতেও তাঁহাকে কর-জপ পরিত্যাগ করে নাই। মহর্ষি লিখিতেছেন যে তাঁহার ১৮ বৎসর বয়সের পর যখন দল বাঁধিলেন যে প্রতিমাকে প্রণাম করিবেন না, তখনও সন্ধ্যাকালে আরতির সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর দালানে নিয়মিত যাইতেন। তখন ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ।

রামমোহন রায়ের সহিত দ্বারকানাথের কিরূপ সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল এ সম্বন্ধে পিতামহ বলিয়াছেন—"যখন রাজা রামমোহন

রায়ের মৃত্যু-সংবাদ আসিল, তখন আমি আমার পিতার নিকটে ছিলাম। আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।"[২]

সমাজের দিনে রাজার বন্ধুগণ তাঁহার মাণিকতলার বাড়ীতে আসিয়া মিলিত হইতেন। তাহার পরে, তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া জোড়াসাঁকোর সমাজে গমন করিতেন। তিনি বলিতেন, যখন এদেশের লোক কোন তীর্থস্থানে যায়, কেহ গাড়ী করিয়া যায় না। আমরা আমাদের ঈশ্বরের দরবারে গাড়ী করিয়া কেন যাইব? আমরা পদব্রজেই যাইব। মহর্ষি বলিয়াছেন—"যদিও রাজা সমাজে পদব্রজে যাইতেন, কিন্তু তিনি কখনও ধুতি চাদর পরিয়া যাইতেন না। সমাজে যাইবার সময়ে পোষাক পরিয়া যাইতেন। মুসলমানদিগের বাহ্য আচার ব্যবহারের প্রতি রাজার বিশেষ অনুরাগ ছিল। রাজার এই এক মনের ভাব ছিল যে, পরমেশ্বর মানুষের রাজা ও প্রভু। তাঁহার দরবারে যাইবার সময়ে উপযুক্তরূপ পোষাক পরিয়া যাওয়া উচিত। রাজরাজেশ্বরের দরবারে, তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইলে উপযুক্তভাবে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। রাজা এই ভাবটি মুসলমানদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। রাজার সকল বন্ধুগণ তাঁহার ন্যায় পোষাক পরিয়া সমাজে যাইতেন। আমার পিতা এ নিয়মের ব্যতিক্রম স্থল ছিলেন। তিনি সমাজে ধুতি চাদর পরিধান করিয়া গমন করিতেন। রাজা ইহা পছন্দ করিতেন না। ...কিন্তু আমার পিতা সর্ব্বদাই এই উত্তর দিতেন যে, সমস্ত দিন আপিসের পোষাকে থাকিয়া আবার সন্ধ্যার সময়ে পোষাক পরিধান করিবার কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের উপসনা করিতে আসিলে, অতি সামান্য পরিচ্ছদেই আসা উচিত।"[৩] ইহা হইতেই দুইজনের বিভিন্ন ভাব বুঝা যাইতেছে—একজন জাঁকজমক-প্রিয়, অন্যজন স্বভাবতই বিনয়ী, বাহ্যিক লেখাতে কেবল নহে। আর তিনি ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব

২ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।

৩ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।

অবগত হইয়াছিলেন যে, পোষাক পরিচ্ছদের উপর তাহা নির্ভর করে না।

"রাজা মধ্যে মধ্যে আমাদের বাটীতে আসিতেন। আমার পিতা রাজাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি অল্প বয়সে দেশের প্রচলিত ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু রাজার সহিত আলাপ পরিচয় হওয়াতে প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহার অবিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু রাজা যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি কখনই তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যখন রাজার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, তখন আমার পিতা প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুষ্পাদি উপকরণ লইয়া দেবতার পূজা করিতেন। তিনি প্রকৃত ভক্তির সহিত পূজা করিতেন, কিন্তু পূজা অপেক্ষাও রাজার প্রতি তাঁহার ভক্তি অধিক হইয়াছিল। কখনও কখনও এমন হইত যে, তিনি পূজায় বসিয়াছেন, এমন সময়ে রাজা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। রাজা আমাদের গলিতে প্রবেশ করিবামাত্র আমার পিতার নিকটে সংবাদ যাইত যে তিনি আসিতেছেন। আমার পিতা তৎক্ষণাৎ পূজা হইতে উঠিয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেন।"[৪] মহর্ষি এইরূপ বলিয়াছেন। মহর্ষি ভুল বুঝিয়াছেন। রামমোহন যখন দেখা করিতে আসিতেন, তখন নিশ্চয়ই পূজা সাঙ্গ হইয়া যাইত, হয়তো জপ করিতেছেন তাহাই উঠাইয়া রাখিয়া রামমোহনের সঙ্গে কথা কহিতেন —তাঁহার সঙ্গে নিশ্চয়ই অধিকাংশ ধর্ম্মালাপই হইত—জপ অপেক্ষা তাহা মূল্যবান বিবেচনা করিয়াই এইরূপ করিতেন। যাহাই হউক মোটের উপর ইহাই বলিতে পারি যে, দ্বারকানাথের মত কর্ম্মঠ ও বদান্য বন্ধুলোক না থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইত কিনা সন্দেহ এবং যদি বা হইত, আজ পর্য্যন্ত তাহার অস্তিত্ব দেখিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।

৪ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।

বিবাহ

জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ ভগবানের ইচ্ছা। জগতের এমন কোন কার্য্যই নাই যাহা তাঁহার ইচ্ছার অতীত হইয়া ঘটিতে পারে। তথাপি এই তিনটির সহিত আমাদের আশা, ভালবাসা প্রভৃতি অত্যন্ত জড়িত থাকে এবং এই কারণে এই তিনটি সম্বন্ধে ঈশ্বরের হস্ত শীঘ্র ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি।

দ্বারকানাথের ভাগ্যে ভগবান উপযুক্ত সহধর্ম্মিনী জুটাইয়া দিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের স্ত্রীভাগ্য অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল। দ্বারকানাথ নিজে যেমন ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার স্ত্রীও ততোধিক নিষ্ঠাবতী ছিলেন। দ্বারকানাথপত্নীর নাম ছিল শ্রীমতী দিগম্বরী দেবী। কথায় বলে, স্ত্রীভাগ্যে ধন এবং স্বামীভাগ্যে পুত্র। যদি বহু অভিজ্ঞতা হইতে এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে দিগম্বরী দেবী যে বিশেষ ভাগ্যবতী ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দিগম্বরী দেবী যশোহরান্তর্গত নরেন্দ্রপুর গ্রামে পীরালী রায় বংশে জণ্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামতনু রায় এবং মাতার নাম আনন্দময়ী। আনুমানিক ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথের সহিত তাঁহার বিবাহ নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং তখন দ্বারকানাথের বয়স ১৫ বৎসর। শুনিয়াছি যে দিগম্বরী দেবীর ৬ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। তখনকার বিবাহযাত্রা পাল্কী করিয়াই হইত। সঙ্গে মশাল চলিত। আজকালকার মত চৌঘুড়ি এবং কথায় কথায় বাঁধা রোসনাইয়ের ব্যবস্থা করা হইত না।[১] বিহাহের দিন স্থির হইয়াগেলেই রাশি রাশি রূপার বালা প্রভৃতি ফরমাইস্ দেওয়া হইত—তাহাই চাকর

১ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা

বাকর দিগকে দেওয়া হইত। তাহা ছাড়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট সামাজিক দেওয়া হইত এবং ঘটক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতিকে অজস্র শাল ও বিদায় দেওয়া হইত। শুনা যায় যে চৌঘুড়ি এবং খাস গেলাস প্রভৃতি জাঁকজমকপূর্ণ রোসনাইয়ের ব্যবস্থা কলিকাতাবাসী সুবর্ণবণিকদিগের কর্ত্তৃক প্রথম প্রচলিত হয়। জনশ্রুতি এই যে দিগম্বরী দেবীর পূর্ব্বে নরেন্দ্রপুর একটি সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। তাঁহার বিবাহের পর কলিকাতায় চলিয়া আসা অবধি নরেন্দ্রপুর নানা ঘটনায় একেবারে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে, এখন সেখানে একটিও মানুষের মত লোক পাওয়া দুর্লভ।

দিগম্বরী দেবীকে লোকে লক্ষ্মীর অবতার বলিত। তাঁহার হাতের আঙ্গুল চাঁপার কলির মত ছিল। তাঁহার কেশদাম কোঁকড়া ছিল। প্রতিমার পদযুগল যেরূপ সচরাচর গঠিত হয়, তাঁহারও পদযুগল সেইরূপ ছিল। তিনি নাতিহ্রস্ব ও নাতিদীর্ঘ এবং শরীরে দোহারা ছিলেন। আমাদের গোষ্ঠীতে প্রবাদ আছে যে আমাদের বাটীতে যে জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি গঠিত হইত, তাহার মুখ নাকি দিগম্বরী দেবীরই মুখের আদর্শে গঠিত হইত। সেকালের বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা যাঁহাকে তাঁহার রূপের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, "তাঁহার রূপের কি বর্ণনা করিব, সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী ছিলেন।" নীলাম্বরী কাপড়ই তাঁহার প্রিয় ছিল। তাঁহার যথেষ্ট গাম্ভীর্য্য ছিল এবং তিনি খুব রাশভারী লোক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মনিষ্ঠ স্ত্রীলোকের রাশভারী হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। তাঁহার নীরব শাসনের প্রতাপে সমস্ত গৃহ সুশাসিত ছিল। নীলমণি ঠাকুরের গোষ্ঠীই তখন জোড়াসাঁকোস্থ ৬ নম্বর ভবনে একত্র বাস করিতেন। দিগম্বরী দেবী বর্ত্তমান বাটীর উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের গৃহে থাকিতেন। তাঁহার গাত্রের বর্ণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল—যেন দুধে-আলতায় মিশ্রিত করিয়া ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকে বলে যে তাঁহার শরীরের ভিতরে যে রক্ত চলাচল হইত, তাহাও যেন শরীরের চর্ম্মভেদ করিয়া দেখা যাইত। তিনি প্রতিদিন প্রত্যূষে চারটার সময়

উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য এবং স্নান সমাধা করিয়া হরিনাম করিতে বসিতেন। তাঁহার একটি লক্ষ-হরিনামের মালা ছিল। তাঁহার অর্দ্ধেক অংশ প্রাতে সমাপন করিয়া সামান্য আহার করিতেন—আহারের প্রধান দুগ্ধ ও ফল। পরাণ ঠাকুর তাঁহার পূজার এবং রাঁধিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেন। তাঁহার পূজা এবং রাঁধাবাড়া হইয়া গেলে দুপুর বেলায় রাসপঞ্চাধ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বাঙ্গালা গ্রন্থপাঠে সময় অতিবাহিত করিতেন। আবার বৈকালে মুখ হাত ধুইয়া হরিনামের অবশিষ্ট অংশ সম্পন্ন করিয়া ফেলিতেন। দয়া বৈষ্ণবী বলিয়া একটি স্ত্রীলোক আসিয়া প্রায়ই গ্রন্থপাঠ করিত। রাত্রে তিনি হরিনাম শেষ করিয়া অন্ন আহার করিতেন। একাদশীতে ফলমূলাদি আহার করা তাঁহার নিয়মিত অভ্যাস ছিল। তন্মধ্যে চার একাদশীতে —(পার্শ্ব, ভীম, শয়ন ও উত্থান) নিরম্বু উপবাস করিতেন। প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে সধবার একাদশীতে স্বামীর অমঙ্গল ঘটে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যখনই তাঁহার শ্বাশুড়ী কিছু বলিতেন, তখনই তিনি বুঝাইয়া দিতেন এবং জোর করিয়া বলিতেন যে তাঁহার উপবাসে তাঁহার স্বামীর কোনই অমঙ্গল ঘটিবে না।

তিনি রত্নগর্ভা ছিলেন তাঁহার কেবল পুত্রসন্তান লাভ হইয়াছিল, একটিও কন্যা হয় নাই, এই কারণে লোকে তাঁহাকে রত্নগর্ভা বলিত। জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন দ্বারকানাথের বয়স ২৩ বৎসর এবং দিগম্বরীর বয়স আনুমানিক তের চৌদ্দের মাঝামাঝি হইবে। তাঁহার পাঁচ পুত্র—দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্র,-নাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। তন্মধ্যে নরেন্দ্রনাথ অতি অল্পবয়সেই প্রাণত্যাগ করেন। ভূপেন্দ্রনাথ প্রায় পনেরো ষোল বৎসরে পরলোক গমন করেন।

দ্বারকানাথ যেমন পরোপকারী ছিলেন, দিগম্বরী দেবীও তদপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তাঁহার স্বামীভক্তিও যেমন প্রবল ছিল, তেমনি তীব্র ওজস্বিতাও ছিল। যতদিন দ্বারকানাথ প্রাচীন ধরণের চাল চলনে ছিলেন, ততদিন তাঁহার ওজস্বিতার পরিচয় দিবার অবসর হয়

নাই। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরগোষ্ঠী বৈষ্ণব ছিলেন এবং খড়দহের গোস্বামীদিগের শিষ্য ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরগোষ্ঠী শাক্ত ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরগোষ্ঠী পূর্ব্বে মাংস বা পেয়াজ প্রভৃতি কোন প্রকার বৈষ্ণব-বিরোধী দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। এই কারণে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরেরা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদিগকে 'মেছুয়াবাজারের গোঁড়া' বলিয়া উপহাস করিতেন। রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা প্রভৃতি নানা কাজকর্ম্ম উপলক্ষ্যে যখন অবধি দ্বারকানাথের নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং বন্ধুতাও ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল, তখন অবধি রামমোহন রায় দ্বারকানাথকে নিজের মত মাংসাহারে প্রবৃত্ত করাইবার বহু চেষ্টার পর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি যে প্রথম প্রথম যখন দ্বারকানাথ ও রমানাথ রামমোহন রায়ের কথামত মাংসাহারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন উভয়েরই শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল এবং উভয়েই বমি করিয়া পরিত্রাণ পাইতেন। ক্রমে যখন অভ্যাস হইয়া পড়িল, তখন বাটীর এক বহিঃপ্রান্তে মাংস রাধিবার বন্দোবস্ত হইল। রামমোহন রায় বড়ই মুসলমানপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারই অনুকরণে দ্বারকানাথও মুসলমান বাবুর্চী রাখিয়াছিলেন। ক্রমে দ্বারকানাথের সঙ্গে ইংরাজদিগেরও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হওয়াতে প্রকাশ্যেই তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া আহারাদি করিতেন। রামমোহন রায়ের অনুকরণে তিনিও অতি অল্প পরিমাণে সেরি মদ্য পান করিতেন। দ্বারকানাথ-পত্নী স্বীয় ভ্রাতৃজায়া পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে বৈঠকখানাবাটীর একটি ঘরে যাইয়া যখন দেখিতে লাগিলেন যে, বিস্তৃত মধ্যকক্ষে তাঁহার স্বামী সাহেববিবিদের সঙ্গে একত্র পানাহার করিতেছেন, তখন অবধি তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু এই সূত্রেই তাঁহার ওজস্বিতা প্রকাশ পাইল। তিনি দ্বারকানাথকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া ঐ প্রকার ব্যবহার হইতে নিরস্ত হইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে মোহ তখন ভাঙ্গে কাহার সাধ্য।

তিনি সহধর্ম্মিনীর কথায় কর্ণপাত না করাতে দিগম্বরী দেবী

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের নিকটে মতামত চাহিয়া পাঠাইলেন যে, যদি স্বামী ম্লেচ্ছদিগের সহিত একত্র পান ভোজন করেন, তবে তাঁহার সহিত একত্র অবস্থান কর্ত্তব্য কিনা? তাঁহারা উত্তর দিলেন যে স্বামীকে ভক্তি ও তাঁহার সেবা অবশ্য কর্ত্তব্য, তবে তাঁহার সহিত একত্র সহবাস প্রভৃতি কার্য্য অকর্ত্তব্য। এই বিধান অনুসারে দিগম্বরী তাঁহার উপযুক্তমত সেবাকর্ম্ম ব্যতীত আর সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। এখন, বাহিরের লোকে তো আর ভিতরের সকল কথা জানিত না। তাহাদের আত্মীয়া স্ত্রীলোকেরা 'মা ঠাকুরুণের' নিকট আসিয়া নিজ নিজ আবদার জানাইত; কন্যা পিতার, ভগ্নী ভ্রাতার, মাতা পুত্রের, এইরূপে সকলেই আপনার আপনার লোকের চাকরী করাইয়া দিবার জন্য দিগম্বরী দেবীকে অনুরোধ উপরোধ করিত। তাঁহাকেও কাজেই দ্বারকানাথের সহিত এই সকল বিষয়ে কথা কহিতে হইত। শুনিতে পাই যে, যতবার তিনি দ্বারকানাথের সহিত কথা কহিতে বাধ্য হইতেন, ততবারই সাতঘড়া গঙ্গা জলে স্নান করিয়া নিজেকে পরিশুদ্ধ বোধ করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার দিন রাতের বিচার ছিল না। এইরূপে শরীরের উপর অত্যাচার করিতে করিতে অবশেষে জ্বরে পড়িয়া জ্বর-বিকারে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি প্রতিদিন দ্বারকানাথের শয্যাতলে গিয়া প্রণাম করিয়া আসিতেন। দেবেন্দ্রনাথের ধাত্রী বৃদ্ধা শঙ্করীর নিকট শুনিয়াছি যে, যখন তাঁহাকে শ্মশানঘাটে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তখন তাঁহার পদযুগল হইতে এক অপূর্ব্ব তেজ নির্গত হইতেছিল। দুইধারে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া গিয়া ছিল। গরীব দুঃখীদিগকে টাকা দান করিতে করিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

শঙ্করীর নিকট শুনিয়াছি যে দ্বারকানাথ স্বীয় পত্নীকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন, যদিও ঘটনাসূত্রে তাঁহার উপদেশে মাংসাহার প্রভৃতি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। দিগম্বরী দেবীর স্বর্গপ্রাপ্তি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল অনুমান হয়। এই ঘটনার পর অবধি দ্বারকানাথ সাংসারিক কার্য্যে উদাসীনের মত হইয়া পড়িলেন এবং

দিগম্বরীর স্মৃতিসম্বলিত স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড গমনের ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিলেন। লর্ড ড্যালহৌসী যেমন পত্নী বিয়োগের সম্বাদ পাইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—কাজ, কাজ, কাজ, সেইরূপ দ্বারকানাথেরও হৃদয়ে পত্নীবিয়োগের অবধি কর্ম্মের সাগরে অবগাহন করিবার প্রবল ইচ্ছা দেখিতে পাই।

সতীদাহ প্রথা নিবারণ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা, এই দুইটির জন্য রামমোহন রায়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকানাথেরও শত্রুবৃদ্ধি হইয়াছিল। সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে যেমন রামমোহন রায় চেষ্টা করিয়াছিলেন, দ্বারকানাথও তেমনি যত্ন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে তো সতীদাহ ইতিহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু যে সকল সহৃদয় ব্যক্তির সময়ে এইরূপ ঘটনা নিত্যনিয়মিত ছিল, তাঁহারা না জানি কত ব্যথা পাইয়াছেন। আশ্চর্য এই যে, এমন লোকও তখন ছিল, যাঁহারা জ্ঞানীগুণী হইয়াও ইহা সমর্থন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই সতীদাহের ইতিহাস আমরা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করিব।

সতীদাহ প্রথা যে কবে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল, তাহা স্থির নির্দ্ধারণ করা আমাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষমতার অতীত। বর্ত্তমানে এক প্রকার সিদ্ধান্তই হইয়া গিয়াছে যে বেদে এই প্রথার উল্লেখ নাই। মনুও এই সতীদাহ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। এই প্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা ব্যক্তি নানা কাল্পনিক যুক্তি প্রদর্শন করেন। কেহ বা বলেন, পূর্ব্বে হিন্দুরমণীগণ নিজ নিজ স্বামীদিগকে বিষ প্রয়োগে বধ করিত, তাই সহগমন প্রথার দ্বারা সেই ভীষণ হত্যা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। বলাবাহুল্য যে, ইহা ইংরাজ ঐতিহাসিকের স্বকপোলকল্পিত এবং এই মত ইতিহাসে স্থান পাইবার অযোগ্য বলিয়া ঘৃণার সহিত পরিত্যাজ্য।

সহগমনের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি মত আছে। কেহ বা বলেন যে, মৃতব্যক্তির আত্মীয়গণ বিধবার প্রাপ্য উত্তরাধিকার হস্তগত করিবার জন্যই ইহা প্রচলিত হইয়াছে। হইতে পারে যে এইরূপ

কঠোর স্বার্থ এই প্রথাকে স্থায়ী রাখিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া কেবল মাত্র অর্থসম্বন্ধীয় স্বার্থ এই ভীষণ হৃৎকম্পজনক প্রথার জন্মদান করিতে পারে না। কেহ বা বলেন হিন্দু বিধবাগণ স্বামীর মৃত্যুর পর যেরূপ দুঃখকষ্টে পতিত হইয়া থাকে, সেই দুঃখের অবস্থা অতিক্রম করিবার অভিলাষ হইতেই ইহার উৎপত্তি। আবার, কাহারও বা মতে স্বামীকে নরকযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়া চিরসহবাস-সুখ লাভ করিবার প্রাণগত ইচ্ছা হইতেই ইহার উৎপত্তি।

আমাদিগের নিকট উপরোক্ত কারণগুলির একটিও যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। ঐগুলি সহগমন প্রথাকে স্থায়ী করিবার পক্ষে খুবই সহায়তা করিতে পারে এবং করিয়াছে, কিন্তু ঐ সকল কারণ হইতে এই ভীষণ প্রথার উৎপত্তি স্বীকার করা অসম্ভব। আমাদিগের অনুমান হয়, ইহা একটি অসভ্য প্রথা হইতে উৎপন্ন। সকলেই জানেন যে অধিকাংশ অসভ্য অনার্য্য জাতির মধ্যে একটি পুরুষ মরিলে তাহার সঙ্গে তাহার প্রিয় দ্রব্য সকল এবং তাহার স্ত্রী ও বাঁদী প্রভৃতিকেও কবরস্থ করা হইয়া থাকে, যাহাতে সেই পুরুষ পরলোকেও ঐ সকল উপভোগ করিতে পারে। তবেই দেখি প্রকৃত সহগমন প্রথার উৎপত্তি পুরুষের স্বার্থ এবং বলপ্রয়োগ। এই দক্ষিণ-বঙ্গে অতি অল্পমাত্র আর্য্যদের বসতি ছিল। বলিতে গেলে ইহা হাড়ী বাগ্দী পোদ প্রভৃতি অসভ্য অনার্য্য জাতির বাস ছিল। যাই হৌক, এই সকল অনার্য্য পুজিত কালী দেবীর পূজা দক্ষিণবঙ্গের আর্য্যদিগের মধ্যেই প্রথম প্রচলিত হইল এবং তৎসঙ্গে নরবলি প্রভৃতি অনেকগুলি অনার্য্য প্রথাও আর্য্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিল। এই কারণে দেখা যায় যে কালীপূজা নিম্নবঙ্গের মধ্যেই অনেক দিন আবদ্ধ ছিল। সহগমন প্রথাও নিম্নবঙ্গের মধ্যেই এক প্রকার আবদ্ধ ছিল, তবে ইহা 'আর্য্যা-বর্ত্তের মধ্যেও শীঘ্র শীঘ্র প্রবেশ লাভ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল।

যখন এই অনার্য্য প্রথা দক্ষিণবঙ্গের আর্য্য উপনিবেশের মধ্যে প্রচলিত হইল, তখন তাঁহারা ইহাকে ধর্ম্মের তেজোময় আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া লোকের চক্ষে ইহার এক লোভনীয় আকার স্থাপন

করিলেন। তাহার উপর, দক্ষিণবঙ্গে ডাকাতী প্রভৃতি উপদ্রবে স্ত্রীলোকের সতীত্বরক্ষা কঠিন হওয়াতে এই প্রথার কতকাংশে উপকারিতাও দৃষ্ট হইল। এদিকে মুসলমান সম্রাটদিগের অত্যাচারের ভয়ে এই সহগমন প্রথারই রূপান্তরে জহরব্রত সম্পাদন রাজপুত রমণী-দিগের প্রিয় কার্য্য হইল। তখন সতীত্ব রক্ষার সহায় স্বরূপে সহগমন প্রথা, কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেরই চক্ষে ক্রমে ক্রমে কেবল সহিয়া গেল নহে, ধর্ম্মের অনুমোদন পাইল। এই অবস্থায় আমাদিগের সাগর-সমান বিস্তৃত শাস্ত্রের মধ্যে ইহার অনুকূল প্রমাণ বাহির করা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের পক্ষে কিছু কঠিন কার্য্য হয় নাই। কে জানিত যে ভবিষ্যতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই প্রমাণের ভ্রান্তি ঘোষিত হইবে এবং সামান্য স্ত্রীলোকের মৃত্যু নিবারণের জন্য এত বড় একটা চেষ্টা হইবে? এই রকম অবস্থায় ধনী লোকেরা দেখিল যে বিধবাগণ সহগমন করিলে একদিকে তাহাদের পরিবার সতীর মাহাত্ম্যে লোক-চক্ষে সম্মান আকর্ষণ করে, অপরদিকে বিধবাদের প্রাপ্য অধিকার সকল নিজেরও হয়। আবার, বিধবারাও স্বামীর মৃত্যুর পর দেবর প্রভৃতির নিকটে বিষয়সূত্রে যে কষ্ট পাইত, তাহা স্মরণ করিয়া তদপেক্ষা মৃত্যুকেও শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিত এবং তৎসঙ্গে চিরকাল সতীনাম পাইবার মোহে অন্ধ হইয়া সহগমন প্রার্থনা করিত। এইরূপে নানা দিক হইতে সহগমন প্রথার স্থায়িত্ব দাঁড়াইয়া গেল। সহগমনের যে তালিকা গবর্ণমেণ্টের আদেশে প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা হইতেই উপরোক্ত কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানেই ৪২১ দৃষ্ট হয়।

স্বামীর মৃত্যুর পর যে বিধবাদিগকে সহগমন করিতেই হইবে, এমন কোনই বিধানের অস্তিত্ব কখনই স্বীকৃত হয় নাই। তবে যে বিধবা একবার সহগমনের সঙ্কল্প প্রকাশ করিবেন, তাঁহার পক্ষে তাহা পুনরায় অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল, তখন আত্মীয় স্বজনেরা অধিকাংশ স্থলে বলপ্রকাশেও কুণ্ঠিত হইতেন না। একথা তখনকার ইংরাজ লেখকগণ এবং রামমোহন রায়ও স্বীকার করিয়াছেন।

স্বেচ্ছায় যে সহমরণ ছিল না, তাহা নহে। অধিকাংশ স্থলে প্রকারান্তরে বল প্রয়োগে সহমরণের ব্যবস্থা হইলেও স্বেচ্ছাতেও সহমরণের দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মণগণ এক ধর্ম্মের আবরণে ইহাকে আচ্ছাদিত করিয়া সমাজের হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। স্ত্রীলোকগণ ভাবপূর্ণ হৃদয়ে তাহাকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিল। এই কারণে অনেক প্রেমপ্রবণ ধর্ম্মনিষ্ঠ স্ত্রীলোককে স্বেচ্ছায় সহমরণে প্রাণ দিতে দেখা যাইত। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে কাশিমবাজারে রামচন্দ্র পণ্ডিত নামক এক ধনী মহারাষ্ট্রীয় বণিক যখন প্রাণত্যাগ করেন, তখন তাঁহার সপ্তদশ বর্ষীয়া একমাত্র স্ত্রী স্বেচ্ছায় সহমরণে উদ্যত হইলেন। সেখানকার ইংরাজ কুঠীওয়ালা সাহেব প্রভৃতি নানা প্রকারে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহার শিশু সন্তানগণের দোহাই দিলেন। অবশেষে তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইয়া জানাইলেন যে তাঁহারা ইহা ঘটিতে দিবেন না। তখন বণিক পত্নী বলিলেন যে যদি ইহাতে বাধা দেওয়া হয়, তবে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবেন। সন্তানগণ সম্বন্ধে বলিলেন যে যিনি উহাদিগের প্রাণদান করিয়াছেন, তিনিই উহাদিগকে আহারাদি দিবেন। যখন তাঁহাকে অগ্নিদাহের ক্লেশের বিষয় বলা হইল, তখন তিনি অগ্নিতে হস্তদগ্ধ করিয়া ক্লেশের অকিঞ্চিৎকরত্ব দেখাইলেন। ইংরাজগণ ও মুসলমান রাজকর্ম্মচারীগণ বাধা দেওয়া বৃথা ভাবিয়া অনুমতি দিলেন। বণিক পত্নী নির্ভীক হৃদয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া চিতার মধ্যে বসিয়া নিজ হস্তে অগ্নিসংযোগ করিলেন। দুর্ভাগ্যবশত বাতাসের গতিতে সেই অগ্নি বাহির দিকে যাইতে লাগিল। তখন তিনি আবার উঠিয়া বায়ুর গতির অভিমুখীন করিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া স্বামীর পদযুগল ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। তাঁহার দেহ চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল।

একবার এক বিধবা দহনযন্ত্রণা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় চিতা হইতে বাহিরে আসিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি ইংরাজ ভদ্রলোক তাহাকে রক্ষা করিল, কিন্তু তাহার

পরিণামে বিধবাকে যে স্বর্গে তাহার স্বামীর সহবাস সুখে বঞ্চিত রাখিল, এই বলিয়া স্ত্রীলোকটি ইংরাজ ভদ্রলোককে অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিল।

বলপূর্ব্বক বিধবা হত্যারও তু'ই একটি দৃষ্টান্ত এই স্থলে উল্লেখ করিব। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের সহধর্ম্মিণীর দৈনিক লিপিতে এইরূপ একটি হত্যাকাণ্ডের বিবরণ লিখিত আছে। একটি যুবক কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করাতে তাহার পত্নী সহগমনের সংকল্প করিলেন। সকলি প্রস্তুত হইল এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে ছাড়পত্রও পাওয়া গেল। অতি নিকট আত্মীয়গণ চিতায় অগ্নিসংযোগ করিল। যখন সেই অগ্নি তাহাকে স্পর্শ করিল, তখন সে তাহার প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া জনসাধারণের ভীষণ চীৎকার এবং ঢোল প্রভৃতির ভীষণ গোলমালের ভিতরে গাঢ় চিতাধূমের আড়ালে সরিয়া পড়িল এবং নিকটবর্ত্তী অরণ্যে পলায়ন করিল। প্রথমে কেহ এ ঘটনা লক্ষ্য করে নাই। পরে যখন ধুম কমিয়া গেল, তখন সকলে লক্ষ্য করিল যে স্ত্রীলোকের দেহ চিতায় নাই। জনসাধারণ ক্ষেপিয়া উঠিয়া অরণ্যের ভিতর হইতে তাহাকে বাহির করিয়া একটা ডিঙ্গিতে চড়াইল এবং নদীর মধ্যস্থলে যাইয়া তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল—নদীগর্ভে তাহার ভবযন্ত্রণার অবসান হইল।

১৮৩০ সালে ভারত পর্যটক ফ্যানি পার্কস এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কানপুর নিবাসী এক বণিকের মৃত্যুতে তাঁহার স্ত্রী সহমরণে উদ্যত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া একটি সিপাহী খোলা তরবারি হস্তে দাঁড় করাইয়া দিলেন যে বিধবা যদি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে রক্ষা পাইতে পারে, আত্মীয় স্বজন যাহাতে কোন প্রকারে বল প্রয়োগ না করিতে পারে। রমণী স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন এবং সাহস ও উৎসাহের সঙ্গে স্বহস্তে অগ্নি সংযোগ করিলেন। ক্রমে যখন হুতাশন সহস্র জিহ্বা বিস্তার করিয়া সতীকে গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিল, তখন তিনি আর যন্ত্রণা সহ্য

করিতে না পারিয়া লম্ফ দিয়া গঙ্গায় পড়িতে উদ্যত হইলেন। সিপাহী প্রভুর আজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া চিরাভ্যস্ত সংস্কার বশত তাঁহাকে তরবারির আঘাত করিতে গেল। সতী ভয়ে জড়সড় হইয়া পুনর্ব্বার চিতায় প্রবেশ করিল এবং পুনরায় অগ্নির উত্তাপ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ ও অপর সকলেই এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল যে, উহাকে বলপূর্ব্বক চিতায় আনিয়া দগ্ধ করা হউক। সতীও তাহাদের কথায় বাধ্য হইয়া তৃতীয়বার চিতাপ্রবেশে সম্মত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে পাল্কী করিয়া হাসপাতালে প্রেরণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে সিপাহী স্বীয় দোষের জন্য উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছিল।

রামমোহন রায়ের জীবনী লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—"আমরা প্রাচীনদিগের সহিত সতীদাহ বিষয়ে আলাপ করিয়া ইহাই শুনিয়াছি যে, সতীরা শোকে অধীর হইয়া প্রথমে বলিত যে তাহারা সহমৃতা হইবে ; কিন্তু সংকল্পের পর আর ফিরিবার উপায় ছিল না ; ফিরিলে পরিবারে দুরপনেয় কলঙ্ক ; সুতরাং সংকল্পের পর মত পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা দেখিলে অথবা মত পরিবর্ত্তন হইলে বিলক্ষণরূপেই তাহার স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইত।" আরও শুনিয়াছি যে এরূপ সহমরণ-প্রত্যাবৃত্তা স্ত্রীলোকগণকে গৃহে আর লওয়া হইত না। তাহাদের অধিকাংশই শান্তিপুরে আশ্রয় লাভ করিত ; সেখানে বৈষ্ণব প্রাধান্য বরাবর আছে। আরও দেখি যে রাজপুতনার জৈনদিগের মধ্যে অতি সহজে এই প্রথা নিবারিত হইয়াছিল। ইহাতেই বোধ হয় যে ইহার উৎপত্তি তান্ত্রিকগণের ভ্রান্তমত হইতে।

এই প্রথা ভারত হইতে উঠাইয়া দিবার বিশেষ চেষ্টা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লর্ড ওয়েলেসলীর শাসনকালে সূত্রপাত হয়। কিন্তু লর্ড বেণ্টিঙ্কের রাজ্যকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শাসন কর্ত্তাদের হৃদয়ে একটা চিরন্তন আশঙ্কা ছিল যে এই প্রথা আইনের দ্বারা বন্ধ করিতে গেলেই একটা কোন রকম ভীষণ বিপ্লব বা বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে,

কারণ "এই প্রথার প্রতি লোকের অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এত অধিক যে, এ প্রদেশীয় (বঙ্গ) সকল বর্ণের হিন্দুগণ ইহা প্রচলিত রাখিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্।"

আসল কথা এই যে, ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ভারতবাসীগণের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার জন্য যতই কেন লিখুন না যে সৈন্যবলে, তরবারির বলে ইংরাজ জাতি এই দেশ জয় করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা অন্তরে জানেন এবং যাঁহারা নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস আলোচনা করিবেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন যে বাস্তবিক ইংরাজেরা এদেশকে বাহুবলে জয় করিতে পারেন নাই, বুদ্ধিবলে প্রধানত ভেদমন্ত্রের সাহায্যে জয় করিয়াছেন। যুদ্ধকালেও অনেকস্থলে এদেশীয়দিগের বীরত্বের আস্বাদ পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের বিদ্রোহ ঘটিলে তাহার বিষময় ফলের বিষয় চিন্তা করা তাঁহাদের পক্ষে অনুচিত হয় নাই। লর্ড বেন্টিঙ্কের সময়ে বঙ্গাধিকার অবধি প্রায় শতবর্ষ হইতে চলিল এবং তাহার পূর্ব্বেই সমুদয় ভারত সুশাসনে আসিয়াছিল, তদুপরি লর্ড বেন্টিঙ্কের সুশাসনগুণে ভারতবাসী মাত্রেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং লর্ড বেন্টিঙ্কেরই শাসনকালে এই নৃশংস পৈশাচিক প্রথা উঠাইবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছিল।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দেশীয়দিগের অসন্তোষ কিরূপ ভয়ের চক্ষে দেখিতেন, তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য এই সতীদাহ-নিবারণের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনেই দেখা যায়। ১৮০৫ সালে গবর্ণমেণ্ট সহমরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধি কি জিজ্ঞাসা করিয়া নিজামত আদালতে পত্র লেখা হইল। নিজামত আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা যথাযথ তাহার উত্তর প্রদান করিলেন, কিন্তু সাত বৎসরের মধ্যে আর কোনই কার্য্য হইল না। সাত বৎসর পরে গবর্ণমেণ্ট নিজামত আদালতের উত্তরের উপর এই নিয়ম প্রচারিত করিলেন যে (১) বিধবাগণকে সহমৃতা হইবার পক্ষে কোনপ্রকার বল প্রয়োগ করিতে দেওয়া হইবে না : (২) মাদক দ্রব্য সেবন করাইতে দেওয়া হইবে না ; (৩) সহমৃতা হইবার শাস্ত্রীয় বয়স অতিক্রম করা হইবে ; (৪) গর্ভবতী নারীকে সহমৃতা হইতে দেওয়া

হইবে না। ১৮০৫ সালে লর্ড ওয়েলেসলী গবর্ণর জেনারেল এবং তিনি এই প্রথা সম্বন্ধীয় একটি প্রস্তাবে লিখিয়া গেলেন যে "মনুষ্যত্ব, সুনীতি এবং যুক্তির অবিরোধে দেশীয়দিগের মত, আচার ও কুসংস্কার রক্ষা সম্বন্ধে বিচার করাই ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির একটি মূলমন্ত্র।"

যাহাই হউক উপরোক্ত নিয়মগুলি বিশেষ ফলদায়ক হইয়াছিল বোধ হয় না। আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেলে গবর্ণমেণ্টের আদেশে নিজামত আদালত এই বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন।

মার্কুইস অব হেষ্টিংসের শাসন কালে (১৮১৫—১৮২৩) সতীদাহের এক তালিকা সংগৃহীত হইয়া বিলাতে প্রেরিত হয়। বিলাতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ এই তালিকা এবং সাময়িক লেখকদিগের প্রবন্ধাদিতে ইহার মর্মভেদী ছবি দৃষ্টে ইহাকে আত্মহত্যার সামিল করিয়া যে যে কারণ দর্শাইয়া ইহা বন্ধ করা যাইতে পারে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পাঠাইলেন। তাঁহারা বলিলেন যে (১) শাস্ত্রে সহমরণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলা হয় নাই, ইহার প্রশংসা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র ; (২) অন্যান্য অনেক অসভ্য হিন্দুপ্রথা বিনা বিদ্রোহে বন্ধ করা গিয়াছে ; (৩) ব্রাহ্মণদিগের পবিত্রতা অস্বীকারে যখন কোন মন্দ ফল হয় নাই, তখন সতীদাহ নিবারণে কোন কুফল হইতে পারে না ; (৪) সতীদাহ সম্বন্ধে হিন্দুদিগের মধ্যেই বিভিন্ন মত আছে—উন্নত ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ইহা অসমর্থিত ; কতকগুলি প্রদেশ বিভাগে ইহা অজ্ঞাত এবং অপর কতকগুলিতে কদাচিৎ সংঘটিত হয় এবং (৫) যখন অন্যান্য বিদেশীয় রাজা ভারতে রাজত্ব করিতেন, তখন ইহা অনুমত ছিল না।

লর্ড আমহার্ষ্ট সদর কোর্টের বিচারক প্রভৃতি উচ্চতন রাজকর্ম্মচারী-দিগকে এ বিষয়ে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে আদেশ করিলে তাঁহাদের অধিকাংশ লোকই উঠাইবার পক্ষে মত দিলেন। অনেকেই

স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে বিদ্রোহের কোনই আশঙ্কা নাই ; আবার কেহ কেহ বলিলেন যে, কাজ কি একেবারে বন্ধ করে ? যদি বিদ্রোহ হয়। তাহা অপেক্ষা ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশে বন্ধ করিয়া পরে বঙ্গদেশে হাত দেওয়া ভাল। এই সকল বিভিন্ন মতের মধ্যে পড়িয়া আইনের সাহায্যে সহসা অনেক দিনের প্রথা বন্ধ করিতে লর্ড আমহার্ষ্টের সাহসে কুলাইল না। তিনি ১৮২৭ সালে লিখিলেন যে "সতীদাহ একেবারে স্থগিত করিবার জন্য কোন আইন করা আমি ভাল বোধ করি না—সে কার্য্যে আমার মত নাই।" তাঁহার মতে শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রথা নিশ্চয়ই বিদুরিত হইবে।[১] ১৮২৮ সালেও তিনি তাঁহার প্রবন্ধে ঐ কথারই পুনরুল্লেখ করিলেন।

অবশেষে লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন ১৮২৮ সালে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তিনি ইহা উঠাইয়া দিবার ভার লইলেন। বিলাতের ডিরেক্টরদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ইতি পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহাতেই তিনি বল পাইয়া আর কোন তর্কবিতর্ক না করিয়া এক বৎসর যাইতে না যাইতেই (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা ডিসেম্বর) আইন বিধিবদ্ধ হইল যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে সতীদাহ নিষিদ্ধ।

সতীদাহ তো উঠিয়া গেল। স্বদেশীয়ের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর এই নৃশংস প্রথা উঠাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় সহমরণের বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সহ পুস্তক প্রকাশ করিয়া যেমন দেশীয় লোকের মতিগতি ফিরাইতে ছিলেন, তেমনি সেই সকলের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ

১ 'I am not prepared te reoommend an enactment prohibiting suttees altogether...I must frankly confess, though at tho risk of being considered insensible to the enormity of the evil, that I am inclined to recommend our trusting to the progress now making in the diffusion of knowledge among the natives, for the gradual suppression of this detestable supestition. I cannot believe it possible that the burning or burying alive of widows will long survive the advancement which every year brings with it in uesful and rational learning."

করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সহমরণের সপক্ষে যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। নিজামত আদালত যখন পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সকল নির্দ্ধারিত করেন, সেই সময়ে গবর্ণর জেনারেল লর্ড হেষ্টিংসের নিকট সেই সকল নিয়ম রহিত করিবার প্রার্থনার এক আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। ১৮১৮ অব্দে উহার বিরুদ্ধে আর একখানি আবেদন পত্র প্রেরিত হইল। তাহাতে বুঝান হইল যে প্রথম পত্রখানি কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের স্বাক্ষরিত নহে। তাহাতে ইহাও বলা হইয়াছে যে দ্বিতীয় আবেদন পত্রের লেখকগণ "নিজে জানেন এবং অনেকস্থলে চাক্ষুষ দর্শকদিগের নিকট শুনিয়াছেন যে, কোন নারীর পতিবিয়োগ হইলে, তাঁহার পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীগণ চেষ্টা করেন, যাহাতে সেই বিধবা নারী সহমৃতা হয়েন। বিত্তলোভই এরূপ চেষ্টার একমাত্র অভিসন্ধি। এমন সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে যে, কোন নারী পতি-বিয়োগে অধীরা হইয়া সহমৃতা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; সঙ্কল্পের পর, ভয় প্রযুক্ত অস্বীকার করেন। এরূপ স্থলে, তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে বল পূর্ব্বক চিতাশায়ী করিয়া রজ্জুদ্বারা বন্ধন করেন, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহ ভস্মীভূত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া থাকেন। কোন কোন স্ত্রীলোক, কখন কখন কোন রূপ সুবিধা পাইয়া, চিতা হইতে পালাইয়া যান। তাঁহাদের আত্মীয়গণ, তাঁহাদিগকে পুনর্বার ধরিয়া আনিয়া, চিতানলে ভস্মীভূত করেন। এরূপ কার্য্য, সকল জাতির সহজ জ্ঞানে, এবং সকল শাস্ত্রানুসারে হত্যা বলিয়া পরিগণিত।" এই পত্র যে রামমোহন রায় এবং দ্বারকা-নাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রেরিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

তদানীন্তন সংবাদপত্র 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' দেখি যে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় লর্ড আমহার্ষ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহারি নিকটে সতীদাহ রহিত করিবার আশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে নিজামত আদালতের প্রচারিত নিয়ম-সকল আইনরূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

আমরা যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে লর্ড

বেণ্টিঙ্কের সহিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। বেণ্টিঙ্ক দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে শ্রবণ করিতেন। দ্বারকানাথ বেণ্টিঙ্কের সহিত প্রায়ই সাক্ষাৎ করিতে লাট-ভবনে যাইতেন। বেণ্টিঙ্ক রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর উভয়কেই যখন সতীদাহের বিরুদ্ধে একমত দেখিলেন, তখন তাহা উঠাইয়া দিতে আর দ্বিধা করিলেন না। এইখানে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিনয়ের একটি বিশেষ পরিচয় পাইতেছি যে, রামমোহন রায় যে সকল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর সেই সকল কার্য্যের অনেকগুলির প্রধান উদ্যোগী ও অনুষ্ঠাতা হইলেও সেই সকল বিষয়ে কখনও নিজেকে লোকচক্ষের সমক্ষে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার অহমিকার অভাবের বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ করিব। তিনি যে এই সতীদাহ সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের সম্পূর্ণ সহযোগী ছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়া বেণ্টিঙ্কপত্নী সতীদাহ রহিত হইবার বহুকাল পরে যখন দ্বারকানাথ বিলাত যান সেই সময়ে তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন।[২] সতীদাহ সম্বন্ধে দ্বারকানাথের মত কিছু পরেই তাঁহার এক পত্রে ব্যক্ত হইয়াছে।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, হরিহর দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কলিকাতা নগরের তিনশত অধিবাসীর পক্ষ হইয়া টাউন হলের এক সাধারণ সভায় তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। দুইখানি অভিনন্দন পত্র লিখিত হইয়াছিল। একখানি বাঙ্গালা ভাষায় ও একখানি ইংরাজীতে। বাঙ্গালাখানি মূল, ইংরাজীখানি

২. I have much pleasure in stating that, among the native community of Ca'cutta, the late Rammohan Roy and yourself were the pesrons who took the warmest interest, and afforded the most importants information tending to show that, although by long established custom, the awful rite had obtained the effect or law, still it was a ceremony not really in complete.

তাহার অনুবাদ। টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বাবু কালীনাথ রায় মহাশয় বাঙ্গালা অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। বাবু হরিহর দত্ত উহার ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করেন। এই অভিনন্দন পত্রে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, তেলিনীপাড়ার জমিদার ও দ্বারকানাথ এবং রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তিন চার জন ব্যতীত দেশের কোন সম্ভ্রান্ত লোক স্বাক্ষর করেন নাই। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এই অভিনন্দন পত্রের একটি সুন্দর উত্তর প্রদান করিলেন।

সতীদাহ বন্ধ হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বেই ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমান গৃহে উঠিয়া আসিল এবং তাহার উৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে লাগিল। এতদিন ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ কোন রূপ দল বাঁধেন নাই, যদিও নিন্দা ও গালাগালির অবধি ছিল না; কিন্তু এই সতীদাহ উঠিয়া যাওয়াতে তাঁহারা রাজা রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে দল বাঁধিয়া ধর্ম্মসভা নামক এক বিরোধী সভা স্থাপন করিলেন।

পূজ্যপাদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন "১৭৫১ শকে ব্রাহ্মসমাজ এখানে উঠিয়া আইল, সেই শকে সতীদগ্ধ হওয়াও নিবারিত হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী ধর্ম্ম সভাও স্থাপিত হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। তখন সমাজের প্রতি অনেকেই নিন্দাবাদ করিতেন। কেহ বলিতেন তথায় নাচ, তামাসা, নৃত্যগীত হয়; কেহ বলিতেন তথায় সকলে মিলিয়া খানা খায়, ও শেষ এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের উপরে মনের দ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেন যে, ব্রাহ্মসভার দল সহমরণ নিবারণের দল। ধর্ম্মসভা সতীদগ্ধ করিবার দল।" রাজা রাধাকান্তদেবের একজন অনুচর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভার সম্পাদক হইয়া ঘরে ঘরে রাম-মোহন রায়ের ও ব্রাহ্মসমাজের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন এবং ব্রাহ্ম-সমাজে প্রবেশ করিতে সকলকে নিষেধ করিতেন। যাঁহারা তাঁহার নিষেধ না মানিয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপাসনা করিতেন, তাঁহারা

তৎক্ষণাৎ জাতিভ্রষ্ট হইতেন। তথাপি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশীয়েরা ও তথাকার সিংহ মহোদয়েরা, গঙ্গার পশ্চিমপারের মল্লিক বাবুরা, টাকীনিবাসী কালীনাথ মুন্সী ও তেলিনীপাড়া নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা স্বীয়প্রভাবে ধর্ম্মসভার ধর্ম্মবিরুদ্ধ অকিঞ্চিৎ-কর শাসন তুচ্ছ করিয়া অকুতোভয়ে ব্রাহ্মসমাজের ও রামমোহন রায়ের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

ঠিক এই প্রকারে দুই দল তৎকালে প্রসিদ্ধ হইল। ব্রহ্মসভার ও ধর্ম্মসভার দল। এই দুই দল লইয়া সমুদয় বঙ্গভূমিতে মহা দলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রহ্মসভার দলের প্রধান শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়, মথুরানাথ মল্লিক, রাজকৃষ্ণ সিংহ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ইহাঁদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মকাণ্ডে দান লইতেন অথবা তাঁহাদের নিকট হইতে দুর্গোৎসবের বার্ষিক গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা ধর্ম্মসভাযুক্ত ব্যক্তিদের কর্ম্মকাণ্ডে নিমন্ত্রণ বা বিদায় প্রাপ্ত হইতেন না; তাঁহারা ধর্ম্মসভার দলের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য হইয়া থাকিতেন। এ নিমিত্ত ব্রহ্মসভার দলপতিরা স্বপক্ষ ব্রাহ্ম পণ্ডিতদিগের পোষণের নিমিত্ত অতীব আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ১১ই মাঘে, সাম্বৎসরিক সমাজের উপলক্ষ্যে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সমাজস্থ হইতেন, তাঁহাদিগকে উক্ত দলপতিরা ধন দ্বারা বিশেষ সম্মান করিতেন।

সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধেই দাঁড়াইবার জন্য যখন ধর্ম্মসভার জন্মগ্রহণ, তখন বলাবাহুল্য যে এবিষয়ে ধর্ম্মসভা নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তাঁহারা সতীদাহ নিবারণের আইন রহিত করিবার জন্য বিলাতে আপীল করিলেন। যদিও রাজা রাধাকান্ত দেব এই সভার সভাপতি ছিলেন, কিন্তু এই আপীল করিবার উদ্যোগী তিনি যতদূর না হউন, রাজা রাজনারায়ণ রায় এবং আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু) ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুর বলেন যে তাঁহারা আবশ্যক হইলে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যাই হউক এই আপীল যখন বিলাতের প্রিভি কৌন্সিলে

বিচারার্থ উপস্থিত করা হইল, তখন লর্ড ওয়েলেসলী বিলাতের মন্ত্রী পদে অধিরূঢ়। এদিকে রাজা রামমোহন রায়ও তাহার পূর্ব্বেই সতীদাহ নিবারণের আইনের সপক্ষে এক আবেদন পত্র লইয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। তিনি সতীদাহের সপক্ষ আবেদন পত্র বিচার হইবার কালে নিজে সতীদাহের বিরোধী আবেদন পত্র মহাসভায় উপস্থিত করিলেন। তাহাতে বলিয়াছেন সতীদাহ রহিত হইবার এক বৎসর বাদে আজ সেই আইনের বিরুদ্ধে দরখাস্ত হইয়াছে, কিন্তু রহিত হইবার কালে অধিকাংশ স্বদেশীয় ব্যক্তি নীরব ছিলেন। প্রত্যুত সতীদাহ নিবারিত হওয়াতে যে দেশের উপকার হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরলকে এক অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের চেষ্টায় এবং লর্ড ওয়েলেসলীর সাহায্যে মহাসভা সতীদাহের সপক্ষ আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করিলেন।

এই আপীল বিলাতে পাঠান প্রভৃতি সম্বন্ধে ম্যাক ডুগাল নামক এক ইংরাজ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহাতে বোধহয় তাঁহার বেশ দুদশ টাকা খরচও হইয়াছিল। নয় বৎসর পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও যখন সেই টাকা ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে আদায় করিতে পারিলেন না, তখন জন স্টর্‌ম্ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার এক বন্ধুদ্বারা দ্বারকানাথকে আদায় করাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। এই স্টর্‌ম্ দ্বারকানাথেরও বন্ধু ছিলেন। স্টর্‌ম্ দ্বারকানাথকে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার (দ্বারকানাথের) নামের জন্য এবং তাঁহার দেশের নামের জন্য এই টাকা আদায় করিয়া অথবা চাঁদা তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তদুত্তরে দ্বারকানাথ লিখিলেন যে, 'পৈশাচিক প্রথা' সতীদাহ নিবারণের আইনের বিরুদ্ধে আপীলের ব্যয় সম্বন্ধে কোন প্রকৃত মনুষ্য একটি পয়সাও দিবে না। যে কয়জন স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি এই 'এই ভীষণ হত্যার' বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তিনিও তাঁহাদের প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন। তিনি আরও আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে 'ম্যাকডুগাল তাঁহার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া এই

টাকা যেন আপীলকারীগণের নিকট হইতে আদায় করিতে পারেন—ইহার প্রধান নেতা রাজা রাজনারায়ণ রায় এবং আশুতোষ দেব এ বিষয়ে নিশ্চয়ই হাত ধুইয়া ফেলিবেন।'[৩] আজ কোথায় বা সেই ধর্ম্মসভা, কোথায় বা সেই রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ! কিন্তু কত অনাথা রমণী ভীষণ অগ্নিদগ্ধ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইতেছে! এই ভীষণ প্রথা নিবারণে যে সকল মহাত্মাদিগের কিছু মাত্র সংশ্রব আছে, তাঁহাদিগের সকলকেই হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছি।

৩ John Storm Esq. 19th Aug. 1841.

My dear Storm,

Do I hear you say to me "for the credit of your name and your country" !! You cannot I am sure for one moment suppose that I, or the reformer or any true son of humanity will contribute the smallest iota towards the payment of the sum, which appears due to Mr. McDougal on account of expenses attending the appeal against the abolition of that diabolical system of suttee... !

yours sincerely

(Sd.) Dwarkanath Tagore

হিন্দু কলেজ সংস্থাপন

পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে দ্বারকানাথ ঠাকুর চাকরীতে ঢুকিয়াও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রা যাইতেন না। চক্ষুকর্ণ চারিদিকে খুলিয়া রাখিতেন, চতুর্দ্দিকের প্রকৃত সংবাদ রাখিতে ভুলিতেন না। ইহার ফলে তিনি অনেক ভাল ভাল জমিদারী ক্রয় করিতে পারিয়া বিস্তৃত ভূম্যধিকারী হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি যেমন নিজের স্বার্থের প্রতি মনোযোগী ছিলেন, সেইরূপ দেশের স্বার্থের প্রতি, স্বজাতির মঙ্গলের প্রতি সমান মনোযোগী ছিলেন, একটি দিনের জন্যও এবিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা, সতীদাহ নিবারণ প্রভৃতি সৎকার্য্য সমূহে সহায়তা করাতে স্বার্থান্ধ, মোহান্ধ অনেক স্বদেশীয় ব্যক্তির বিরাগভাজন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সকল কারণেই তিনি তদানীন্তন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার কেমন একটা হৃদয়-আকর্ষণী শক্তি ছিল, গবর্ণর জেনেরল প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে কেবল সম্মান মাত্র করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না, তাঁহাকে সত্য সত্যই প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। এবং এই কারণেই তিনি দেশের অনেক মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় ১৮১৪ সালে কলিকাতায় আসিয়া দেশ-হিতকর কার্য্যে যখন কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইলেন, সেই সময়ে দ্বারকানাথের বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র। তখন তিনি যৌবনে সবেমাত্র পদার্পণ করিতেছেন। সেই যৌবনের প্রারম্ভে প্রথম অবসরেই তিনি দেশহিতকর কার্য্যে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন। হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব সেই অবসর দিয়াছিল।

তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে ইংরাজী ভালরূপে শিক্ষা না

করিলে দেশের উন্নতি করা অসম্ভব, কারণ রাজা হইলেন ইংরাজ। এই কারণে তিনি নিজে সেকালে সাহেবদিগের নিকট যতদূর সম্ভব ভাল করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। মোটের উপর দেখিতে পাই যে ভালরূপ ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা ঠাকুরগোষ্ঠীই সব প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেন। দ্বারকানাথের পিতামহ নীলমনি ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আনন্দীরাম বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী ভাষায় প্রশস্ত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সেই বংশের দ্বারকানাথ যে ইংরাজী ভাষায় ভালরূপ শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হইবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

দ্বারকানাথ যে সময় ইংরাজ শিক্ষকদিগের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিতে ছিলেন, সেই সময়ে রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি আরও কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভালরূপ ইংরাজী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণত সে সময়ে বাঙ্গালীদের মধ্যে চীনেম্যানী ইংরাজীর প্রচলন ছিল। তাহার দুএকটি হাস্যকর নমুনা এই স্থলে দিতেছি।

একবার বড় ঝড় হইয়া একখানি জাহাজ গঙ্গার তীরে লাগিয়া আড় হইয়া পড়ে। পরদিন সেই জাহাজের সরকারবাবু ইংরাজ প্রভুকে আসিয়া বলিতেছেন 'Sir, Sir, ship is eighty one' অর্থাৎ জাহাজ একাশি হইয়া পড়িয়াছে। একজন ইংরাজের অধীনস্থ একজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী প্রতিদিন দুপুরবেলা সাহেবের ঘোড়ার দানা খাইয়া টিফিন করিতেন। দুষ্ট সহিসগণ এই সুবিধা পাইয়া ঘোড়ার দানা চুরি করিয়া বেচিত। ক্রমে এ বিষয় প্রভুর কর্ণগোচর হইলে তিনি ভৃত্যদিগকে তিরস্কার করিলে তাহারা বলিল যে তাঁহার বাবু প্রতিদিন ঘোড়ার দানাতে টিফিন করেন। সাহেব ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'নবীন! তুমি নাকি আমার ঘোড়ার দানাতে টিফিন কর?' নবীন বলিলেন—'Yes sir, my house morning and evening twenty leaves fall, little little pay, how manage?'

অর্থাৎ আমার বাটীতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় কুড়িখানা পাত পড়ে, এত কম বেতনে কিরূপে চলে ?

সেকেলে যাঁহারা ইংরাজী ভাল রকম শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এইরূপ চীনেম্যানী ইংরাজী শুনিয়া নিশ্চয়ই যে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেন না, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু সেকালের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনও গভীররূপে উপলব্ধি করিতেন। জ্ঞানের ধর্ম্মই হইল বিস্তার। জ্ঞান কখনও একজনকে লইয়াই সন্তুষ্ট নহে, জ্ঞানের স্রোত একবার নামিলে হিমালয়প্রসূতা জাহ্নবীর ন্যায় তাহার চতুর্দ্দিক শ্যামল করিতে করিতে চলিয়া যায়। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সকলেই অন্তরে অন্তরে ইংরেজী-শিক্ষা বিস্তারের প্রণালী অন্বেষণ করিতেছিলেন। রামমোহন রায়ের হৃদয় ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল, দ্বারকানাথ ঠাকুরের হৃদয় ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল, রাধাকান্ত দেবের হৃদয় ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল। আরও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয় ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল; সকলেই আগ্রহ সহকারে উন্মুখ হইয়া রহিলেন যে স্বর্গ হইতে কখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নামিয়া আগুন জ্বালাইয়া দেয়। ইত্যবসরে ভগবানের কৃপা ডেভিড হেয়ারের মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়া আগুন জ্বালাইয়া দিল। সে আগুন আজ সহস্র চেষ্টা করিলেও সমস্ত সাগর জলেও নিবাইতে পারিবে না।

১৮১৬ সালে একদিন হেয়ার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভায় এক অধিবেশনে উপস্থিত হইলেন। সভাভঙ্গের পর দুই বন্ধুতে ভারতের জ্ঞান ও নীতির উন্নতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বিষয়ে আলোচনা হইতে হইতে হেয়ার সাহেব ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন বিষয়ে বুঝাইলেন। তিনি একটি ইংরাজী শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাব লিখিয়া আত্মীয় সভার কয়েকজন সভ্যকে দেখাইলেন। রামমোহন রায় তাহাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। এদিকে আত্মীয় সভায় অন্যতম সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় হেয়ারকে কিছু না বলিয়া সেই প্রস্তাব একেবারে সুপ্রীম কোর্টের চীফ

জষ্টিস সার এডওয়ার্ড হাইড্ ঈষ্টের নিকট উপস্থিত করিলেন। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রত্যহ প্রত্যুষে ভ্রমণ করিবার সময় ঈষ্টের সহিত দেখা করিতে যাইতেন। ঈষ্ট তাহা সর্ব্বান্তকরণে অনুমোদন করিলেন। তিনি এবং হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের এক সভা আহবান করেন। সে সময়ে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মজ্ঞান প্রচার লইয়া রামমোহন রায়ের সহিত পৌত্তলিক হিন্দুদিগের দলাদলি চলিতেছিল। রামমোহন রায় জানিতেন যে সভায় তিনি উপস্থিত থাকিলে দলাদলি লইয়া একটা হাঙ্গামা হইবে, তাই তিনি উপস্থিত থাকেন নাই। সভাস্থ ব্যক্তিগণের অনেকে বলিলেন যে ইহাতে রামমোহন রায়ের নামসংস্রব থাকিলে তাঁহারা যোগদান করিবেন না। হেয়ার সাহেব রামমোহন রায়কে এই অপ্রিয় কথা বলাতে তিনি তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখপ্রকাশ না করিয়া তৎক্ষণাৎ ঈষ্টকে নিজের নাম সভ্যশ্রেণী হইতে তুলিয়া দিবার জন্য পত্র লিখিলেন। অবশেষে আর একটি সভা হইবার পর ১৮১৭ সালের ১০শে জানুয়ারীতে গরাণহাটায় হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হইল। বর্ত্তমানে এইস্থানে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি রহিয়াছে। লর্ড হেষ্টিংস ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন।

এদেশে বিদ্যালয় প্রভৃতি খুলিয়া প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষার সাহায্য করিতে ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভভাগে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত ছিলেন না। লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজত্বকালে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ডিরেক্টরদিগের নিকটে যখন দেশীয়দিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রস্তাব উঠিল, তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন অংশীদার বলিলেন যে আমেরিকায় বিদ্যাশিক্ষার বিস্তারই স্বাধীনতার কারণ হইয়াছিল; সেই অভিজ্ঞতার পর আবার ভারতে শিক্ষা বিস্তার বাতুলতা মাত্র।[১] ইহার পর কুড়ি

১ That one of the leading and most efficient causes of the separtiaon of America from Great Britain, as the mother country, was the fonuding of colleges, and establishing seminaries for education in the different provinces...Sound policy dictates that we should in the case of India avoid and steer clear of the rock we had split upon in the case of America.

Quoted by Sanyal—vol II. p. 46

বৎসর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিস্তারের আর কোনও আয়োজন করেন নাই। ইহার পূর্ব্বে ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে কলিকাতায় মাদ্রাসা এবং কাশীধামে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য শিক্ষাবিস্তার নহে, কেবল আদালতের বিচারের সৌকর্য্যার্থে মুসলমান ও হিন্দুদিগের শাস্ত্রসমূহের উপযুক্ত ব্যাখ্যাতা প্রস্তুত করা মাত্র।

বলিতে গেলে, লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালে হিন্দু কলেজের প্রথম ফল ফলিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের বিদ্রোহের ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্ক ছিলেন। সতীদাহ নিবারণ প্রসঙ্গে দেখিয়া আসিয়াছি যে ১৮০৫ সাল অবধি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট প্রজাবিদ্রোহের ভয়ে সতীদাহ উঠাইয়া দিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে (ইহা তখন দিনেমার-দিগের অধীন ছিল) মিশনারিগণ পারস্যভাষায় মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে পুস্তক মুদ্রিত করিলে দিনেমার গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পরামর্শে সেই পুস্তকগুলি কাড়িয়া লইয়া বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় প্রেরণ করেন।

এই অবস্থায় ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গর্বণর জেনেরল লিখিলেন যে গবর্ণমেণ্ট না দেখিলে এদেশে পুস্তক এবং তৎসঙ্গে জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিলোপ হইবার সম্ভাবনা। তিনি নবদ্বীপ এবং ত্রিহুতে আরও দুইটি সংস্কৃত কলেজ খোলা অনুমোদন করিলেন। এই সময়ে ভারতে ও বিলাতে সার উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের প্রবল প্রতাপ। এদিকে বিলাতের মহাসভায় পর বৎসর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দ গ্রহণের প্রস্তাব উঠিল। কয়েকজন ভারত-প্রত্যাগত সভ্য পুস্তকাদি দ্বারা ভারতে শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই আন্দোলনের হস্ত হইতে এড়াইয়া সহজে সনন্দ প্রাপ্তির আশায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। যদিও স্পষ্ট উল্লেখ না থাকুক, সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে এই অর্থে

সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচ্য সাহিত্য ও জ্ঞান বিস্তার করিতে হইবে, কেহই ভাবিল না যে ইহার দ্বারা ইংরাজী সাহিত্যের শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে। দশ বৎসর পর্য্যন্ত এই বাৎসরিক দানে হস্তস্পর্শ হইল না। তাহার পরে গবর্ণমেণ্ট হইতে এক সাধারণ শিক্ষা কমিটি স্থাপিত হইল। সেই কমিটি ঐ সঞ্চিত অর্থ হইতে আরও দশ বৎসর কাল সংস্কৃত কলেজ স্থাপন, সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থ সকল মুদ্রণাদি কার্য্যে ব্যয় করিতে লাগিলেন। একটি পুস্তক মুদ্রিত করিতে কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

এদিকে হিন্দু কলেজের জন্যও কলিকাতার ধনীগণ চাঁদা করিয়া ১,১৩,১৭৯ টাকা উঠাইলেন। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমান-রাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর এবং গোপীমোহন ঠাকুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দান করেন। বোধ হয় তেজচন্দ্রই ইহাতে কুড়ি হাজার টাকা দিয়াছিলেন।[২] উপরোক্ত দুইজন এই দানের কারণে বংশ পরম্পরায় কলেজের গবর্ণর হইয়াছিলেন। গোপীমোহন নিশ্চয়ই দশ হাজারের অধিক দান করিয়াছিলেন। ১৮২২ সালে কলেজের যে নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়, তাহাতে একটি নিয়ম এই দেখি যে কেহ দশ হাজার টাকা দিলে একটি ছাত্র বিনা বেতনে পড়াইবার জন্য কলেজে পাঠাইতে পারিবেন। আমরা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালে হিন্দু স্কুলের মাষ্টারদিগের নিকটে শুনিয়াছিলাম যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের একটি ছাত্র পাঠাইবার অধিকার ছিল। তাহাতেই অনুমান হয় যে তিনি কলেজ সংস্থাপনে সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, অন্তত দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। আমাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে হিন্দু কলেজের স্থাপন কালে তাঁহার বয়স সবে মাত্র ২৩ বৎসর। উক্ত নিয়মাবলীর প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখি যে দ্বারকানাথ ঠাকুর অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন। আবার ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের এক সার্টিফিকেটেও স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। এই সকল ঘটনা

২ Stocqueler—p. 272

হইতে বুঝা যায় যে তিনি এই কলেজের বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতেন।

কলেজ স্থাপনকাল অবধি ছয় সাত বৎসর বেশ চলিয়াছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সাধারণ শিক্ষা কমিটির প্রস্তাবিত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভিত্তি প্রস্তর প্রোথিত হইল। এই সময়ে কমিটির সভ্যদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে একটি আরবী পুস্তক মুদ্রিত করিতে কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত ছাত্রদিগের পাঠার্থ পারসী ভাষাতে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ করা হইয়াছিল খতাইয়া দেখা গিয়াছে যে সেই সকল গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১১ টাকা করিয়া ব্যয় হইয়াছিল। সে অনুবাদ আবার এমনি দুর্ব্বোধ্য হইয়াছিল যে তাহাই বুঝাইবার জন্য তিন শত টাকা মাসিক বেতনে মৌলবী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। বহুকাল পরে ক্রেতার অভাবে স্তুপীকৃত কীটদষ্ট পুস্তক সকল কাগজের দরে বিক্রয় করিতে হইল।

ইহার পূর্ব্বেই ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় ইউরোপীয় শিক্ষার সমর্থন করিয়া তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় পত্র বিশপ হিবরের হাত দিয়া গবর্ণর জেনেরল লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট প্রেরণ করেন। এদিকে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলেজের টাকা যে কোম্পানীর হস্তে গচ্ছিত ছিল, সেই কোম্পানী দেউলিয়া হওয়াতে তেইশ হাজার বাদে আর সকলই নষ্ট হইয়া গেল। কলেজের কাজেই অনটন ঘটিল। তাহার কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিলেন বটে, কিন্তু কলেজের শাসনকর্ত্তৃত্ব পাকে প্রকারে নিজহস্তে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে চাহিলেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি অর্থাভাববশত তাহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। কলেজ নূতন প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজেরই একাংশে ১৮২৬ সালে অবস্থিত হইল। নূতন নিয়ম অনুসারে সাধারণ শিক্ষা কমিটির সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হোরেস হেসাস উইলশন সাহেব কলেজের পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়া অনেক উন্নতি সাধন করিলেন। ১৮২৮

খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ডিরোজিও সাহেব ইহার অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার স্বাধীন চিন্তার ভাব ছাত্রদিগকে স্পর্শ করাতে বিনা অপরাধে তাঁহাকে ডিরেক্টরগণ কর্ম হইতে অবসর প্রদান করেন। হিন্দু কলেজে যদিও ইংরাজী সাহিত্য বিজ্ঞানেরই বেশী চর্চ্চা হইতে ছিল, তথাপি মোটের উপর শিক্ষা কমিটির অধীনস্ত সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রাচ্য সাহিত্য প্রভৃতিরই অতিমাত্রায় আদর ছিল। অবশেষে ১৮৩০ সালে ডিরেক্টরগণ বুঝিলেন যে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অধিকতর ঝোঁক না দিলে দেশের শাসন কার্য্যে দেশীয় ভাল লোক পাওয়া দুরূহ হইবে। তদনুসারে তাঁহারা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক মন্তব্য পাঠাইলেন। সেই সময় লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল। তাঁহার ব্যবস্থাপক সভায় দুই দল ছিল—এক দলে শিক্ষাকমিটির সভাপতি সেক্সপীয়র প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষাবিৎ, অপর দলে মেকলে প্রভৃতি। সেক্সপীয়র গবর্ণর জেনেরলের ঝোঁক বুঝিয়াই পদত্যাগ করিলেন। মেকলে বলিলেন যে যদি ইউরোপীয় শিক্ষা ভারতে প্রবর্ত্তিত না হয়, তবে তিনি পদত্যাগ করিবেন। সেক্সপীয়রের স্থলে মেকলেই বসিলেন এবং পরিণামে তাঁহারই দূরগ্রাহী বুদ্ধি জয়লাভ করিল। এই সকল বিষয়ে দ্বারকানাথের যে খুবই সহানুভূতি ছিল তাহা বেশ বুঝিতেছি। ইংরাজী শিক্ষা এবং ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান প্রভৃতি জীবনধারণের উপযোগী শিক্ষাতে রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ একমত ছিল। এই কারণে দেখি যে রামমোহন রায় যখন আনুমানিক ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি একটি স্কুল স্থাপিত করেন, তখন তাঁহার অনুরোধে দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সেই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। আরও ভাল স্কুল ও হিন্দু কলেজ থাকিতেও তাহাদের কোনটিতে দিলেন না। রামমোহন রায়ের স্কুলটি হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। জানি না মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যদি হিন্দুকলেজে ডিরোজিওর শিক্ষার অধীনে আসিতেন তাহা হইলে তাঁহার কোন্ দিকে গতি হইত।

স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন যে হিন্দু কলেজের শাসন

প্রণালীর পুনর্গঠন সম্বন্ধে এবং ইহাকে ইংরাজী শিক্ষার প্রধান আশ্রয়স্থান করিতে দ্বারকানাথ, কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির একজন উৎসাহী সভ্য থাকিয়া উইলসন ও হেয়ার সাহেবদ্বয়কে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই এই মত ছিল যে, ধনী ও ভদ্র লোকদিগেরই শিক্ষার বন্দোবস্ত হইবে।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কলেজ কমিটি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের এক অঙ্গে পরিণত হইল এবং লর্ড ডালহৌসীর আমলে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ হিন্দুস্কুলে পরিণত হইল এবং হিন্দু-অহিন্দু সর্ব্ব সাধারণের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হইল।

কার ঠাকুর কোম্পানী

দ্বারকানাথ গবর্ণমেণ্টের চাকরীতে থাকিবার কালেই দেশহিতকর কার্য্যসমূহে যোগদান করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর-জেনেরলদিগেরও শ্রদ্ধা প্রীতি-আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গল্প আছে যে তিনি একবার লর্ড বেণ্টিঙ্ককে সপরিবারে তাঁহার বেলগাছিয়ার বাগানে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বেণ্টিঙ্ক নিজে যাইয়া না সহধর্ম্মিণীকে পাঠাইয়াছিলেন। নিজে অনুপস্থিত থাকিবার কারণ এই বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি যখন নিজের কৌন্সিলের মেম্বরদিগেরও নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন না, তখন দ্বারকানাথ নিমকিবোর্ডের দেওয়ানী কর্ম্মে থাকিতে অর্থাৎ অধীনস্থ কর্ম্মচারী থাকিলে স্বাধীনভাবে সকলের মিশিতে পারা যাইবে না—উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণ তাঁহার মনুষ্যোচিত প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করিবে না। ইংরাজও দেশীয়ের মধ্যে মেলা-মেশার স্বাধীনতা না থাকিলে দেশের মঙ্গল করিতে পারা যাইবে না। এই সকল ভাবিয়া ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট তারিখে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা পুর্ব্বেই বলিয়াছি।

কর্ম্ম পরিত্যাগের পরই বেণ্টিঙ্ক মহোদয় তাঁহাকে উইলিয়ম কার নামক তদানীন্তন এক সওদাগরের সহিত পরিচয় করাইয়াছিলেন। এই কার সাহেবের সহিত শুনিতে পাই দশ লক্ষ টাকা লইয়া কারবার খুলিয়াছিলেন। ইউরোপীয় আদর্শে কারবার খোলা বাঙ্গালীর পক্ষে এই প্রথম উদ্যম বলিয়া লর্ড বেণ্টিঙ্ক যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া ও উৎসাহ দিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে দেশীয়গণ নিজেদের দায়িত্বে ব্যবসায় না খুলিয়া ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের বেনিয়ান হইতেন। তাঁহাদের আশা মচ্ছুদ্দী স্বরূপে বিলাতী কুঠীর আদেশ অনুসারে জিনিস ও টাকা জোগাইয়া কেবল দস্তুরী লাভেই সীমাবদ্ধ

ছিল। তাঁহাদের বুদ্ধিতে নিজেদের চালানী কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বোধ হইত না। নিজেদের দায়িত্বে বাণিজ্য করিবার কথা বলিলেই তাঁহারা ভাবিতেন যে তাঁহারা নিরাপদে যে লাভটুকু পাইতেছেন তাহাই ভাল, আপদসঙ্কুল ব্যবসায়ে মাথা ঘামাইয়া কাজ কি? এই সময়ে দ্বারকানাথ স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের মঙ্গলের বলিতে গেলে একমাত্র উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে চাকরীর দশা যেরূপ উপস্থিত, তাহাতে স্বদেশীয়গণকে তাঁহারই প্রদর্শিত পথ, বাণিজ্য পথ অবলম্বন করিতেই হইবে; অবলম্বন না করিলে শ্রেয় নাই। উইলিয়ম কার[১] ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে পামার কোম্পানীর কর্ম্মচারী হইয়া আসেন। এই কোম্পানীরও কর্ত্তা ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর।

এই কুঠীর প্রতিষ্ঠাতা ব্যতীত প্রথম অংশীদার ছিলেন উইলিয়ম কার এবং উইলিয়ম প্রিন্সেপ। ক্রমে মেজর এইচ, বি, হেণ্ডার্গণ, ডব্লিউ, সি, এম প্লাউডেন, ডাক্তার ম্যাকফার্সন (রামপুর বোয়ালিয়ার সিভিল এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন), মাদ্রাজ সামরিক বিভাগের কাপ্তেন টেলর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে ইহার অংশীদার হইয়াছিলেন। ডি, এম, গর্ডন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রথমে এই কুঠীতে কর্ম্মচারীরূপে প্রবেশ করেন, তন্মধ্যে প্রসন্নকুমার পরে সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল হইয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। গর্ডন সাহেব স্বীয় কার্য্যে লাগিয়া থাকিতে থাকিতে ক্রমে কুঠীর অংশীদার পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথই কিন্তু ইহার প্রাণ ছিলেন। তিনিই ইহার কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতেন এবং অর্থের অনটন ঘটিলে তিনি ইহার প্রধান আশ্রয়স্থল ছিলেন। বলিতে কি, ইহার আর্থিক অবস্থা দ্বারকানাথ নিজেই দেখিতেন এবং অপর কাহাকেও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। তাঁহার অগণ্য উপায় ছিল—ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহার সংযোগ, অন্যান্য ব্যাঙ্ক

১ I. G. S. U. Co. Ltd. by Alfred Brame, p. 9

ও কুঠীর নিকটে তাঁহার অশেষ বাজার সম্ভ্রম থাকাতে যত টাকারই প্রয়োজন হইত, কিছুতেই তাঁহার আটকাইত না; যেন মন্ত্রবলে টাকা তাঁহার হাতে আসিত। তিনি যে সকল ভূম্যধিকারীর পূর্ব্বে প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটেও যথেষ্ট সাহায্য পাইতেন।

এই কুঠীর কারবার দ্বারকানাথের জীবনের একটি সর্ব্বপ্রধান ঘটনা, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার সম্বন্ধীয় কাগজপত্র পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের কর্ত্তৃত্বে এবং তাঁহার আদেশে দগ্ধীভূত হওয়াতে এই কারবার যে কত বিস্তৃত ছিল এবং কিরূপে পরিচালিত হইত, তাহার বিবরণ উদ্ধার করিবার কোন আশা নাই। যাহাই হউক আমরা দুএকটি টুকরো কাগজ পাইয়াছিলাম, তাহাতেই গড়ে দৈনিক পঞ্চাশ হাজার হইতে লক্ষ টাকার কারবার চলিতে দেখিয়াছি। একালে ইহা তত বড় কথা না হইলেও সেকালে একজন দেশীয়ের পক্ষে ইহা কম কথা ছিল না।

কার ঠাকুরের অফিস প্রথমত ওল্ডকোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে রানীমুদী গলির (বর্ত্তমানে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট) কোণে ছিল, পরে কলভিন ঘাটের সন্নিকটে উঠিয়া গিয়াছিল।

কারঠাকুরের নামে প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজেই সমস্ত ব্যবসায় চালাইতেন। তাঁহার বাণিজ্য অনেক বিষয় লইয়া চলিত। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বিস্তৃত ব্যবসায় খুলিবার একটু সুবিধাও ঘটিয়াছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের অধিপতি হইলেও তাঁহাদের সওদাগরীভাব ছাড়িতে পারেন নাই। রেশম প্রভৃতি কতকগুলি জিনিসের একচেটিয়া ব্যবসায় তাঁহারা নিজেদের হস্তে রাখিয়াছিলেন। এই খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর সনন্দ পুনঃপ্রদত্ত হয়। পুনঃপ্রদানকালে যে কয়েকটি শর্ত্ত ইহাতে গ্রথিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি এই যে কোম্পানী আর কোন রূপ ব্যবসায় নিজের জন্য করিতে পারিবে না, আর একটি এই যে ইংরাজেরা ইচ্ছা করিলে ভারতে জমি ক্রয় করিয়া বসতি করিতে পারিবেন; এবং আরও একটি এই যে, ভারতীয়দের জন্য উপযুক্ত হইলে জাতিনির্ব্বিশেষে ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমস্ত পদ উন্মুক্ত হইবে। ইহার ফলে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের

বাণিজ্য অবাধ হওয়াতে অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল। পূর্ব্বে ইংরাজেরা বেনামী করিয়া ভয়ে ভয়ে নীল চাষের জমি ক্রয় করিয়া অথবা কর দিয়া লইতেন ;এখন মুক্তভাবে স্বাধীনভাবে সেই সকল করিতে পাইয়া নীলের ব্যবসায় এক বৃহৎ ব্যাপার হইয়া পড়িল। উচ্চ পদসকল অন্তত নামে ভারতীয়দিগের জন্য উন্মুক্ত হওয়াতে দেশীয়গণের হৃদয়ে যেন একটা স্বাধীনতার বাতাস খেলিতে পাইল। দ্বারকানাথের মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই অবসর পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

তিনি একদিকে রামনগরের চিনির কারখানা খুলিলেন, আর একদিকে রাণীগঞ্জের খনি হইতে কয়লার ব্যবসায় খুলিলেন। তাঁহার পৈতৃক জমিদারী বিরাহিমপুর পরগণার প্রধান মৌজা কুমারখালিতে গবর্ণমেণ্টের একটা রেশমের কুঠী ছিল। গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য করা রহিত হওয়াতে তাঁহারা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। দ্বারকানাথ তাহা ক্রয় করিয়া লইলেন। কার-ঠাকুরের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত কারবার ছিল নীলের। শিয়ালদহ প্রভৃতি নানা স্থানে তাঁহাদের নীলের কুঠী ছিল। তাঁহাদের আফিসকে লোকে নীলের বাজার (The Indigo mart) বলিয়াই চিনিত। দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন প্রথমবার বিলাত যান, "তখন তাঁহার হাতে (এই কার-ঠাকুর কোম্পানীর সম্পর্কে) হুগলী, পাবনা, রাজসাহী, কটক, মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী এবং নীলের কুঠী, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তখন আমাদের মধ্যাহ্ন সময়।"[২] পূজ্যপাদ পিতামহদেবের নিকট শুনিয়াছি যে, যে আসামের চা আজ জগদ্বিখ্যাত, সেই চা কার ঠাকুর কোম্পানীই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আমদানি করে। ইতিহাসে দেখিতে পাই যে লর্ড বেণ্টিঙ্ক যখন চীনদেশীয় চায়ের চারা লইয়া কুমায়ুন প্রভৃতি হিমালয়স্থ অঞ্চলে পরীক্ষা করাইতেছিলেন, সেই সময়ে আসামে চায়ের আবিষ্কার

২ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী।

হইয়াছিল এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আসাম হইতে চায়ের অনেকগুলি নমুনা কলিকাতায় পাঠান হইয়াছিল। অনুমান হয় কার-ঠাকুর কোম্পানী দ্বারাই এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। কার-ঠাকুর কোম্পানী সর্ব্বদাই নূতন ও লাভজনক অনুষ্ঠানে ব্রতী হইত। আমরা শুনিয়াছি, কতদূর ঠিক বলিতে পারি না, যে চীনদেশীয় রেশম কার-ঠাকুর কোম্পানী প্রথম আমদানি করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রেশমের কারবার করিত বটে, কিন্তু ভারতে রেশম প্রস্তুত করাইয়া সেই কাঁচা মাল চীন দেশে ও ইউরোপেও বিক্রয় করিত। কিন্তু চীন দেশের তৈয়ারি রেশম কিনিয়া অর্থ লোকসান করিতে সাহস করিত না, কারণ তাহা বিক্রী হয় কি না হয় তাহা জানা ছিল না এবং দ্বিতীয়ত তখন চীন দেশীয় রেশমের অসম্ভব মূল্য ছিল। কার-ঠাকুর কোম্পানী এই কারবার প্রথম আরম্ভ করেন বলিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলাত যান, তখন পরলোকগতা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যের সহিত কয়েক খণ্ড চীনদেশীয় রেশমও নূতন পদার্থ বলিয়া উপঢৌকন দিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজের কোম্পানীর নামে আর একটি কার্য্য করিয়াছিলেন, যে জন্য তাঁহার এবং সঙ্গে সঙ্গে কার-ঠাকুর কোম্পানীর নাম চিরস্মরণীয় হইবার সম্ভাবনা আছে। গঙ্গার মধ্য দিয়া ষ্টীমার চালাইয়া লাভবান হইবার পথ দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম প্রদর্শন করেন।

আমি পূর্ব্বের এক পরিচ্ছেদে বলিয়া আসিয়াছি যে ইংরাজ শাসনের আদিকাল অবধি বহুকাল যাবৎ কলিকাতা হইতে মফঃস্বলে যাইবার পথ একটিমাত্র ছিল; তাহা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড। তাহাও বড়ই বক্রগতি ছিল। লর্ড বেন্টিঙ্ক তাহাকে সোজা করিয়া পথিকদিগকে নব্বই মাইল অতিরিক্ত পথ ভ্রমণের ক্লেশ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। এই স্থলপথে ঠগ ও ডাকাতের হাতে এতদূর প্রাণ সংশয় ছিল যে লোকেরা সহজে পদব্রজে স্থলপথে যাইত না। তীর্থযাত্রীগণ এই কারণে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইবার পূর্ব্বে নিজেদের প্রত্যাগমনের

আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বিষয়সম্পত্তির মৃত্যুকালীন ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছিবার অত্যন্ত ত্বরা, তাঁহারাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক পাল্কীর সাহায্যে স্থলপথে যাত্রা করিতেন। তাহাও অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল ছিল। রাজমহলের অরণ্যপূর্ণ পাহাড়ী স্থান ভেদ করিয়া যখন যাইতে হইত, তখন বেহারাগণের ন্যায় পথিকগণও অনেক সময়ে প্রাণ হাতে করিয়া চলিতেন। অনেক পথিক অনতিদূরে ব্যাঘ্র শয়ান দেখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। বেহারাগণও কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে নিতান্ত গুরুতর দণ্ডের ভয় ব্যতীত পথিকদিগকে ফেলিয়া যাইতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহা ছাড়া পথ ভ্রমের বিস্তর বিবরণ দেখা যায়। একবার গবর্ণমেণ্টের এক কর্ম্মচারী ডাক পাল্কীতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে জলঝড়ের মধ্যে পড়িয়া রাতদুপুরে রাজমহলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বেহারাগণ পথ ভুলিয়া গেল। তখন সেই সিক্ত কর্দ্দমময় ভূমিতে পাল্কী দূরে রাখিয়া সেই নীরব রাত্রিতে দুই বেহারা দস্যুর মত নিকটবর্ত্তী এক কুঁড়ে ঘরে গিয়া গৃহস্বামীকে একেবারে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসিল। সে জুতা লইয়া আসি বলিয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইল এবং অবশেষে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে গিয়া গ্রামের পথ দেখাইয়া দিতে বাধ্য হইল। যদি কিছু মাত্র শব্দ সেই গৃহস্বামী শুনিতে পাইত, তবে সে নিশ্চয়ই পলায়ন করিত ; কারণ মধ্যে মধ্যে এরূপ বেগার ধরা হইত এবং সে রাত্রি সেই রাজকর্ম্মচারীকে পাল্কীবেহারাদিগের সঙ্গে সেই অরণ্যসঙ্কুল স্থানে রাত্রি যাপন করিতে হইত। পরদিবস তাঁহাকে জীবিত দেখা যাইত কিনা কে জানে ?

এই সকল কারণে লোকেরা নিতান্ত ত্বরা না থাকিলে স্থলপথের পরিবর্ত্তে জলপথেই যাত্রা করিত। রাজকর্ম্মচারীগণও পারতপক্ষে স্থলপথে যাইতেন না। পদমর্য্যাদা অনুসারে তাঁহারা পান্সি, ভাউলে অথবা বজরা করিয়া পাটনা, এলাহাবাদ বা দিল্লী যাত্রা করিতেন।

যখন বায়ু অনুকূল হইত তখন পাল তুলিয়া দিয়া দাঁড়ীরা একটু বিশ্রাম পাইত, নচেৎ সমস্ত পথ 'গুণ টানিয়া' চলিতে হইত।

গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের এক আড্ডা হইতে দ্বিতীয় আড্ডায় যাইবার জন্য নৌকা ভাড়ার একটা হার নির্দ্দিষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কর্ণেলগণ নৌকাভাড়া স্বরূপে মাসিক ৯৩০৲ টাকা পাইতেন; কাপ্তেনগণ ১৮০৲ এবং দুর্ভাগ্য লেফটেনাণ্ট, বা এন সাইন মোটে ১০০৲ টাকা পাইতেন।

গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন নগরে পৌঁছিবার সময়ও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে মুঙ্গের ৩৮ দিনে, বক্সারে ২ মাসে, এলাহাবাদে ৩ মাসে। আজ এই তিনমাসের পথ ১৮ ঘণ্টায় পৌঁছান যায়।[৩] কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইতে সেকালে ১ মাস লাগিত এবং আসাম বা শিলেট যাইতে কেবল সময় নিদিষ্ট ছিল না। পাল্কীতে যাইতে অবশ্য উপরোক্ত কাল অপেক্ষা অনেক অল্পদিন লাগিত। খরচের একটি দৃষ্টান্ত দিলেই চলিবে। কলিকাতা হইতে কানপুরে যাইতে ৪০০৲ টাকা পড়িত বলিয়া এক রাজকর্ম্মচারী তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম স্টীমার, যাহা ভারতে প্রথম আসে, তাহার নাম এণ্টারপ্রাইজ (Enterprise)। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ইহা নির্মিত হইয়া ১১৩ দিনে কতকটা বাষ্প বলে এবং কতকটা পাল তুলিয়া ভারতে উপস্থিত হয়। ইহার ছয় বৎসর মাত্র পূর্ব্বে প্রথম বাষ্পীয়পোত আটলাণ্টিক সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। এণ্টারপ্রাইজ্ মোটে ১১২ ফুট লম্বা ছিল। বহুকাল যাবৎ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিল।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন যে গঙ্গায় বাষ্পীয়পোত চালাইয়া বাণিজ্যের সুবিধা করিতে হইবে।[৪] এইগুলি

৩ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের কথা।

৪ 'The object of the establishment of these boats is a prospective advantage to result from a greater facility of commerce and inter-communication between the extermes of the empire.'

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেবলমাত্র কার্য্য না করিয়া অন্যান্য বণিকদিগেরও সহায়তা করিবে স্থির হইল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক নামক প্রথম নদীবাহী ষ্টীমার আসিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে আরও তিনখানি ষ্টীমার আনীত হইল। এই সকল ষ্টীমারে কেবল মাল বোঝাই হইত এবং জাহাজের কর্ম্মচারীদিগের মাত্র থাকিবার স্থান থাকিত। প্রত্যেক জাহাজের সঙ্গে একটি করিয়া যে 'লেজুড়' থাকিত, সেই 'লেজুড়' নৌকায় যাত্রীদিগের স্থান হইত।

এই নৌকায় বিভিন্ন শ্রেণীর কামরা থাকিত। আহারের সময় যাত্রীরা নৌকা হইতে একটা অপ্রশস্ত পাতা কাষ্ঠ অবলম্বনে ষ্টীমারে যাইয়া কাপ্তেন সাহেবের সহিত এক টেবিলে আহার করিতেন। ইহার জন্য যাত্রীদিগকে খাই খরচ বলিয়া কাপ্তেনকে ভাড়ার উপরি দৈনিক ৪৲ টাকা হিসাবে দিতে হইত, তাহাতে কাপ্তেন সাহেবের মাহিনার উপরি বড় কম লাভ হইত না।

কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ যাইতে ষ্টীমারে বর্ত্তমানে মালের ভাড়া লাগে টন পিছু ১২৲ টাকা; সেকালে লাগিত ৭৫৲ টাকা। ১৮৩৯ সালে টন পিছু ভাড়া ২২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 'লেজুড়' নৌকাতে চারটা প্রথম শ্রেণীর, চারটা দ্বিতীয় শ্রেণীর, এবং ছয়টা তৃতীয় শ্রেণীর কামরা থাকিত। প্রথম শ্রেণীর কামরা ১২ ফুট দীর্ঘ এবং ৮ ফুট প্রস্থ হইত এবং তাহাতে দুইটি মাত্র যাত্রী থাকিতে পাইত—প্রত্যেক যাত্রীকে খাই খরচ ছাড়া এলাহাবাদ পর্য্যন্ত যাইতে ৩০০৲ টাকা ভাড়া দিতে হইত। কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ যাইতে ২২ দিন হইতে ২৮ দিন লাগিত, সুতরাং প্রথম শ্রেণীর যাত্রীকে মদ্যের মূল্য বাদে প্রায় ৪০০৲ টাকা দিতে হইত। ইহার জন্যও ঠিক একমাস পূর্ব্বে জানান এবং তৎসঙ্গে অগ্রিম ভাড়া প্রদান আবশ্যক হইত। হুকুম ছিল যে খানসামাগণ সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন ও উষ্ণীষধারী হইয়া থাকিবে; ইউরোপীয় কর্ম্মচারীগণ সর্ব্বদা জ্যাকেট ও জুতা পরিধান করিয়া থাকিবে এবং কেশ উপযুক্তমত ছোট করিয়া কাটিবে এবং

প্রত্যেক খানসামা টেবিলের কাছে আসিবার কালে হাতে একটা পরিষ্কার তোয়ালে লইয়া আসিবে।

গবর্ণমেণ্ট যেমন গঙ্গায় ষ্টীমার করিয়া যাত্রী লইয়া যাওয়া বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিলেন, সেইরূপ নদীমুখ পর্য্যন্ত জাহাজ সকল টানিয়া যাতায়াতের জন্য ষ্টীমারের বন্দোবস্তেও প্রথম পথ দেখাইয়াছেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের পুরাতন ষ্টীমারগুলির স্থানে কতকগুলি নূতন ষ্টীমার আসিল। গবর্ণমেণ্ট তখন পুরাতন ষ্টীমারগুলিকে জাহাজ সকল নদীমুখ পর্য্যন্ত টানিয়া আনিতে যাইতে নিযুক্ত করিলেন। দৈনিক ভাড়া ৪০০ টাকা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পর বাণিজ্যে স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে বানিজ্যের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ষ্টীমারগুলির কার্য্যের অভাব ছিল না। বরঞ্চ এই জাহাজ টানার কাজ এত লাভজনক হইয়াছিল যে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে 'Steam Tug Associtio n' নামে এক কোম্পানী হইল তাঁহারা ফর্ব্‌স্ এবং সীতাকুণ্ড নামক দুইটি ছোট ষ্টীমার লইয়া প্রথম কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই কোম্পানী কার-ঠাকুর কোম্পানীরই একপ্রকার অন্তর্ভুক্ত ছিল; কার-ঠাকুরই উহার কার্য্যনির্ব্বাহক এজেণ্ট হইল। তাঁহাদের প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইল এ, জি, মেকেঞ্জি সাহেব ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর Enterprise জাহাজের দ্বিতীয় অফিসার ছিলেন, সুতরাং কোথায় কি চর আছে তাহা তাঁহার বেশ জানা ছিল। এই কার্য্য সাত বৎসর পর্য্যন্ত বিনা গোলমালে চলিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে কেবল জাহাজ টানা কাজে আবদ্ধ না থাকিয়া আভ্যন্তরীণ পাটোয়ারীর (navigation) কাজও একসঙ্গে চলিলে ভাল হয়। কার-ঠাকুরের অংশীদারদের মত লওয়া হইল। সকলেই তাহাতে মত দিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশের মতে স্থির হইল যে Steam Tug Asssociation হইতে পৃথক এক কোম্পানী স্থাপিত করিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। আশ্চর্য্য এই যে দ্বারকানাথের পূর্ব্বে কোন ইংরাজ সওদাগরের মাথায় জাহাজ টানা কার্য্যের কথা প্রবেশ করে নাই এবং

তাঁহার প্রস্তাবের পূর্ব্বে কোন ইংরাজের মাথায় এই পাটোয়ারির কার্য্যও পৌঁছে নাই। এই সকল হইতেই বুঝা যাইবে যে তিনি কতদূর সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেন।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী Steam Tug Association এর ষান্মাসিক সভায় একটি খসড়া বিজ্ঞাপন উপস্থাপিত হইল যে আপাততঃ ভাগীরথীতে এবং ক্রমশ ভারতবর্ষের অন্যান্য নদী ও সাগরোপকূলে ষ্টীমার সাহায্যে পাটোয়ারি কার্য্য খুলিবার জন্য একটি নূতন কোম্পানী গঠিত হউক। মুলধন স্থির হইল কুড়ি লক্ষ টাকা এবং প্রতি অংশের মূল্য হাজার টাকা। নূতন কোম্পানীর নাম হইবে স্থির হইল 'The India General Steam Navigation Company!' সংক্ষেপে ইহাকে I. G. S. N. Co বলা যায়। বিজ্ঞাপন সকলেরই অনুমোদিত হইল। সাময়িক ডিরেক্টরগণের বোর্ড স্থির হইল এবং কোম্পানীর বিষয় সাধারণ্যে প্রকাশিত হইল।

মুলধনের চাঁদা স্বাক্ষরিত হইতে কিছু বিলম্ব ঘটিল না। সাময়িক বোর্ড গবর্নমেণ্টের নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠাইয়া গবর্নমেণ্টের নিজেদের ষ্টীমারের ব্যবসায় থাকিতে তাঁহাদের কার্য্য সম্বন্ধে অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন। গবর্ণর জেনারেল লর্ড এলেনবরা আশা প্রদান করিলেন যে নূতন কোম্পানী উপযুক্ত সংখ্যক ষ্টীমার রাখিলেই গবর্ণমেণ্ট নিজেদের ষ্টীমারের কার্য্য গুটাইয়া লইবেন।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট গবর্ণমেণ্ট হইতে সনন্দ পাইবার পূর্ব্বে একটা নিয়মানুযায়ী দলিল প্রস্তুত হইল। প্রথম ডিরেক্টর হইয়াছিলেন (১) জন ষ্টর্ম্ম, (২) স্যামুয়েল স্মিথ্, (৩) রোলাণ্ড ম্যাক-ডোনাল্ড ষ্টিফেনসন, (৪) জন অ্যাল্যান, (৫) আলেকজাণ্ডার রোজার্স, (৬) রসতমজী কাওয়াসজী, (৭) রবার্ট কাসেল জেনকিন্‌স্, (৮) জন লায়াল এবং (৯) ডোনাল্ড ম্যাকলাওড গর্ডন। বোর্ডের চেয়ার-ম্যান হইলেন জন ষ্টর্ম্ম এবং প্রতিনিধি চেয়ারম্যান হইলেন স্যামুয়েল স্মিথ্। কার্য্যনির্ব্বাহের কর্ত্তা হইলেন ক্যাপ্টেন এ, জি, মেকেঞ্জি। তিনি কার-ঠাকুরের প্রত্যক্ষ অধীন জাহাজটানা কোম্পানীর

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। মেকেঞ্জি হইলেন নূতন কোম্পানীর কার্য্য-নির্ব্বাহক ডিরেক্টর ও সম্পাদক।

আমাদিগের অনুমান হয় যে দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজের নাম এই কোম্পানীর ডিরেক্টরদিগের মধ্যে প্রবেশ করান নাই, কারণ তাঁহার পূর্ব্বাবধিই দ্বিতীয়বার বিলাতে যাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কার-ঠাকুর কোম্পানীর প্রভাব এই নূতন কোম্পানীর উপর কিরূপ বিস্তৃত ছিল এবং উভয় কোম্পানীর মধ্যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা নূতন কোম্পানীর ডিরেক্টরদিগের বিবরণ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। প্রথম জন ষ্টর্ম্ম কার-ঠাকুরের জাহাজ টানা কোম্পানীর একজন প্রধান ডিরেক্টর ছিলেন এবং তিনি নূতন কোম্পানীর ডিরেক্টর নহে, চেয়ারম্যান হইলেন। দ্বিতীয় শ্যামুয়েল স্মিথ বেঙ্গল হরকরা নামক তদানীন্তন এক ইংরাজী কাগজের স্বত্ত্বাধিকারী ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরও এই কাগজের একজন প্রধান অংশীদার ছিলেন। ইনি হইলেন নূতন কোম্পানীর Vice-Chairman। অষ্টম-জন লায়াল জাহাজ টানা কোম্পানীরও একজন ডিরেক্টর ছিলেন। নবম ডি, এম, গর্ডনও কার-ঠাকুরের কর্ম্মচারী থাকিয়া পরে অংশীদার হইয়াছিলেন। আর মেকেঞ্জি সাহেব যে এই নূতন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাকালে জাহাজটানা কোম্পানীর পরিদর্শকতা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। কারণ, নূতন কোম্পানীর সহিত গোলমাল হইতে না হইতে আবার তিনি জাহাজটানারই পূর্ব্ববৎ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন দেখিতে পাই।

নূতন কোম্পানী বিলাত হইতে দুইটা নূতন ষ্টীমার আনাইলেন। তাহাদের রাখিবার স্থানের অভাব। খিদিরপুরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজের কারখানার নীচেই কার-ঠাকুরের জাহাজের কারখানা ছিল, এখানে জাহাজটানা সমিতির ষ্টীমার প্রভৃতি মেরামত হইত। এদেশীয়েরা সংক্ষেপে ইহাকে 'কার-কোম্পানীর বাঁকশাল' বলিত। স্থির হইল যে নূতন কোম্পানী কতকগুলি সর্ত্তে পাঁচ বৎসরের জন্য এই বাঁকশাল মাসিক ১৫০৲ টাকায় ইজারা লইবেন।

প্রধান দুইটি সর্ত্ত এই ছিল যে 'ইণ্ডিয়া জেনেরল' জাহাজটানা সমিতির নিকট হইতে এই বাঁকশালস্থিত সমুদয় যন্ত্র ও অস্থাবর সামগ্রী ৫৮ হাজার টাকায় কিনিয়া লইবেন এবং ভবিষ্যতে জাহাজটানা সমিতির ষ্টীমার প্রভৃতির যাহা কিছু মেরামত আবশ্যক হইবে, ইণ্ডিয়া জেনেরলকে তাহা সম্পন্ন করিতে স্বীকার করিতে হইবে। মাসিক ভাড়া যেরূপ অল্প, তাহাতে অনুমান হয় যে কার-ঠাকুর ইণ্ডিয়া জেনেরলকে সত্য সত্য একটা বিভিন্ন কোম্পানী স্বীকার করিতেন না, আপনাদেরই কারবারের অংশীদার হিসাবে বা একটি প্রধান সহায় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের এরূপ অনুমান করিবার আরও একটি কারণ এই যে, এই ইজারার দলিল দস্তাবেজ ইণ্ডিয়া জেনেরলের নামে প্রস্তুত না হইয়া কার-ঠাকুরের জাহাজটানার পরিদর্শক মেকেঞ্জি সাহেবের নিজের নামে হইয়াছিল। এলফ্রেড ব্রেম সাহেব[*] তাঁহার ইণ্ডিয়া জেনেরল সম্বন্ধীয় পুস্তকে স্বভাবতই ইসারা করিয়াছেন যে ইহাতে মেকেঞ্জি সাহেবের অসদভিপ্রায় ছিল। আমরা এরূপ অনুমান করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখিতেছি না। ইণ্ডিয়া জেনেরল কুড়ি লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া কারবার খুলিলেন! অনেক দলিল তদানীন্তন এডভোকেট জেনেরলের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল। আর, এই একটা গুরুতর বিষয় কি উপযুক্ত উকিলকে দেখান হইল না, ইহা কি কখনও সম্ভব? আসল কথা আমাদিগের এই বোধ হয় যে ইণ্ডিয়া জেনেরলের মূলধনের চাঁদা স্বাক্ষরিত হইলেও টাকাটা তখনও সম্পূর্ণ জুটে নাই। কাজেই নূতন কোম্পানী টিঁকিবে কিনা, তাহার স্থিরতা ছিল না। এ-অবস্থায় কার-ঠাকুর কোম্পানীর নামে কোন্ সাহসে ইজারা দেন? তবে মেকেঞ্জি সাহেবের নামে হইলে ব্যক্তিগত হিসাবে দেনা আদায় করিবার সুবিধা হইবে এবং আমরা দেখিতে পাই যে মেকঞ্জি সাহেব বরাবর কার-ঠাকুরের অনুগত লোক ছিলেন। মেকেঞ্জি একজন রীতিমত

[*] ইণ্ডিয়া জেনেরলের মেরীন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

কাজের লোক ছিলেন। লেখাপড়া শেষ হইতে না হইতেই তিনি বাঁকশালকে ভবিষ্যতের সম্ভাবী বিস্তৃত কারবারের উপযুক্ত করিয়া ফেলিলেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া জেনেরলের দেখাদেখি গ্যাঞ্জেস ষ্টীম ন্যাভিগেসন কোম্পানী নামে আর এক কোম্পানী দেখা দিল। এই গ্যাঞ্জেস কোম্পানী এবং গবর্ণমেণ্টের পাটোয়ারি কাজের মধ্যে পড়িয়া ইণ্ডিয়া জেনেরলের বড় সুবিধা হইতেছিল না। প্রায় তিন বৎসর বাদে উভয় কোম্পানী মিলিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে কবে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পাটোয়ারি ব্যবসায় উঠাইয়া লইবেন। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বেই দ্বারকানাথের তিরোধান হইয়াছিল। সুতরাং কে আর গবর্ণমেণ্টকে সৎ পরামর্শ দিয়া দেশের হিতসাধনে নিযুক্ত করিবেন? গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিলেন যে তাঁহাদের উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজ দেখিলেই গবর্ণমেণ্টের ষ্টীমার-সমূহকে কেবল গবর্ণমেইণ্টর কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে।

দ্বারকানাথের পরলোক প্রাপ্তির পর ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বিপদের সময়ে হাল ধরিবার উপযুক্ত লোকের অভাবে নানা গোলযোগের সূত্রপাত হইল। অংশীদারগণ চার ডাকের টাকা পাওনা হইলেও তাঁহারা টাকা না দিয়া ডিরেক্টর সভা পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। বেচারা কাপ্তেন মেকেঞ্জি বহুকাল যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, সেই দ্বারকানাথের মৃত্যুতে যে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত কার-ঠাকুর কোম্পানীর সাধ্যমত মঙ্গল করিবার চেষ্টা করিতেন ইহা স্বাভাবিক। এই সময়ে জাহাজটানা সমিতির কতকগুলি মেরামতী কার্য্য সত্বর আবশ্যক হওয়াতে মেকেঞ্জি ইণ্ডিয়া জেনেরলের কাজ রাখিয়া সেই কাজগুলি সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। এই ছুতা অবলম্বনে ইণ্ডিয়া জেনেরলের কয়েকজন অংশীদার ইহার পরিচালক সভার প্রধান হইবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা উপরোক্ত কথা ব্যতীত আরও বলিতে লাগিলেন যে কার-ঠাকুরের নামীয় বিলের টাকা অনেক বাকী পড়িয়া আছে এবং কার-ঠাকুরের বাঁকশালের যন্ত্রাদি বিক্রয় সম্বন্ধে

মেকেঞ্জি ইণ্ডিয়া জেনেরলের দিকে না টানিয়া কার-ঠাকুরের দিকে টানিয়াছেন। এই সময় তাঁহাদের অত্যন্ত অর্থাভাব উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহাদের বাজারে দেনা ছিল ১,১২,৫৬২৲ টাকা, কিন্তু তাঁহাদের মজুদ নগদ তহবিল ছিল মোটে ৪০,১১৩৲ টাকা। লোকের টাকার বেশী টান পড়িলে অনেক সময়ে মাথার ঠিক থাকে না। ইণ্ডিয়া জেনেরলের অংশীদারগণেরও তাহাই ঘটিল। তাঁহারা বিচার করিবার অবসর পাইলেন না। তাঁহাদের মুখপাত্র স্বরূপে দু-একজন মাতব্বর লোক ধুয়া ধরিলেন যে মেকেঞ্জি দোষী এবং ষ্টর্ম্ম প্রমুখ বর্ত্তমান পরিচালক-সভা অকর্ম্মণ্য। অমনি সকলে হাঁ হাঁ বলিয়া উঠিল। ফরাসি বিপ্লবের সময় যেমন ষোড়শ লুইকে বিনা অপরাধেও নিহত না করিয়া বিপ্লবের উন্মত্ততা নির্ব্বাণাভিমুখীন হয় নাই, সেইরূপ ইণ্ডিয়া জেনেরলের অংশীদারগণ পূর্ব্ব পরিচালক সভা না ভাঙ্গিয়া এবং মেকেঞ্জিকে না কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। ইণ্ডিয়া জেনেরল তখনও তিনবৎসর অতিক্রম করে নাই। তাহার কার-ঠাকুরের সহিত বাঁকশাল ইজারা প্রভৃতি নানা সূত্রে লেনদেন ছিল দেখিতেছি। সে অবস্থায় কতকগুলি বিল বাকী পড়িয়াছিল ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। আর যন্ত্রাদি বিক্রয়কালে মেকেঞ্জি কার-ঠাকুরেরই লোক ছিলেন, ইণ্ডিয়া জেনেরলের সহিত তখনও তাঁহার কোনই সম্পর্ক ছিল না। ইণ্ডিয়া জেনেরলের সহিত কার-ঠাকুরের এই সর্ত্তে ইজারার লেখাপড়া হইয়া গেলে তবে মেকেঞ্জি ইণ্ডিয়া জেনেরলের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এসকল কথা বলেই বা কে আর শোনেই বা কে? এ সকলের যিনি মাঝি ছিলেন, তিনি যে আর তখন নাই। আসল কথা এই বোধ হয় যে ইহার অংশীদারগণের মনে জানা ছিল যে কার-ঠাকুরই ইহার মূল প্রাণ। কতকগুলি অংশীদারের প্রাণে তাহা সহ্য হইত না। তাই তাঁহারা দ্বারকানাথের মৃত্যুর পরে (তাঁহার জীবিত অবস্থায় একটি কথা বলিবার সাহস হয় নাই) ইহাকে কার-ঠাকুরের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিবার চেষ্টা করিলেন। তাহা না করিলে তাঁহাদের প্রধান স্থান পাওয়া

অসম্ভব হইত। বিশেষত ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতেই কার-ঠাকুর কোম্পানি টলমল করিতে লাগিল।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এক সাধারণ সভায় অনেক বাগযুদ্ধের পর জন ষ্টর্ম্ম এবং স্যামুয়েল স্মিথের পরিবর্ত্তে জেম্‌স্ হিউম এবং কাপ্তেন এঞ্জলডিউ যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধি চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইলেন। জেম্‌স্ হিউম ব্যারিষ্টার এবং কলিকাতার উত্তর বিভাগীয় পুলিশ আদালতের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, কাজেই তাঁহার স্থানীয় প্রতিপত্তি খুবই বেশী ছিল বুঝা যাইতেছে। তাঁহার আবার 'ষ্টার' নামক এক সংবাদ পত্র ছিল। এই 'ষ্টার' এবং স্মিথের 'হরকরা'তে খুবই বিরোধপূর্ণ লেখনী-সংগ্রাম চলিতে লাগিল। নূতন পরিচালকসভা মেকেঞ্জিকে কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিলেন। মেকেঞ্জি পুনরায় কার-ঠাকুর কোম্পানীর জাহাজটানার পরিদর্শক হইলেন। ওদিকে ইণ্ডিয়া জেনেরলের কর্ম্ম এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। জেম্‌স হিউম কাজের লোক ছিলেন স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি কোন রকমে কোম্পানীকে বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া চালাইতে লাগিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কার-ঠাকুর কোম্পানী এত বিরোধের পরেও উদারতা প্রদর্শন করিয়া বাঁকশালের ইজারা মাসিক ১৫০৲ টাকায় চিরস্থায়ী করিয়া দিলেন। কার-ঠাকুরের টলমল অবস্থা ইহার সহায় হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কার-ঠাকুর দেউলিয়া হইবার পর এই বাঁকশালের আদিম মালিক উইলিয়ম প্রিন্সেপ, যিনি কার-ঠাকুরের অংশীদার ছিলেন, ১৮০০০৲ টাকায় বাঁকশালটি ইণ্ডিয়া জেনেরলকে বেচিয়া ফেলিলেন।

জানি না হিউম সাহেব কার-ঠাকুরের উপর কেন এত বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছিলেন যে, একবার যখন বেঙ্গল কোল কোম্পানীর সম্পাদক ষ্টুয়ার্ট সাহেব ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া জেনেরলের পরিচালক সভার সভ্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল তিনি কার-ঠাকুরের অনুগত লোক বলিয়াই হিউম সাহেব অনেক চেষ্টা চরিত্রের বলে তাঁহার প্রবেশ বন্ধ করিরা দিয়াছিলেন। আমাদের অনুমান হয় যে 'ষ্টার' এবং 'হরকরা' এই দুই সংবাদপত্রের বিরোধেই এই বিদ্বেষের

উৎপত্তি। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে যখন কার-ঠাকুর দেউলিয়া হইলেন, তখন আর তাঁহার বোধ হয় ইণ্ডিয়া জেনেরলের চেয়ারম্যান থাকা আবশ্যক বোধ হইল না, তাই তিনি এই বৎসরেই পদত্যাগ করিলেন। অবশ্য ছুতা ছিল না যে তাহা নহে; তাঁহার সহযোগীদিগের সহিত বনিবনাও হইত না। আলফ্রেড ব্রেম তাঁহার এই পদত্যাগের জন্য তাঁহাকে দোষ দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; প্রকৃত কারণ তিনি ধরিতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হয়।[৬] এই অবধি ইণ্ডিয়া জেনেরলের সহিত কার-ঠাকুরের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া গেল।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাণিজ্যবুদ্ধি যে কত দিকে ধাবিত হইত, আমরা এখন তাহা ভাবিয়াই আকুল হই। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কার-ঠাকুর কোম্পানী জাহাজটানা ব্যবসায় খুলিলেন। এখন সেই জাহাজটানা স্টীমারগুলির জন্য কয়লা আবশ্যক। অবশ্য এই সকল স্টীমার কলিকাতা হইতে সাগর সঙ্গম কিম্বা ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত বড় বড় জাহাজ টানিয়া লইয়া যাইত, পথের দূরত্ব কিছু অধিক ছিল না; সুতরাং তাহাতে কয়লার জন্য বেশী অসুবিধাও ভোগ করিতে হইত না। বর্ত্তমান জাহাজী কয়লার মূল্য গড়ে পাঁচ আনায় এক মণ[৭] সেকালেও গড়ে সাড়ে পাঁচ আনা হইতে ছয় আনা মণ ছিল। কিন্তু যখন অবধি তাঁহার বুদ্ধিতে পাটোয়ারি কার্য্যের কথা স্থান পাইল, তখন অবধি তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে ইহার প্রধান অন্তরায় স্টীমার সমূহের জন্য কয়লার বন্দোবস্ত করা। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পাটোয়ারি কার্য্যের প্রস্তাব উঠে কিন্তু ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের

৬ আলফ্রেড ব্রেম-এর পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ:

It is regrettable to find that Hume, undoubtedly a strong man and one to whom the company was under great obligations, allowed pique to lead him to take a line of action wholly contrary to his previous policy. It is the more inexcusable, as the existing board consisted of excolleagues who had stood shoulder to shoulder within many a hard fight.

৭ রচনার সময় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ

পূর্ব্বেই তিনি শ্রীযুক্ত ডীন্‌স্‌ ক্যাম্বেল সাহেবের সাহায্যে বেঙ্গল কোল কোম্পানী নামক একটি কারবার প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাণীগঞ্জস্থ নিজেদের খনি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কয়লা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। পূজ্যপাদ পিতামহদেব তাঁহার আত্মজীবনীতে এই বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "আমার পিতা ১৭৬৩ শকের (১৮৪২ খৃষ্টাব্দে) পৌষ মাসে য়ুরোপে প্রথমবার যান। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে।"[৮]

পূর্ব্বে পাটোয়ারি স্টীমারসমূহের জন্য কয়লা সংগ্রহ অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য ছিল। রেলওয়ে হইবার পূর্ব্বে রাণীগঞ্জ হইতে দামোদর নদী বাহিয়া আনা হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহাতেও তখনকার কয়লার দাম বড় চড়ে নাই। কিন্তু কয়লা পশ্চিমাঞ্চলে পাঠাইবার কালেই যত মুস্কিল হইত। সেকালের নরম চাপের এঞ্জিন সমূহে বর্ত্তমানের এঞ্জিন অপেক্ষা অনেক বেশী কয়লা খরচ হইত। অথচ সেকালের স্টীমার নিজের খরচের উপযুক্ত কয়লা চতুর্থাংশের অধিক বহন করিতে পারিত না। এই কারণে গঙ্গার উপরে অতিরিক্ত ব্যয়ে স্থানে স্থানে কয়লার আড়ত রাখিতে হইত। পাটনায় কয়লা রাখিবার আড়ত খরচা প্রতি মণে বার আনা, এলাহাবাদে এক টাকা পড়িত। ইণ্ডিয়া জেনেরলের প্রথম ছয় বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ খরচ হয় ২২,২৪,৪০৭৲ টাকা, তন্মধ্যে কেবল কয়লার উপরে খরচ পড়িয়াছিল ৮,৭০,৩৬৪৲ টাকা অথবা শতকরা ৩৯ টাকা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে যখন রাণীগঞ্জের ভিতর দিয়া ১৮৭১ সালে মোকামায় পৌঁছিল তখন হইতে এই কষ্টের অবসান হইল।

যাহা হউক ইণ্ডিয়া জেনেরল বেঙ্গল কোল কোম্পানীর নিকট হইতেই কয়লা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, ইণ্ডিয়া জেনেরল প্রতিষ্ঠা

৮ কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন যে দ্বিতীয়বার বিলাত গমনের পূর্ব্বে বেঙ্গল কোল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন। বোধ হয় ইহা প্রথমবার বিলাত গমনের পূর্ব্বে হইবে।

অবধি অন্তত ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কয়লার দাম নিয়মিতরূপে পরিশোধ করিতে পারিত না। কয়লার জন্য কার-ঠাকুরের কাছে ইণ্ডিয়া জেনেরল অনেক টাকার দায়ী হইয়া পড়িয়াছিল। ইচ্ছা করিলে কার-ঠাকুর ইণ্ডিয়া জেনেরলকে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারিতেন, কিন্তু কোম্পানীর কোন সভ্যের সেরূপ নীচতা অভ্যস্ত ছিল না। কার-ঠাকুর দেউলিয়া হইবার পর তাহার অন্যতম অংশীদারদ্বয় গর্ডন এবং ষ্টুয়ার্ট মিলিত নামে জাহাজটানা কাজ এবং বেঙ্গল কোল কোম্পানীর কাজ কিনিয়া লইলেন। যতদূর বুঝা যাইতেছে, কার-ঠাকুর কয়লার জন্য ইণ্ডিয়া জেনেরলের নিকট যাহা পাইতেন, তাহা পান নাই এবং তাঁহাদের ইণ্ডিয়া জেনেরলের নিকট মেরামতী কার্য্যের জন্য যাহা দেনা ছিল, দেউলিয়া হওয়াতে তাহা দিতে পারেন নাই। ইণ্ডিয়া জেনেরল ১৮৫৩ সালে সেই সকল অনাদায়ী বলিয়া জমাখরচ করিয়া লইয়াছিলেন।

লেখাপড়ায় ইণ্ডিয়া জেনেরল ক্রমে কার-ঠাকুর হইতে সম্পূর্ণ সরিয়া পড়িলেও প্রথমাবধি উভয় কোম্পানীর এতদূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল যে জনসাধারণ ইণ্ডিয়া জেনেরলকে কার-ঠাকুরেরই এক কারবার বিভাগ বলিয়া জানিত। আজ পর্য্যন্ত অশিক্ষিত হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারিগণ ইণ্ডিয়া জেনেরলের ষ্টীমারের বিষয় উল্লেখ করিতে গেলে হয় 'কার-কোম্পানী কা জাহাজ' অথবা 'দোয়ারি বাবুকা জাহাজ' বলিয়া থাকে। আমার এক বন্ধু একদিন আমাকে এই সংবাদ দিলেন যে তিনি ইণ্ডিয়া জেনেরলের জাহাজে যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন, অনেকগুলি মাড়োয়ারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে 'দোয়ারি বাবুকা জাহাজ' কোথায় ? এতদিনে তাহার ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হইল।

কার-ঠাকুর কোম্পানীর সূত্রে দ্বারকানাথের একটি দুর্নাম রটিয়াছিল—তিনিই কলিকাতায় নাকি মদ্যের স্রোত চালাইয়াছেন। তিনি নিজে বহুকাল যাবৎ মদ্য স্পর্শ করেন নাই, অবশেষে রামমোহন রায়ের সহিত মিশিবার পর সায়ংকালীন আহারের পর এক গ্লাস

করিয়া সেরি খাইতেন।* সুতরাং তিনি নিজে মদ্যের অপকারিতা বুঝিয়া যে দেশে সেই বিষের স্রোত ঢালিয়া দিবেন, ইহা একটু আশ্চর্য্য নহে কি? ইহা কি শুনিবামাত্রই বিশ্বাসযোগ্য? আমার যতদূর স্মরণ হইতেছে, আমি পূজনীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এই বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়াছিলাম। কথা উত্থাপিত হইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, "আমি তাঁহাকে বিলক্ষণ জানি—এসকল কথা নিন্দুকের কথা। প্রকৃত কথা এই যে তিনি দেখিলেন যে মদ্যের আমদানি তো বাড়িতে চলিল, তবে তাহার লভ্যাংশ ইউরোপীয়গণ সমস্ত উপভোগ না করিয়া আমাদের দেশের লোকে যতটুকু উপভোগ করেন তাহাই দেশের ভাগ্য। এই কারণে তাঁহার এক অনুগত লোক বিশ্বনাথ লাহাকে মদ্য খুচরা বিক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন।" অবশ্য কার-ঠাকুর তাঁহাকে পাইকারী দরে মদ্য বিলাত হইতে আনাইয়া দিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ কথার উপর আমার টীকা করা ধৃষ্টতা মাত্র। তবে তাঁহার এ দুর্নামেরও অন্যান্য দুর্নামের ন্যায় কারণ আছে। যখন গভর্ণর জেনেরল প্রভৃতিকে দ্বারকানাথ তাঁহার বেলগাছিয়ার বাগানে ভোজ দিতেন, তখন সেখানে যতকিছু মদ্য খরচ হইত তাহা তিনি কোন ইংরাজ সওদাগরের কাছে ক্রয় না করিয়া বিশ্বনাথ লাহার নিকটে ক্রয় করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের কাজ করিতেন। সেকালের বাগবাজারের রূপচাঁদ পক্ষীর একটি গানও এই দুর্নাম রটাইবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে—এই গানটি, জানি না এই গান কতদূর সম্পূর্ণ পাইয়াছি, যতখানি উদ্ধার করিয়াছি, এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।

কি মজা আছে রে লাল জলে
জানো ঠাকুর কোম্পানী।
মদের গুণাগুণ আমরা কি জানি
জানেন ঠাকুর কোম্পানী।

* মহর্ষির নিকটে শ্রুত।

ফি শনিবারে আসে গাড়ী-ভরে
বেরাণ্ডি আর শ্যাম্পেন
যত বাবুচেয়ে আসছেন ধেয়ে
সাহেব সুবো ছাড়া নয়।
সাহেব থাকেন ফটকে আঁটা
আটক হয়ে এটিকেট জানা
হুকুম হলে টিকিট দিয়ে
সেলাম করে যান গো চলে
মুচি চাষা মুদ্দোফরাস
তেনাদের নাইকো মানা।
মদের ইয়ার দলে দলে
আসেন গুলবাহার চাদর পরে
আতরেতে হয়ে তর
সোডাওয়াটার কেবল ওয়াটার
মদেতে আসেন গুণে

চালাকদাস ধূর্ত্ত ছেলে
হুঙ্কারেতে চমকে পিলে
রূপচাঁদপক্ষী
দুটি অক্ষি
দেখে শুনে আছে জানা।

এইবারে কার-ঠাকুরের দেউলিয়া হইবার বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। লোকের সংস্কার আছে যে দ্বারকানাথের জীবনকালের মধ্যেই কার-ঠাকুরের কারবার দেনায় ডুবিবার সূত্রপাত হইয়াছিল; তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই অনেকের এইরূপ বিশ্বাস এবং অনেকে এইরূপ ব্যক্তও করিয়া থাকেন যে তাঁহার এই সকল কারবারী ঋণ-জালের জন্য তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে যথেষ্টই ভুগিতে

হইয়াছিল। আমরা যতদূর তাঁহার জীবন পর্য্যালোচনা করিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। পূজ্যপাদ পিতামহদেব লিখিয়াছেন—"তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এইসকল বৃহৎ কার্য্যের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না।"* ইহাই হইল কার-ঠাকুরের পতনের মূল সূত্র।

কার-ঠাকুরের অর্দ্ধেক অংশ ছিল দ্বারকানাথের, আর বাকি অর্দ্ধেক অংশের অংশী অন্য অন্য ইংরাজ; যখন দেবেন্দ্রনাথ এই কারবারের অংশীদার হইলেন, তখন তাঁহার ইহাতে এক আনা অংশ ছিল। দ্বারকানাথ, এই ব্যবসায়ে তাঁহার যে অর্দ্ধাংশ তাহা কেবল একা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথকে দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সে অর্দ্ধাংশ তিনি কেবল নিজের জন্য না রাখিয়া তিন ভাইয়ে সমান ভাগ করিয়া লইলেন। পূজ্যপাদ পিতামহদেবের কথায় কয়েকটি বিষয় বলিব। "গিরীন্দ্রনাথের খুব বিষয়-বুদ্ধি ছিল। যখন হাউসের উপরে তাঁহার অধিকার জন্মিল, তখন এক দিন আমার নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে, 'যখন হাউসের মূলধন সকলি আমাদের, তখন সাহেব-দিগকে হাউসের অংশ দেওয়া কেন হয়? সমুদয় বিষয় আমাদের অধিকারে আসুক না কেন?' একথা আমার মনে ধরিল না! বলিলাম, 'এ প্রস্তাব বড় ভাল নয়। আপনাদিগকে অংশী মনে করিয়া সাহেবেরা এখন যেমন উৎসাহে, যে মনের বলে, কার্য্য করিতেছে, তাহাদিগকে সে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিলে আমাদের কাজে তাহাদের তেমন দৃষ্টি ও উদ্যম থাকিবে না। আমরা একা একা কিছু এই বৃহৎ কার্য্য চালাইতে পারিব না, কাজের জন্য তাহাদের চাইই চাই। অংশী বলিয়া তাহারা যেমন লাভের অংশ পায়, তেমনি ক্ষতির সময়ে তাহাদেরও ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আর, অংশ না দিয়া তাহাদিগকে বেতনভোগী চাকর করিয়া

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী

রাখিলে, তাহাদের মোটা মোটা মাহিয়ানা আমাদের যোগাইতেই হইবে ; অথচ এখন হাউসের লাভের প্রতি তাহাদের যে যত্ন আছে, তখন আর তাহা থাকিবে না। অতএব তোমার এ প্রস্তাব আমার ভাল বোধ হইতেছে না।' তিনি আমাকে বুঝাইলেন যে, 'সাহেবদের তো কোন বিষয় বিভব পৃথক সম্পত্তি নাই। যদি কখনো বাণিজ্যের পতন হয়, তবে মহাজনেরা আমাদিগকেই আসিয়া ধরিবে, আমাদেরই বিষয় আটক পড়িবে, আমাদিগকেই সকল টাকা বুঝাইয়া দিতে হইবে। দেনার দায়ে আমাদেরই বিষয় বিক্রয় হইয়া যাইবে। লাভের সময় এখন তাহারা ভাগী, কিন্তু ক্ষতির দায়ে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। লাভ খাইয়া তাহারা চলিয়া যাইবে, ক্ষতি গণনা করিয়া কেবল আমরাই যথা-সর্ব্বস্ব দিতে থাকিব। এখনো দেখুন কি হইতেছে,—আমাদের জমিদারীর সকল টাকাই এই হাউসে ঢালা হইতেছে ; যতই টাকা দেওয়া যাইতেছে, ততই ইহার ক্ষুধার বৃদ্ধি হইতেছে ; তাহার এ রাক্ষসী ক্ষুধা আর মিটে না। কিন্তু সাহেব অংশীরা ইহাতে এক পয়সাও দেন না।' এই কথায় আমি তাঁহার বিষয়-বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে হাউসের উপর কর্ত্তৃত্ব ভার দিলাম, এবং আমি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের জন্য প্রচুর অবসর পাইলাম।

"এখন আমরা তিনভাই অবিভাগে সমস্ত হাইসের অধিকারী হইলাম। পূর্ব্বকার অংশী সাহেবদিগকে যাহার যেমন অংশ ছিল সেই অনুসারে, কাহাকেও বা এক হাজার টাকা, কাহাকেও বা দুই হাজার টাকা মাসিক বেতনে হাউসের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম। তাহারা অগত্যা তাহা স্বীকার করিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে লাগিল। গিরীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে কার-ঠাকুর কোম্পানীর কার্য্যের এই নূতন প্রণালী নিবদ্ধ হইল। তাহাতে আমি সম্মত হওয়ায় তিনি উৎসাহ পাইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক যথাসাধ্য হাউসের বাণিজ্য কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।"[১]

১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী,

তদনন্তর কয়েকমাসের মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং কাশী যাইতে প্রস্তুত হইলেন। লালা হাজারী লালকে সঙ্গে লইয়া ১৭৬৯ শকের (১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) আশ্বিন মাসে পাল্কীর ডাকে কাশী যাত্রা করিলেন।

পূজ্যপাদ পিতামহদেব কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে, "আমাদের হাউস কার-ঠাকুর কোম্পানী টল্‌মল্ করিতেছে। হুণ্ডী আসিতেছে, তাহা পরিশোধ করিবার টাকা সহজে জুটিতেছে না। অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে, প্রতিদিন টাকা যোগাইতে হইত। এমন করিয়া আর কত দিন চলে? এই সময়ে একদিন একটা ত্রিশ হাজার টাকার হুণ্ডী আসিল; সে টাকা আর দিতে পারা যাইতেছে না। সে দিন সন্ধ্যা হইল, টাকা জুটিল না। হুণ্ডীওয়ালা টাকা না পাইয়া হুণ্ডী লইয়া ফিরিয়া গেল। কার-ঠাকুর কোম্পানীর হাউসের সম্ভ্রম চলিয়া গেল—আফিসের দরজা সকল বন্ধ হইল।

"১৭৬৯ শকের ফাল্গুন মাসে কার-ঠাকুর কোম্পানীর ব্যবসায় পতন হইল। তখন আমার বয়স ৩০ বৎসর। প্রধান কর্ম্মচারী ডি এম গর্ডন সাহেবের পরামর্শে সমস্ত পাওনাদারদিগকে ডাকিয়া একটা সভা করা গেল। ব্যবসায় পতনের তিন দিবস পরে হাউসের তৃতীয়তল গৃহে উঁহারা সকলে সমবেত হইলেন। ডি, এম, গর্ডন আমাদের দেনাপাওনার একটা হিসাব প্রস্তুত করিয়া এই সভাতে উপস্থিত করিলেন। সেই হিসাবে দেখান হইল যে, আমাদের হাউসের মোট দেনা এক কোটি টাকা, পাওনা সোত্তর লক্ষ টাকা—ত্রিশ লক্ষ টাকা অসংস্থান। তিনি সভার সম্মুখে বলিলেন যে, 'হাউসের অধিকারীরা আপনার আপনার নিজের যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহাও ইহাতে দিয়া ইহার অসংস্থান পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এই হাউসের পাওনা ও সম্পত্তি, এবং ইঁহাদের জমীদারীর স্বত্ব, সকলি আপনাদের অধীনে আনিয়া আপন আপন পাওনা পরিশোধ করুন। কিন্তু একটি ট্রষ্ট-সম্পত্তি আছে, তাহাতে

তাঁহারা অধিকারী নহেন, কেবল সেই সম্পত্তির উপরে আপনারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।' গর্ডন এইরূপ বক্তৃতা করিতেছেন, আমি গিরীন্দ্রনাথকে বলিলাম—'গর্ডন সাহেব পাওনাদারদিগকে ভয় দেখাইতেছেন যে, আমাদের ট্রষ্ট সম্পত্তিতে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এ সময় আমাদের নিজে অগ্রসর হইয়া বলা উচিত, 'যদিও আমাদের দেনার দায়ে ট্রষ্ট-সম্পত্তি কেহ হস্তান্তর করিতে পারেন না, তথাপি আমরা এই ট্রষ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া ঋণ-পরিশোধের জন্য ইহাও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি।' যাহাতে আমরা পিতৃঋণ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারি, সেই পথই অবলম্বন করা শ্রেয়। যদি অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ না হয়, তবে ট্রষ্ট সম্পত্তিও বিক্রয় করিতে হইবে।

"এদিকে পাওনাদারেরা কতকগুলা সম্পত্তির উপরে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইতেছেন না; কিন্তু যখন তাঁহারা অনতিবিলম্বেই শুনিলেন যে, কোন আইন-আদালতের মুখাপেক্ষা না করিয়া আমরা স্বেচ্ছাক্রমে অকাতরে ট্রষ্ট-সম্পত্তির সহিত আমাদের সকল সম্পত্তিই তাঁহাদের হস্তে দিতে প্রস্তুত আছি, তখন তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলাম, আমাদের এই প্রস্তাব শুনিয়া অনেক সহৃদয় মহাজনের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইল। আমাদের এই আসন্ন বিপদ দেখিয়া তাঁহারাও বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, এই হাউসের উত্থান ও পতনে আমাদের কোন হস্ত নাই; আমরা নির্দোষ ও নিরীহ; আমাদের মস্তকে এই অল্প বয়সে এই দারুণ বিপদ পড়িল। আজ আমাদের এই ঐশ্বর্য্য বিভব, কাল আর ইহার কিছুই থাকিবে না, ইহাই ভাবিয়া তাঁহারা দয়ার্দ্র হইলেন। কোথায় তাঁহাদের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া ক্রুদ্ধ হইবেন, না, তাঁহারা দয়ার্দ্র-হৃদয় হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ে কোথা হইতে দয়া আসিল? তিনিই ইঁহাদের মনে দয়া প্রেরণ করিলেন যিনি আমার চিরজীবন-সখা।

"তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, যখন ইহা সকলি ছাড়িয়া দিলেন, তখন ইহাদের সম্পত্তি হইতে ভরণপোষণের জন্য ইঁহারা প্রতি বৎসর ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা করিয়া পাইবেন। দেনাদার পাওনাদারদিগের মধ্যে এইরূপে একটা সদ্ভাব রহিয়া গেল। কেহ আর তখন আপনার পাওনার জন্য আদালতে নালিশ আনিলেন না। আমাদের সকল সম্পত্তি তাঁহারা আপন হাতে গ্রহণ করিলেন, এবং সেই বিষয় চালাইবার জন্য তাঁহাদের মধ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি-দিগকে লইয়া একটি কমিটি সংগঠিত করিলেন। সেই কমিটির একজন সম্পাদক হইলেন, তাঁহার বেতন এক হাজার টাকা হইল; তাঁহার অধীনে আরও কর্ম্মচারী থাকিল। এখন হইতে 'কার-ঠাকুর কোম্পানী 'ইন্ লিকুইডেশন' নামে তাঁহাদের কার্য্য চলিতে লাগিল।

"আমাদের সকল সম্পত্তির উপরে পাওনাদারেরা আপন কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন। আমরা দুই ভাই বাড়ী চলিলাম। গাড়ীতে যাইতে যাইতে আমি গিরীন্দ্রনাথকে বলিলাম—'আমরা তো বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া সকলি দিলাম।' তিনি বলিলেন, 'হাঁ, এখন লোকে জানুক, আমাদের জন্য আমরা কিছুই রাখি নাই; তাহারা বলুক যে, ইঁহারা সকল ধন দিলেন, 'সর্ব্ববেদসং দদৌ।' আমি বলিলাম যে, 'লোকে বলিলে কি হইবে? আদালত তো শুনিবে না। আদালতে যে কেহ এক জন নালিশ করিলেই আমাদের শপথ করিয়া বলিতে হইবে যে, আমরা সকলি দিলাম, আমাদের আর কিছুই নাই; নতুবা আদালত আমাদিগকে ছাড়িবে না। কিন্তু, যাবৎ অঙ্গে একটি চীর পর্য্যন্ত থাকিবে, তাবৎ রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলিতে পারিব না যে, সব দিলাম। এমনি সকলি দিব, কিন্তু শপথ করিতে পারিব না। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন, যেন ইন্‌সলবেণ্ট আইনে আমাকে মস্তক দিতে না হয়। এই সকল কথাবার্ত্তায় আমরা বাড়ী পঁহুছিলাম।

"আমি যা চাই, তাই হইল। বিষয়সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল।…চাকরের ভিড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ী ঘোড়া সব নিলামে দিলাম, খাওয়া পরা খুব পরিমিত করিলাম; ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম। কল্য কি খাইব, কি পরিব, তাহার আর ভাবনা নাই। কাল এ বাড়ীতে থাকিব, কি, এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে, তাহার ভাবনা নাই। একেবারে নিষ্কাম হইলাম।"…

"এই সময়ে আমি সকালে দুই প্রহর পর্য্যন্ত গভীর দর্শন-শাস্ত্রের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। দুই প্রহরের পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেদ বেদান্ত মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনায়, ও বাঙ্গালা ভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদে নিযুক্ত থাকিতাম। সন্ধ্যার সময় ছাদের উপর প্রশস্ত কম্বল পাতিয়া বসিতাম। সেখানে আমার কাছে বসিয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মরা, ধর্ম জিজ্ঞাসু সাধুরা নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। এই আলোচনাতে কখন কখন রাত্রি দুই প্রহরও অতিবাহিত হইয়া যাইত। সেই সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ সকলও পরিদর্শন করিতাম।

"হাউস পতনের তিন চারি মাস পরে গিরীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলিলেন যে, 'এত দিন চলিয়া গেল, কিন্তু ঋণের তো কিছুই পরিশোধ হয় না। কেবল সাহেবেরা বসিয়া মাহিয়ানা খাইতেছে। এ প্রকার ব্যবস্থাতে ঋণ যে পরিশোধ হইবে, তাহা তো আশা করা যায় না। এরূপ করিয়া চলিলে আমাদের ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়াও ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব না। অতএব আমি পাওনাদারদের কমিটিতে এই প্রস্তাব করিতে চাই যে, যদি তাঁহারা সমুদয় কার্য্যের ভার আমাদের হাতে দেন, তবে আমরা আপনারা চেষ্টা করিয়া অল্প ব্যয়ে অনতি-দীর্ঘকালে ঋণ পরিশোধের একটা উপায় করিতে পারি।' আমি বলিলাম যে, 'এ তো বড় উৎকৃষ্ট প্রস্তাব।' পরে আমরা পাওনাদারদিগের সভাতে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। তাঁহারা আহ্লাদপূর্ব্বক বিশ্বস্ত চিত্তে ইহাতে সম্মত হইলেন। তাহার পরে কাজকর্ম্ম চালাইবার ভার আমরা নিজে

গ্রহণ করিয়া আমাদের বাড়ীতেই আফিস উঠাইয়া আনিলাম, এবং সেই আফিসে এক জন সাহেব ও এক জন কেরাণী নিযুক্ত করিলাম। এখন আমাদের বাড়ীতে বসিয়াই কার-ঠাকুর কোম্পানীর ঘুড়ীর লক্ গুটাইতে লাগিলাম। মধ্যপথে এখন তাহা না ছিঁড়িলে হয়!"[১০]

"১৭৭৬ শকে (১৯ ডিসেম্বর ১৮৫৪) গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তিনি হাউসের কার্য্য যে প্রকার নিপুণতার সহিত চালাইতে ছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুতে সে কার্য্য চালাইবার একটা বড়ই অভাব পড়িয়া গেল। এতদিনে অনেক ঋণ পরিশোধও হইয়াছে, অনেক অবশিষ্টও আছে। কোন কোন পাওনাদারেরা টাকা পাইবার বিলম্ব আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমাদের নামে নালিশও করিয়াছে, এবং ডিক্রীও পাইয়াছে।

"আমি এই সময়ে প্রতিদিন মধ্যাহ্নের ভোজনের পর তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্য পরিদর্শনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের দোতালায় সভার কার্য্যালয়েই থাকিতাম। এক দিন আমি আহারের পর সভায় যাইতেছি, এমন সময়ে আমার বাড়ীর লোকেরা বলিল যে, 'আজ সভায় যাবেন না, আজ একটা ওয়ারিনের আশঙ্কা আছে।' মিথ্যা একটা বাধা মাত্র মনে করিয়া, আমি ইহা শুনিয়াও সভাতে চলিয়া গেলাম, এবং সেখানে বসিয়া সভার কার্য্য দেখিতে লাগিলাম। ক্ষনেক পরে, দেখি যে, একজন বাঙ্গালী কেরাণী আসিয়া চোখ মুখ লাল করিয়া আমাকে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, 'আমি যে আজ আপনাকে এখানে আসিতে মানা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম; আপনি আজ এখানে কেন এলেন?' পরে সে পশ্চাদ্বর্ত্তী বেলিফকে আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, 'ইনিই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।' তখন সেই বেলিফ আমাকে একখানা ওয়ারেণ্ট দিল। বলিল '১৪০০০৲ চৌদ্দ হাজার টাকা এখনি দাও।' আমি বলিলাম, 'চৌদ্দ হাজার টাকা এখন আমার কাছে নাই।' সে

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বলিল, 'তবে এখনি আমার সঙ্গে শেরিফের নিকট এস।' আমি তাহাকে একটু বসিতে বলিয়া গাড়ী আনিতে পাঠাইলাম। গাড়ী আসিল, এবং সেই সাহেব, বেলিফ সেই গাড়ীতে করিয়া আমাকে শেরিফের নিকটে লইয়া গেল।

"এদিকে আমাদের বাড়ীতে মহা গোল উঠিয়াছে—আমাকে ওয়ারেণ্ট দিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। আজ সকলেই আমাকে বাড়ীর বাহিরে যাইতে বারণ করিয়াছিল, আমি কাহারো কথা শুনি নাই, আমাকে ওয়ারেণ্ট ধরিয়াছে, সকলেরই মুখে এই কথা।

"আমাদের উকিল জর্জ্জ সাহেবই ঘটনাক্রমে সেই বৎসরে শেরিফ ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার অফিসে বসাইলেন এবং আমি যে কেন আজ বাড়ীর বাহির হইয়াছিলাম, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

"এদিকে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ জজ কলবিলের নিকট গিয়া উপস্থিত। তিনি জামিন দিয়া আমাকে খালাস করিবার পরামর্শ দিলেন। তখন আমাদের বাড়ীর চন্দ্রবাবু (চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি জামিন হইয়া আমাকে কারাবাসের দায় হইতে মুক্ত করিয়া আনিলেন।

"আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইহা অবগত হইয়া ক্ষোভ করিয়া বলিলেন 'দেবেন্দ্র আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করে না, কিছুই বলে না; আমাকে জানাইলেই তো আমি তার ঋণের সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি।' আমি ইহা শুনিয়া তাহার পরদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন যে, 'দেখ, তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তুমি তোমার জমিদারীর সকল টাকা আমার নিকট জমা দিবে, আমি উপস্থিত-মত তোমার দেনা পরিশোধ করিব। কেহ আর এ বিষয়ে তোমাকে উৎপাত করিতে পারিবে না।' আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার এই প্রস্তাব স্বীকার করিলাম এবং আমাদের জমিদারীর সমস্ত মুনাফাই তাঁহাকে দিতে লাগিলাম, এবং তিনি আমাদের দেনা পরিশোধের ভার

লইলেন। সেই অবধি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কাছে আমি প্রায়ই প্রতিদিন প্রাতে যাইতাম। তাঁহাকে হিসাবপত্র দেখাইতাম এবং দেনা-পাওনার কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিতাম।"[১১]

আত্মজীবনীতে তিনি আর এক জায়গায় বলিয়াছেন—"এতদিনে, এই দশ বৎসরে, আমাদের ঋণ অনেক পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। পিতৃ-ঋণের মহাভার আমার অনেক কমিয়াছে। কিন্তু আর এক প্রকার নূতন বিপদভার, ঋণভার, আমাকে জড়াইতে লাগিল। গিরীন্দ্রনাথ যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার নিজের খরচের জন্য অনেক ঋণ করিয়াছিলেন; আমি তাঁহার কতক ঋণ পিতৃ-ঋণের সঙ্গে পরিশোধ করিয়াছিলাম। এখন আবার নগেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য অধিকাধিক ঋণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল নিজের ব্যয়ের জন্য নয়—এমন কি, ১০০০০ দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া তিনি আর-এক জনকে আনুকূল্য করিতেন; তিনি এমনি পরদুঃখে দুঃখী ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার বদান্যতা, তাঁহার প্রিয় ব্যবহার, লোকের মনকে অতিমাত্র আকর্ষণ করিয়াছিল। এক দিন এক জন ঋণদাতা তাঁহাকে টাকার জন্য কিছু তীব্রোক্তি করিয়াছিল, ইহাতে তিনি আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। বলিলেন, 'ঋণদাতাকে আমি যে নোট লিখিয়া দিয়াছি, তাহাতে আপনি আমার সহিত স্বাক্ষর না করিলে সে আমাকে ছাড়িতেছে না।' আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, 'আমার যাহা আছে তাহা তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু নোটে কি খতে আমি সহি করিয়া দিতে পারি না। আমি একে এই উপস্থিত ঋণই পরিশোধ করিতে পারিতেছি না, আমি কোথায় আবার তোমাদের এই নূতন ঋণে আবদ্ধ হইতে যাইব? জানিয়া শুনিয়া আমি আর এই ঋণের পাপানলে ঝাঁপ দিতে পারিব না।' তিনি আমার এই কথা শুনিয়া একটা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া তিন ঘণ্টা কাঁদিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে

১১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

লাগিল, কিন্তু আমি তাঁহার নোটে সহি করিতে পারিলাম না। তাঁহাকে বলিলাম, 'আমাদের গালিমপুরের রেশমের কুঠী ইজারা দিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে, এবং আমাদের যত পুস্তক আছে তাহা বিক্রয় করিয়া যত টাকা হইবে, সব তুমি লও; আমি দিতেছি। কিন্তু পরিশোধ করিবার উপায় না জানিয়া আমি ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কর্জ্জা নোটে সহি দিতে পারিব না।' তিনি নিতান্ত দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইলেন। দাদা আমাকে সাহায্য করিলেন না বলিয়া, অভিমান পূর্ব্বক তিনি আমাদের বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন এবং আমার ছোটকাকা রমানাথ ঠাকুরের বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আমি অতঃপর তাঁহাকে আটহাজার নোটে সহি দিলাম এবং তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন যে, আমাদের যে সকল পুস্তক আছে, তাহা তিনি বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা শোধ দিবেন, ইহার জন্য আর আমাকে কোন যন্ত্রণা পাইতে হইবে না। নগেন্দ্রনাথ তথাপি আর বাড়ীতে আসিলেন না, ছোট-কাকার বাড়ীতেই থাকিলেন। এই সকল ঘটনায় আমার মন নিতান্ত ভগ্ন হইয়া গেল। মনে করিলাম, বাড়ীতে থাকিলে এইরূপ নানা উপদ্রব আমাকে ভোগ করিতে হইবে এবং ক্রমে আবার ঋণজালেও বদ্ধ হইতে হইবে, আমিও বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, আর ফিরিব না।"[১২]

কার-ঠাকুরের পতনের মূল কারণ আমি পূর্ব্বেই দেবেন্দ্রনাথের ভাষাতে বলিয়াছি—তাহা দ্বারকানাথের পুত্রগণের বৃহৎ কারবার চালাইবার অক্ষমতা। একটি বৃহৎ কারবার চালাইতে গেলে যে বুদ্ধি, যে দূরদর্শিতা এবং সর্ব্বোপরি যে সংযম আবশ্যক, সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য যে দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তিনভ্রাতার কেহই তাহা প্রাপ্ত হন নাই। পরিশ্রম করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থোপার্জ্জন পক্ষে তাঁহারা তিনজনেই অসমর্থ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই অক্ষমতার পরিচয় একে একে প্রদান করিব।

১২ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম গিরীন্দ্রনাথ সমস্ত হাউসটি নিজেদের হাতে আনিবার পরামর্শ দিয়া অত্যন্ত ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি জমিদারের উপযুক্ত হইয়াছিল কিন্তু ব্যবসায়ীর উপযুক্ত হয় নাই। বর্ত্তমান কালে কার্ণেগী প্রভৃতি বাণিজ্য সম্রাটগণ বহুচিন্তা ও গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন কর্ম্মচারীদিগকে কারবারের কিছু না কিছু অংশ প্রদান করিলে মনিব ও কর্ম্মচারীর মধ্যে দ্বন্দ্বভাব চলিয়া গিয়া কারবার নির্ব্বিবাদে চলিতে থাকে। কিন্তু গিরীন্দ্রনাথের পরামর্শ ইহার ঠিক বিপরীত—অংশীদারগণকে কর্ম্মচারীপদে নামাইয়া আনা। দেবেন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছিলেন যে ইহাতে কারবারের উন্নতিতে সাহেবদের যে একটা স্বার্থ ছিল, তাহা ঘুচিয়া যাইবে অথচ তাহারা জানিবে কারবার থাকুক বা যাউক্, তাহারা মোটা মোটা মাহিয়ানা প্রাপ্ত হইবেই। দেবেন্দ্রনাথের সহজ জ্ঞানে ব্যবসায়ের এই সরলকথা প্রতিভাত হইয়াছিল। গিরীন্দ্রনাথের জটিল বিষয়বুদ্ধিতে তাহা হয় নাই। গিরীন্দ্রনাথের ইহা একটু গুরুতর ভ্রম হইয়াছিল। আমরা কিন্তু বুঝিতেছি না যে দেবেন্দ্রনাথ কিরূপে ইহাতে সায় দিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ তাঁহার অংশ দেবেন্দ্রনাথকেই দিয়া গিয়াছিলেন এবং তিনি তাহা ভাইদের সঙ্গে সমান ভাগ করিয়া লইলেন, ইহা খুব ভাল কথা। কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল কারবারটি প্রাণপণে রক্ষা করা। এই কারবার পতন হইবার জন্য দেবেন্দ্রনাথের মতিগতি প্রধানত দায়ী। ধর্ম্ম সম্পর্কিত বিষয়ে তিনি অত্যধিক জড়াইয়া পড়ার ফলে দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই ইহার পতন হইল। দ্বারকানাথ জীবিত থাকিতে ইহার দেনা সম্বন্ধে একটি কথাও উঠে নাই। বাস্তবিক দেবেন্দ্রনাথের লেখামত যদি ধরা যায় যে কারবারের দেনা এককোটি ছিল এবং পাওনা সোত্তর-লক্ষ, অসংস্থান ত্রিশলক্ষ। একটি বিস্তৃত চলতি কারবারের পক্ষে এই অসংস্থান যে অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল তাহাতো বোধ হয় না। আরও দেখিতে হইবে যে দ্বারকানাথের মৃত্যুর পুর্ব্বেই বা কি দেনা ছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই বা কি দেনা হইল। দেবেন্দ্রনাথ

গিরীন্দ্রনাথের কথায় সায় দিয়া তাঁহার হাতে কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক চিন্তায় মনোনিবেশ করিবার প্রচুর অবসর পাইয়াছিলেন, তাহাতেই আনন্দিত। এই কারবার রক্ষা করা, পৈতৃক বিষয় প্রাণপণে রক্ষা করা যে একটা বিশেষ ধর্ম্ম তাহা তাঁহার বুদ্ধিতে তখন প্রবেশ করে নাই। অর্থের মাহাত্ম্য, অর্থের উপকারিতা তিনি তখনও সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। ঈশ্বরের কৃপাতে তাঁহার পৈতৃক বিষয় যেন রক্ষা পাইয়া গেল—তাহা না হইলে, হাউসের দেনার দায়ে বিকিয়া গেলে তাঁহার কি অবস্থা হইত? তিনি যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিলেন, তাহার কি যে অবস্থা হইত, তাহা ভাবিতে পারা যায় না। দ্বারকানাথ পরের উপকারের জন্য যে অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহারই জন্য তাঁহার নাম আজও প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছে—দেশে বিদেশে তাঁহার নামে পরিচয় দিলে আজও পরোপকার করিবার কত দ্বার স্বতঃ উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। সেই অর্থ তাঁহার পুত্রগণ বলিতে গেলে হেলায় হারাইয়াছেন। তাঁহারা এই বৃহৎ কারবার চালাইতে অক্ষম বা সক্ষম হউন, তাঁহাদের ইহা স্মরণ করা উচিত ছিল যে সাহেবরা শূন্য বকরাদার হউন না কেন, যখন দ্বারকানাথের ন্যায় বুদ্ধিমান লোক এবং তাঁহাদের পিতা সাহেবদিগকে শূন্য বকরাদার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার মৃত্যুর পর অন্তত একবৎসর পর্য্যন্ত সেই বন্দোবস্ত রক্ষা করিয়া তাহার ফলাফল পরীক্ষা করিতে পারিতেন। একবৎসরের মধ্যেই এমন প্রধান মূল বিষয়ের পরিবর্ত্তন করাতে বড়ই ত্বরা এবং সুতরাং বিবেচনাভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে।

গিরীন্দ্রনাথের বাস্তবিকই জমিদারী বুদ্ধি অতি সুন্দর ছিল। তিনি কার-ঠাকুরের পতনের পর পাওনাদারদিগকে বুঝাইয়া বিষয় সম্পত্তি নিজেদের হাতে লইয়া পরিশোধের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, ইহা অতি বুদ্ধিমানের কার্য্যই হইয়াছিল। এই কার্য্যে তাঁহার দক্ষতাও প্রকাশ পাইয়াছিল, কারণ তখন অবধি জমিদারীর উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া তাহারই আয় হইতে ঋণ পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

এই বিষয়ে তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। অংশীদারগণকে কর্ম্মচারী করিয়া লওয়া, ইহাও তাঁহার জমিদারের মত কথা হইয়াছিল। জমিদারীতে সমস্তটা নিজায়ত্ত করিয়া লইলে বোধ হয় কাজকর্ম্ম ভালরূপ চলে, কিন্তু যে সকল কাজে প্রধানত বাহিরের পাঁচজন লোকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়, সে কাজে সেই বাহিরের লোকদিগকে সেই কাজের লাভ-লোকসানের ভাগীদার না করিলে কিছুতেই সুসম্পন্ন হইবে না। গিরীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন যে লোকসানের বেলায় সাহেবেরা কিছুই দিবে না, কারণ তাহাদের এদেশে কোনই বিষয় সম্পত্তি নাই। কথা এই যে, অন্তত নামেও তো তাহারা লোকসানের দায়ী ; তাহা ছাড়া যখন লাভের ভাগী, তখন তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিবে যাহাতে লাভই হয়, লোকসান না হয়।

এইবারে পরিদর্শনের অভাব দেখাইব। বেশ কথা, যখন সমস্ত কারবারটি সম্পূর্ণ নিজেদের আয়ত্ত করা হইল, তখন অন্তত কিছুকাল তাহাতে তিন ভ্রাতারই সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া তাহাকে পুনরায় স্বাস্থ্যে প্রত্যানয়ন করাই প্রকৃত মনুষ্যোচিত, দ্বারকানাথের পুত্রোচিত কার্য্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথের উপরেই ভার দিয়া তাঁহার এ বিষয়ের কর্ত্তব্য শেষ হইল বিবেচনা করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেলেন। ওদিকে গিরীন্দ্রনাথ সাধ্যমত দেখিতে ত্রুটি করিলেন। জমিদারীতে একবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলে দূরে থাকিয়াও কার্য্য পরামর্শাদির সাহায্যে সুনির্ব্বাহ হইতে পারে. কিন্তু বাণিজ্যে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হয় কখন কিরূপ গতি লয়। বাণিজ্যের জন্য যদি আমাকে বাণিজ্যের পীঠস্থান হইতে অন্যত্র যাইতে হয়, তবে মূল স্থানে নিজেরই অনুরূপ পরিদর্শনক্ষম এবং সেই কারবারের উন্নতিতে স্বার্থ বিশিষ্ট লোককে নিযুক্ত রাখিতে হয়। বাণিজ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে ভালমন্দের সম্ভাবনা আছে, তদনুসারে উপায় সকল গ্রহণ করিতে হয়।

দেবেন্দ্রনাথ আসলে শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন ; বেশ চুপচাপ করিয়া দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিবেন, নির্ঝঞ্ঝাটে প্রয়োজন মত টাকাকড়ি জমিদারী হইতে আসুক, তাহা হইলেই দেবেন্দ্রনাথ সুখী।

ঐ যে দিবারাত্রি ধরিয়া বাণিজ্যের একটা মহা ভাবনা, ঐ যে দিবারাত্রি টাকার একটা ঝনাৎকার, এ সকল তাঁহার কিছুই পছন্দমত ছিল না। বাল্যকালে তাঁহার পিতামহীর শান্ত ধর্ম্মভাব এবং রামমোহন রায়ের শাস্ত্রালোচনার ভাব তাঁহাকে ঐরূপে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি তাঁহার পিতাকে খুব অল্পই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা যে পরোপকার ব্রত লইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে একটি দিনের জন্যও সুস্থির হইতে দেয় নাই—কিন্তু তিনি তাহা হইতেও নিজের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। গৃহস্থের উপযুক্ত ধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার বুদ্ধিকে এতদিকে বিস্তৃত করিতে হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের একটু সন্ন্যাস প্রবণতা ছিল, তিনি সংসার ছাড়িয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন পূর্ব্বক দেশেদেশে ঘুরিতে পারিলেই তাঁহার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিত না। এ অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার বিশ্বতোমুখী প্রতিভাকে যে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। পিতা পুত্রের প্রতিভার অনেকটা বিপরীতমুখী ছিল। আমরা এখন উভয়ের যথাযথ মর্য্যাদা প্রদান করিতে সক্ষম হইতেছি। তবে বোধ হয়, দেবেন্দ্রনাথ যদি নিজে কারবারের বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারিতেন, তাহা হইলে উহার পতন শীঘ্র হইত না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক

ঈশ্বরের উপর দ্বারকানাথের যে অটল নির্ভর ছিল তাহার বলে, তাহার হৃদ্গত ধর্ম্মের বলে, তাঁহার চরিত্রের বলে তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিতেন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। যে স্থলে ইউরোপীয় প্রণালীতে সুবিস্তৃত তেজারতী কারবার চলিতে থাকে, তাহাকেই ব্যাঙ্ক বলে। ব্যাঙ্ক নিরাপদ স্থান ভাবিয়া এবং নিজ গচ্ছিতের উপর সুদের আশায় সঞ্চয় গচ্ছিত রাখে। স্থায়ী গচ্ছিত—অর্থাৎ যে সকল গচ্ছিত উঠাইয়া লইবার একটি সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই সকলের উপর প্রায় সকল ব্যাঙ্কই সুদ দিয়া থাকে। চলতি গচ্ছিত—অর্থাৎ যে সকল গচ্ছিত উঠাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, সেই সকলের উপর কোন ব্যাঙ্ক বা সুদ দেয়, কোন ব্যাঙ্ক বা দেয় না। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপনার পূর্ব্বে মোট তিন চারিটি ব্যাঙ্ক কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সনন্দ লাভ করে। গবর্ণমেণ্ট তাহার কয়েকটি অংশ কিনিয়া লইয়া এই ব্যাঙ্ককে নিজেদের তত্ত্বাবধানে আনিয়া ফেলিলেন। সুতরাং এই ব্যাঙ্ক যে বহু বিপদ-আপদের মধ্যেও উন্নতি লাভ করিবে, তাহা বলা বাহুল্য। গবর্ণমেণ্ট নিজের নোট প্রচলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহারই নোট থাকার বিনিময়ে স্বীকার করিতেন। লোকেরও কাজেই ইহাকে গবর্ণমেণ্টের ব্যাঙ্ক বলিয়া একটা ধারণা জন্মিয়া গেল। এ অবস্থায় স্বভাবতই সুদ দেওয়া হউক আর নাই হউক লোকেও এখানে টাকা রাখিলে নিরাপদ হইবে ভাবিয়া নিজেদের সঞ্চয় গচ্ছিত রাখিত। ব্যাঙ্ক তন্মধ্যে স্থায়ী গচ্ছিতের উপর সুদ দিত, চলতি গচ্ছিতের উপর দিত না।

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ছাড়া আর যে কয়টি বড় ব্যাঙ্ক ছিল, সেগুলিকে কারবারী ব্যাঙ্ক বলা যাইতে পারে। বড় বড় সওদাগরদের কারবারের সঙ্গে এক একটি ব্যাঙ্ক খোলা হইয়াছিল। পামার কোম্পানীর কলিকাতা ব্যাঙ্ক; ম্যাকিণ্টস্ কোম্পানীর কমার্স্যাল ব্যাঙ্ক এবং আলেকজাণ্ডার কোম্পানীর হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কার্য্য সাধারণের অর্থ আকর্ষণ করিয়া একত্র সঞ্চয় করা। এখন গবর্ণমেণ্টের ব্যাঙ্ক থাকিতে লোকে সহজে অন্য ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবে কেন? এই কারণে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্যান্য ব্যাঙ্ক অব্যতিরেকে চলতি গচ্ছিতের উপর সুদ দিয়া এবং স্থায়ী গচ্ছিতের উপর বেঙ্গল ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অনেক অধিক সুদ দিয়া লোকদিগকে প্রলোভন দেখায়। ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবার আর একটি ফল এই যে, অবস্থা বিশেষে ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়। এইরূপ নানা কারণে সেকালের লোকেরা বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ব্যতীত উপরোক্ত তিনটি কারবারী ব্যাঙ্কেও অনেক টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিল। এই স্থলে ব্যাঙ্কের আর একটি কাজের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক—তাহা বিভিন্ন প্রকার কাগজের কাজ, যথা 'অন ডিমাণ্ড' নোট, 'প্রমিসারি' নোট, হুণ্ডি প্রভৃতি। দশ টাকা, কুড়ি টাকা প্রভৃতির যে সকল নোট বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, তদনুরূপ নোটকে 'অন্ ডিমাণ্ড' নোট বলে অর্থাৎ যে সকল নোটের বিনিময়ে চাহিবামাত্রই টাকা দিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে 'কোম্পানীর কাগজ' চলিত আছে, তদনুরূপ দলিলকেই 'প্রমিসারি' নোট বলে, যে কাগজের বিনিময়ে অঙ্গীকৃত সময় ফুরাইয়া গেলে টাকা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। হুণ্ডির কথা ভারতের ব্যবসায়ী মাত্রেই জানেন বোধ হয়—সুদূরবর্ত্তী দেশে নগদ টাকা পাঠাইলে পাছে মারা যায়, এই কারণে একদেশের ব্যবসায়ী অপর দেশের ব্যবসায়ীকে যে টাকা দিবার আদেশ করিয়া উত্তমর্ণের হাতে কাগজ দিয়া থাকে তাহাকেই হুণ্ডী বলে। এই সকল কাগজের বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যাইবে যে যতদিন না নোটধারী লোকে টাকা চাহিতে আসে অথবা তাহার টাকা চাহিবার সময় আসে, অন্তত ততদিন সেই নোটের

লিখিত নগদ টাকা যে ব্যাঙ্ক নোট বাহির করে, তাহার হাতে সঞ্চিত থাকে। ইচ্ছা করিলে সেই ব্যাঙ্ক তাহা খাটাইয়া লাভ করিতে পারে, তবে উপযুক্ত সময়ে টাকা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, তাহাতে অক্ষম হইলেই ব্যাঙ্কের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপে কত টাকা যে ব্যাঙ্কের হাতে সঞ্চিত হইতে পারে, তাহা উপরোক্ত তিনটি ব্যাঙ্কের প্রচলিত 'অন ডিমাণ্ড' নোটের সংখ্যা দেখিলেই কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের এক সময়ে প্রায় ২৫ লক্ষ নোট বাহির হইয়াছিল, কমার্স্যাল ব্যাঙ্কেরও প্রায় গড়ে বাৎসরিক ১৬ লক্ষ নোট এবং কলিকাতা ব্যাঙ্কের গড়ে ৩০ লক্ষ নোট বাহির হইত।

এই সকল ব্যাঙ্কওয়ালাদিগের কুঠীর কারবারও অত্যন্ত বৃহৎ ও বিস্তৃত ছিল। ইহাদিগের চলিত নামকরণ হইয়াছিল বণিক রাজ। একবার ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের কতকগুলি নোট জাল হওয়াতে দুষ্ট লোকে রটাইয়াছিল যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত নোট ব্যাঙ্কে দাখিল না করিলে তৎবিনিময়ে আর নগদ টাকা পাওয়া যাইবে না। যাহাদের হাতে এই ব্যাঙ্কের নোট ছিল, সকলেই নোট ভাঙ্গাইতে আনিল। সেবারে ইহার অধিকারী আলেকজাণ্ডার কোম্পানীকে সেই কয়েক দিবসের মধ্যে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা যোগাইয়া ব্যাঙ্কের রক্ষা সাধন করিতে হইয়াছিল। আর একবার ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যখন পামার কোম্পানীর পতন হইল, সেবারে ব্যবসায়ী মহলে এরূপ একটা ভীতি সঞ্চার হইল যে, যে ব্যাঙ্কের যে নোট যাহার কাছে ছিল, সকলেই আপনার আপন ব্যাঙ্কওয়ালার নিকট নোট ভাঙ্গাইতে গেল। এবার হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ককে কুড়িটি লক্ষ টাকা বাহির করিয়া ধাক্কা সামলাইতে হইয়াছিল। পামার কোম্পানীর কারবারও এরূপ বৃহৎ ছিল যে গল্প আছে যে, শ্রীরামপুরের গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী এই কুঠীর কেবল একটি বিভাগের মুৎসুদ্দি ছিলেন। তাঁহার পারিশ্রমিক স্বরূপে তিনি প্রতিদিন প্রাতে আসিয়াই নগদ পাঁচ শত টাকা লইতেন এবং ইহার উপর যাহা কিছু প্রাপ্য থাকিত, তাহা বৎসরের শেষে চুকাইয়া লইতেন। এই সকল বৃহৎ কারবার এবং তৎসঙ্গে তৎসম্পৃক্ত ব্যাঙ্ক

সকলের যখন সহসা পতন হইল, তখন জনসাধারণের মধ্যে কি যে হাহাকার পড়িয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। কত ইংরাজ মহিলা, কত গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী যে এই সকলের পতনে নিঃস্ব ও পথের ভিখারী হইয়া গিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের পরিবারেরই অধিকাংশ এই সকল ব্যাঙ্কে নিজেদের চিরজীবনের সঞ্চয় গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন।

হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হওয়া অবধি বোধ হয় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আলেকজাণ্ডার কোম্পানীর কারবার হইতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু সেইবারের কুড়ি লক্ষের ধাক্কা সামলাইতে গিয়া আর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিল না। সেই অবধি আলেকজাণ্ডার কোম্পানীর কারবার ও ব্যাঙ্ক উভয়েরই পতনের সূত্রপাত ঘটিল। যেমন ব্যাঙ্ককে সামলাইতে গিয়া কারবার হইতে অর্থ সাহায্য করিতে হইয়াছিল, সেইরূপ পরে কারবারকে সামলাইতে গিয়া ব্যাঙ্কের নিজস্ব এবং অপরের গচ্ছিত ও নোটের বিনিময়ার্থ রক্ষিত অর্থ সমুদায়ই বাহির করিতে হইয়াছিল। কমার্স্যাল ব্যাঙ্ক প্রথমে যদিও কতকটা যৌথ কারবারের হিসাবে খোলা হইয়াছিল, কিন্তু পরিণামে ইহা ম্যাকিণ্টস কোম্পানীরই ব্যাঙ্ক হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য বেশই চলিয়াছিল। এই শেষোক্ত বৎসরে এই ব্যাঙ্কের এক প্রধান অংশীদার তদানীন্তন অন্যতম বৃহৎ কুঠীওয়ালা জোসেফ ব্যাবেটো কোম্পানীর পতনে এবং অন্যান্য নানা কারণে ইহার কার্য্য সংক্ষিপ্ত করিয়া চালিত হইতে হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক তদানীন্তন "বাণিজ্য সঙ্কট" সামলাইতে না পারিয়া ডুবিয়া গেল এবং পরবৎসরে কমার্স্যাল ব্যাঙ্ক ডুবিয়া গেল। শেষোক্ত ব্যাঙ্ক খুলিবার কালে আমরা দেখি সেকালের কয়েকটি কুঠীওয়ালা এবং গোপীমোহন ঠাকুর ও আর একটি ইংরাজ অংশীদার ছিলেন। কিন্তু সম্ভবত শেষাশেষি গোপামোহন নিজের অংশ ইহা হইতে উঠাইয়া লইয়াছিলেন এবং কুঠীওয়ালাগণ তো

ডুবিয়াই গিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ইহার উন্নতি-সময়ে ইহার অনেক অংশ ক্রয় করিয়া একজন প্রধান অংশীদার হইয়াছিলেন। তাই এই ব্যাঙ্কের পতন কালে দ্বারকানাথ একমাত্র ইহার সঙ্গতিপন্ন অংশীদার ছিলেন বলিয়া ইহার ঋণ পরিশোধের ভার তাঁহারই উপর পড়িয়াছিল এবং তিনি তাহা পরিশোধ করিয়াওছিলেন। ইহা যৌথ কারবারের নিয়মে স্থাপিত হয় নাই বলিয়া ইহার ঋণের জন্য সকল অংশীদার সমষ্টিগতভাবে এবং প্রত্যেক অংশীদার ব্যষ্টিভাবে আইনানুসারে দায়ী ছিলেন। কলিকাতা ব্যাঙ্ক ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়া পামার কোম্পানীর কারবারের পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বন্ধ হইয়া গেল। এই কয়েকটি ব্যাঙ্কেরই পতনের কারণ একই প্রকার—অতি অল্পসংখ্যক ব্যবসায়ী লোকেরাই ইহাদের অংশীদার ছিলেন; তাঁহারা নিজেদের প্রয়োজন মত ঋণ স্বরূপে অনেক নগদ টাকা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন; এবং প্রধান অংশীদার দিগের কারবারের সহিত ব্যাঙ্কগুলি বলিতে গেলে একেবারে অভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। পরস্পরকে সামলাইতে গিয়া উভয়েরই ডুবিয়া যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এইরূপ অশুভ ব্যবস্থার ফলে ছয়টি বণিকরাজের কুঠি ১৫ কোটি ঋণ রাখিয়া ডুবিয়াছিল, তন্মধ্যে পামার কোম্পানীর তিনকোটি, আলেকজাণ্ডার কোম্পানীর সাড়ে চার কোটি, ম্যাকিণ্টস কোম্পানীর আড়াই কোটি এবং ফর্গুসন কোম্পানীর সাড়ে তিন কোটিরও অধিক ঋণ দাঁড়াইয়াছিল।

এই সকল সুবিস্তৃত কারবারের সূচনার বিষয় এই স্থলে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ নবীকৃত হয়। সেই সময়ে একটি সর্ত্ত ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট করান হয় যে নির্দ্দিষ্ট পরিমানে ভারতের বাণিজ্য ইংরাজ রাজের সকল প্রজার উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। ইহার পুর্ব্বে ভারতের বাণিজ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্পূর্ণ একচেটিয়া ছিল। ঘোর বর্ষার ঘন বারিধারার পর রৌদ্র ও বাতাস পাইলে প্রকৃতিতে যেমন চেতনা সঞ্চার হয়, প্রকৃতির বদনে যেমন হাসি আর ধরে না, সেইরূপ একচেটিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত

হইয়া বাণিজ্য সহাস্যমুখে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আত্মসম্প্রসারণ করিতে গিয়াছিল। কুঠীওয়ালা সাহেবেরা এক একটি ধনী মুৎসুদ্দির অর্থ সাহায্যে বাণিজ্যের জুয়া খেলা আরম্ভ করিলেন। যে কোন দ্রব্যে এতটুকুও লাভের সম্ভাবনা ছিল, সেই সকল দ্রব্য নগদ ও ধারে যতদূর সম্ভব কেনা হইতে লাগিল। অগত্যা গচ্ছিত ধনের মর্য্যাদা রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। যখন ধার আর চলে না, তখন কাজেই কারবার সকল 'অভ্যুত্থানং হি পতনায়' কথার সার্থকতা সম্পাদন করিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। কুঠীওয়ালাদিগের হঠাৎ বড় মানুষ হইবার ইচ্ছা হইয়াছিল এবং তাহাতে অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। পতনকালেও কিন্তু তাঁহাদের তেমনি পতন হইয়াছিল। শোনা যায় যে পামার কোম্পানীর প্রধান অংশীদার জন পামার কারবারের পতন কালে একটি ছাতা বগলে লইয়া বাহির হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট তারিখে ১৬ লক্ষ টাকা লইয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কার্য্যারম্ভ হয়। স্মরণ থাকে যেন দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সময়ে নিমকি বিভাগে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। লর্ড ক্লাইভ ও লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর নিজে ব্যবসায় অবলম্বন করা অননুমোদিত ছিল। কিন্তু কোন কর্ম্মচারীর কোন যৌথ কারবারের অংশীদার এবং পরিচালক হওয়া সম্বন্ধে কোনই বাধা ছিল না। তাই দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ না করিয়া কার-ঠাকুর কোম্পানী খুলিয়া নিজের নামে বাণিজ্য করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মকালেই ম্যাকিণ্টস কোম্পানীর কমার্স্যাল ব্যাঙ্কের অংশীদার অথবা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অংশীদার ও পরিচালক হইবার পক্ষে কোনই বাধা হয় নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি যে তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যে টাকা বিদেশীয়গণ লুটিয়া লইতেছে, তাহার যতটুকু পারা যায় স্বদেশে রক্ষার চেষ্টা করা উচিত এবং তিনি বুঝিতেন যে বাণিজ্য বিনা দেশের মঙ্গল নাই, এই কারণে কারবারের মধ্যে

নিজে থাকিয়া সাধ্যমত স্ব-দেশীয়গণকে সেই কারবারে প্রবিষ্ট করাইয়া হাতে কলমে কারবার শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাঁহার হৃদয়ের স্বাধীনতা এবং পরোপকারের প্রবল ইচ্ছাই তাঁহাকে বাণিজ্যের পথে লইয়া গিয়াছিল। তিনি স্বাধীনতার তাড়নাতেই কার-ঠাকুর কোম্পানীর কারবার খুলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিজে বাণিজ্য ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিবার বহুপূর্ব্বেই তত্ত্বদর্শী দ্বারকানাথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে একটি ব্যাঙ্কের সাহায্য না পাইলে, নগদ টাকার সাহায্য না পাইলে সুবিস্তৃত কারবারে হস্তক্ষেপ মূঢ়তা। তাই তিনি প্রথমে কমার্স্যাল ব্যাঙ্কের অংশীদার হইলেন। তাহাতেও বেশী সুবিধা বোধ হইল না, কারণ ম্যাকিণ্টস কোম্পানীর কারবারের সহিত এই ব্যাঙ্কের বড় অতিরিক্ত মাত্রায় যোগ। বিশেষত তিনি নিদ্রিত থাকিবার লোক ছিলেন না। সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকিয়া বাণিজ্যের উত্থান ও পতনের তত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচনা করিতেন। তিনি হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক, কমার্স্যাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতির এবং তৎসম্পৃক্ত কারবারের উত্থান ও পতন আলোচনা করিয়া বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, অল্পসংখ্যক লোকের হাতে কোন ব্যাঙ্কের অংশ থাকিলে পতন কালে ঋণ-বোঝা বহন করিতে গিয়া সেই অল্পসংখ্যক লোকের স্কন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। ব্যাঙ্কের যত অধিক অংশীদার হইবে, তত ইহার কার্য্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইবার সম্ভাবনা, তত ইহার কার্য্য সুবিস্তৃত হওয়া সম্ভব এবং ইহার উন্নতি ও মঙ্গল কামনায় তত অধিক লোক সর্ব্বদাই নিরত থাকে। দ্বিতীয়ত যতই অধিক লোক অংশীদার হইবে, ততই ব্যাঙ্ক কোন একটি কারবারের সহিত মিশিয়া যাইতে পারিবে না এবং সুতরাং সকল কারবারেরই সহিত তাহার পার্থক্য রাখা তত বেশী সম্ভবপর হইবে এবং ব্যাঙ্ককে সকল কারবারের সহিত অপক্ষপাতে ব্যবহার করিতে হইবে। এই সকল কারণে, দ্বারকানাথের ইচ্ছা হইয়াছিল যে এমন একটি নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হউক, যাহাতে পূর্ব্বতন ব্যাঙ্ক সমূহের পতন কারণ বিদ্যমান না থাকে এবং যাহার পরিচালনায় তাঁহার নিজের ততটা অধিকার থাকে যে, তিনি উপযুক্ত বাঙ্গালীকে

তাহার উপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করাইতে পারেন, এক কথায় নিজের কারবারের মত চালাইতে পারেন।

দ্বারকানাথ দেখিলেন যে হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক তাঁহার সাক্ষাতেই ডুবিয়া গেল। তিনি কমার্স্যাল ব্যাঙ্কের একজন প্রধান অংশীদার থাকিয়া নিশ্চয়ই বুঝিয়াছিলেন যে ইহা আর বড় অধিককাল টিঁকিতে পারিবে না। তিনি এরূপ সন্ধানী পুরুষ ছিলেন তাঁহার পক্ষে এটুকু অনুসন্ধান লইতে বোধ হয় বেশী কষ্ট হয় নাই যে, পামার কোম্পানীরও পতন অনতিদূরবর্ত্তী। তিনি অবসর বুঝিয়া পামার কোম্পানীর এবং কমার্স্যাল ব্যাঙ্কের অপরাপর সত্ত্বাধিকারীর নিকট যৌথ কারবারের প্রণালীতে এক ব্যাঙ্ক খুলিবার প্রস্তাব করিলেন। এই ব্যাঙ্কের বিশেষত্ব দুইটি—প্রথম ইহার যৌথ ভিত্তি এবং দ্বিতীয় এই যে কোন একটি কারবারের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন না করিয়া সকল সম্প্রদায়ের সওদাগরদিগের উপযুক্ত জামিনে সাহায্য করা। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক তাহার সনন্দের সর্ত্ত অনুসারে এরূপ সাহায্য করিতে অক্ষম ছিল, নূতন ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক সেই অভাব দূর করিবার বন্দোবস্ত হইল।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ইহার প্রধান উদ্যোগী ও প্রস্তাবক হইলেও আরও কয়েক ব্যক্তি প্রথমাবধি তাঁহার সহিত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক যোগদান করিয়াছিলেন—(১) জর্জ্জ জেম্‌স্ গর্ডন, (২) জন পামার এবং (৩) কর্ণেল জেম্‌স্ ইয়ঙ্গ। ইঁহারা প্রস্তাব করিবামাত্র কলিকাতা ব্যাঙ্ক এবং কমার্স্যাল ব্যাঙ্ক প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া নিজেদের প্রচলিত নোট সংখ্যা কমাইয়া আনিলেন এবং নূতন ব্যাঙ্কের জন্য সুযোগ করিয়া দিলেন। প্রথমে ইহার নাম কমার্স্যাল ব্যাঙ্ক রাখিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু জন সাধারণের এই নামের উপর এমন একটি কুসংস্কার দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে সে নামের পরিবর্ত্তে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক রাখা হইল। প্রথম স্থির হইয়াছিল যে আড়াই হাজার সিক্কা টাকার প্রতি অংশের এক হাজার অংশে এই যৌথ ভিত্তি ব্যাঙ্ক খোলা হইবে, কিন্তু ছয় বৎসর অপেক্ষা করিয়াও ছয়শত অংশের অধিক বিক্রয় হইল না। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে

১৫ লক্ষ সিক্কা টাকা বা ১৬ লক্ষ কোম্পানীর টাকা লইয়া ব্যাঙ্ক খোলা হইয়া কার্য্যারম্ভের পর প্রধানত দ্বারকানাথের বিশেষ যত্নে ইহা এত শীঘ্র উন্নতিলাভ করিতে লাগিল যে বৎসর বৎসর ইহার অংশ বাড়াইয়া মূলধন বাড়াইতে হইল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে কুড়ি হাজার টাকার মূলধন বাড়াইতে হইল এবং মে মাসে ৯০০ টাকার প্রত্যেক অংশের অতিরিক্ত ৬০০ অংশ বাহির করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ মূলধন দাঁড়াইল ২১,৬০,০০০ টাকা। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক অংশের মূল্য আড়াই হাজার হইতে হাজার টাকায় কমাইয়া দেওয়াতে মূলধন ৩২ লক্ষে উঠিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে আরও আটশত অংশ বাহির হইয়া মূলধন ৪০ লক্ষ দাঁড়াইল এবং পরবর্ত্তী মে মাসে আরও চারি হাজার অংশ বাহির হইয়া মূলধন উঠিল আশি লক্ষে। অবশেষে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আরও দুই হাজার অংশ বাহির হইয়া মূলধন দাঁড়াইল এক কোটি টাকা। এই পর্য্যন্ত আমরা ইহার উপর দ্বারকানাথের স্নেহ হস্ত দেখিতে পাই। এই সময়ে দশহাজার অংশের মধ্যে মোটে সাতশত অংশ ভারতবর্ষীয়গণ লইয়াছেন এবং অবশিষ্ট সমুদয় অংশ ইউরোপীয়গণের হাতে ছিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে এই সময় অবধি ব্যাঙ্কের পরিচালনায় ইংরাজ মন্ত্রণাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল এবং আমরা এই ব্যাঙ্কের ইতিবৃত্তেও এই সময় অবধি পতনের কারণোৎপত্তি দেখিতে পাই। তথাপি যতদিন দ্বারকানাথ জীবিত ছিলেন, ততদিন শত সহস্র বিপদ আপদের মধ্যেও তিনি ইহাকে মাতার ন্যায় সযত্নে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।

এই ব্যাঙ্ক সনন্দের জন্য প্রার্থনা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ত্রয়োবিংশ আইনের দ্বারা এই অধিকার জন্মিয়াছিল যে লোকে ইহার বিরুদ্ধে এবং ইহা লোকের বিরুদ্ধে সেক্রেটারীর নামে নালিস প্রভৃতি রুজু করিয়া টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। ইহার অংশীদারদিগের একরারনামা অনুসারে নগদ প্রাপ্ত মূলধনের সিকি অংশের নোট প্রচারের অধিকার থাকিলেও

ইহার নোট কখনও সাতলক্ষের উপর উঠে নাই। গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এই নোট স্বীকৃত না হওয়াতে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানেই ইহার প্রচলন সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম প্রথম বেঙ্গল ব্যাঙ্ক 'ডিসকাউণ্টে' অর্থাৎ কমিশন স্বরূপে কিছু বাদ দিয়া এই নোট গ্রহণ করিত, কিন্তু ক্রমে লইতে অস্বীকার করিল। তখন অনেক চেষ্টাতেও আর নোটের বেশী প্রচলন হইল না। এই নোট চলিলে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের নোটের চলতি কম হইবে বলিয়াই বেঙ্গল ব্যাঙ্ক অস্বীকার করিয়াছিল।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এক্সচেঞ্জ হলে যে সভা হয়, তাহাতে প্রস্তাবকগণকে লইয়া প্রথম পরিচালক সভা গঠিত হয় এবং সেই সভায় উইলিয়মকার সেক্রেটারী (বা সম্পাদক) পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পরিচালক সভার সভ্যগণের প্রথমেই দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম দেখিতে পাই। এই বৎসরে পরিচালক সভায় ইঁহাকে ছাঁড়িয়া আরও তিনজন বাঙ্গালী দেখিতে পাই—প্রমথনাথ দে (লাটু বাবু), প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের পরিচালক সভায় তদানীন্তন বৃহৎ কুঠীর অধ্যক্ষ এক এক জন ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহাতে বোধ হয় কার-ঠাকুরের প্রতিনিধি স্বরূপে তিনিই পরিচালক সভায় বসিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসেও তাঁহাকে পরিচালক সভার সভ্যরূপে অধিষ্ঠিত দেখি। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ব্যাঙ্কের যখন পতন হয়, তখন অংশীদারগণের কাহাকে কত ঋণ পরিশোধার্থে দিতে হইবে তাহার এক তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল; সেই তালিকায় দ্বারকানাথ ঠাকুর অথবা তাঁহার কোন উত্তরাধিকারীর নাম ছিল না। ইহাতেই বোধ হয় যে তাঁহার দ্বিতীয়বার বিলাত গমনের পূর্ব্বেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে তাঁহার যাহা কিছু অংশ ছিল, সমুদয় বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া উহার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।[১]

১ এই তালিকায় ঠাকুরগোষ্ঠীর কয়েকটি নাম আছে—১) প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ২) মথুরানাথ ঠাকুর, ৩) রমানাথ ঠাকুর

ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ম্মচারী তিনটি—সেক্রেটারী বা সম্পাদক, ট্রেজারার বা ধনরক্ষক (খাজাঞ্চী) এবং একাউন্টেণ্ট বা হিসাবরক্ষক। ব্যাঙ্কের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত ধনরক্ষক বা খাজাঞ্চী ছিলেন দ্বারকানাথের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুর এবং অনেককাল যাবৎ তাঁহার সহকারী ছিলেন দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রমানাথ ঠাকুরের কার্য্যকুশলতা এবং সাধুতা সম্বন্ধে পরিচালক এবং সম্পাদকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। হিসাব পরীক্ষক-গণের মধ্যে আমরা এ. এইচ্ সিম্, ডাক্রুজ এবং উইলিয়ম বোনো-র নাম দেখিতে পাই। ডাক্রুজ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া একটি ভয়ানক জুয়াচুরী ধরিয়া দিয়া ব্যাঙ্কের মহদুপকার সাধন করিয়াছিলেন। এই জুয়াচুরীর প্রধান নায়ক ভূতপূর্ব্ব হিসাব পরীক্ষক সিম সাহেব। কর্ম্মচারীগণের মধ্যে সেক্রেটারীই সর্ব্বপ্রধান। পরিচালকগণ অবসর অনুসারে সপ্তাহে দু-একবার সভায় সম্মিলিত হইয়া মোটামুটি আয়ব্যয় দেখেন এবং কিরূপে চালাইলে লাভ হইতে পারে তাহারই পরামর্শ করিয়া যাহাতে চুরি ও জুয়াচুরী প্রভৃতি না হইতে পারে তদ্বিষয়ে সেক্রেটারীর নিকট নিয়মসকল প্রস্তাব করেন। সেক্রেটারীকে সেই সকল নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিতে হয়। অনেক সময়ে সেক্রেটারীর পরামর্শে পরিচালকগণ চালিত হয়েন। এই কারণে সেক্রেটারী যদি কার্য্যদক্ষ ও বিশ্বাসী হয়েন তাহা হইলে ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বৃহৎ কারবার সমূহের স্থায়িত্ব আশা করা যায়।

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন উইলিয়ম কার। পরে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইনি দ্বারকানাথের সহযোগে কার-ঠাকুর কোম্পানীর কারবার খুলেন। তাঁহার বিষয়ে যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত কার্য্যদক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বলিয়া বোধ হয়। লর্ড বেন্টিঙ্ক ও দ্বারকানাথের নিকটে ইঁহাকেই কারবারের অংশীদার হইবার উপযুক্ত লোক বলিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট পর্য্যন্ত

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রেটারী ছিলেন। আমরা পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি যে এই বৎসরে মূলধন এককোটী টাকায় দাঁড়াইয়াছিল এবং ইহার পরিচালনে ইংরাজমন্ত্রণার প্রাধান্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। এই বৎসরে ম্যাকিণ্টস কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব অংশীদার জর্জ জেমস গর্ডন সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। ইনি এই ব্যাঙ্ক স্থাপনের একজন প্রস্তাবক এবং সর্ব্বপ্রথম পরিচালকগণের অন্যতম ছিলেন। ইনিই প্রথম নীল, রেশম এবং অন্যান্য কৃষি দ্রব্যের উপর দাদন দিবার অনিষ্টকর প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ব্যাঙ্কের নিয়মিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া ইনিই প্রথম ব্যবসায়ীর নিজের ব্যক্তিগত জামিনে টাকা ধার দিবার প্রথাও প্রবর্ত্তিত করেন। ইহারই পরিণামে ব্যাঙ্কের পতন ঘটিয়াছিল। নানা গোলযোগের কারণে গর্ডন ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে এক প্রকার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। ইনিই বিলাতের সহিত 'বিল অফ এক্সচেঞ্জ' এর কর্ম্ম প্রথম খুলেন। ইহাতে ব্যাঙ্কের অত্যন্ত অনিষ্ট হইয়াছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মির্জাপুর নগরে একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রায় এক বৎসরের মধ্যেই তাহা লাভজনক না হওয়াতে উঠাইয়া দিতে হইয়াছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অক্টোবরে সিঙ্গাপুরে আর একটি শাখা খোলা হইয়াছিল—ইহার প্রধান কার্য্য ছিল 'বিল অফ এক্সচেঞ্জ' কেনাবেচা। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের জুনমাসের শেষে এই শাখার কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। গর্ডনের সম্পাদকত্বকালের কার্য্যাবলী আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে তিনি 'বিল অফ এক্সচেঞ্জ'-এর কার্য্য কিছু ভাল করিয়া বুঝিতেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তিনি নিতান্ত অক্ষম এবং বিশ্বাসের অযোগ্য সম্পাদক ছিলেন। দাদন প্রভৃতি প্রথা এবং অধমর্ণের নিজের জামিনে ধার দিবার প্রথা প্রভৃতি অনিষ্টকর নিয়ম সকল প্রবর্ত্তনের কারণে এবং তাঁহার সহিত দু-একজন অংশীদারের যে পত্র ব্যবহার চলিয়াছিল, তাহাতে অনুমান হয় যে তিনি স্বার্থের জন্য ব্যাঙ্কের অনিষ্টসাধনেও কুণ্ঠিত হন নাই। গর্ডনের পদত্যাগের পর জেমস কলডার ষ্টুয়ার্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েন। ইনি ম্যাকিণ্টস

কোম্পানীর কমার্শ্যাল ব্যাঙ্কের অংশীদার ছিলেন। ম্যাকিণ্টস কোম্পানীর পতনের পর তিনি বিলাত চলিয়া যান ; পরে দ্বারকানাথ তাঁহাকে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহিত লিপ্ত রাখিবার জন্য বিলাত হইতে আনয়ন করেন। দুই বৎসরের উপর ইনি কার্য্য করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে বিশেষ কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। ইনিও 'বিল অফ এক্সচেঞ্জ'-এর কার্য্যে পারদর্শী ছিলেন বোধ হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কিন্তু 'বিল অফ এক্সচেঞ্জ' কয়েকটি লইয়া ইঁহার সহিত পরিচালকদিগের কিছু গোলযোগ উপস্থিত হয়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী অবধি এইচ, ডব্লিউ, অ্যাবট সেক্রেটারী হয়েন—এই বৎসর ২৪শে ডিসেম্বর ব্যাঙ্ক গর্ডন-প্রবর্ত্তিত প্রথায় পরিণামে টাকা দেওয়া বন্ধ করিতে বাধ্য হইল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী অবধি 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ইনলিকুইডেশন' নামে কার্য্য চলিতে লাগিল। এই বৎসরে ২৫শে জানুয়ারী অ্যাবট পদত্যাগ করিলে পর লেসলী রাসেল তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হয়েন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে মাতা যেমন নিজ সন্তানকে সযত্নে লালন-পালন করেন, সেইরূপ দ্বারকানাথও এই ব্যাঙ্ককে কায়মনোবাক্যে পরিপোষণ করিতেন। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব একাউণ্টেণ্ট হেনরি হেণ্ডার্সন কর্তৃপক্ষের জামানত কোম্পানীর কাগজ, ব্যাঙ্কের অংশ এবং 'বিল অফ এক্সচেঞ্জ'-এর দালালী করিতেন। সেই নজীর অনুসারে রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সম্পাদকত্বকালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কেরও একাউণ্টেণ্ট সিম সাহেবকে ঐরূপ দালালী করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। সিম ক্রমে নানা প্রকার বাণিজ্যের জুয়াখেলা আরম্ভ করিয়া দিল, তখন তাহার টাকার অনটন হওয়াতে জুয়াচুরী করিয়া তহবিল তছরূপ করিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ধরা পড়িল যে সিম ব্যাঙ্কের গচ্ছিতকারীদিগের নামে অন্যায় পূর্ব্বক অনেক টাকা অতিরিক্ত লওয়া হইয়াছে লিখিয়া রাখিয়াছেন। সিম অন্যায় স্বীকার করিয়া প্রায় চৌষট্টি হাজার টাকার গোলযোগ খাতায় পরিষ্কার করিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশ পাইল যে অনেক

গচ্ছিতকারীদিগের নামে যে টাকা জমা হইবার জন্য ব্যাঙ্কে আনীত হইয়াছিল, সিম তাহা আত্মসাৎ করাতেই পুর্ব্বোক্ত অতিরিক্ত টাকা লওয়ার কথা লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সিমের কঠিন পীড়া হওয়াতে তাহার অধীনস্থ খতিয়ান লেখককে সিমের নিজের হিসাব সম্বন্ধে জেরা করা হইল। সে দুই দিন ধরিয়া হিসাব পরিষ্কার করিয়া স্বীকার করিল যে সিম সাহেবের ব্যাঙ্কের নিকট দেনা প্রায় বার তের হাজার টাকা হইবে। এখন খাজাঞ্চীর অধীনস্থ বাঙ্গালা খতিয়ান লেখকের লিখিত মজুত বাকীর সহিত উক্ত টাকা মিল হইয়া গেল। এদিকে সিমের পরবর্ত্তী হিসাব রক্ষক ডাক্রুজকে অপর একজন কেরাণী গুপ্ত সন্ধান দিল যে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় খতিয়ান লেখক যোগ সাজোসে হিসাব এইরূপ মিলাইয়া রাখিয়াছে। তখন ডাক্রুজ ইংরাজী খতিয়ান লেখককে স্পষ্টই বলিলেন যে, বার হাজারের পরিবর্ত্তে মজুত বাকী একলক্ষ কুড়ি হাজার হইবে। সেই লেখক তখন তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া একটা কাগজে আট দফায় হিসাবে জুয়াচুরী করিবার কথা লিখিয়া দিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ১২ই অক্টোবরে প্রথম জুয়াচুরী হয়। একটা খরচে ৫৯২ টাকার পুর্ব্বে ১০ বসাইয়া তাহাকে ১০৫৯২ করা হইয়াছে। এইরূপে খরচের কোন সংখ্যা বদলাইয়া এবং কাহারও বা পূর্ব্বে নূতন সংখ্যা বসাইয়া যে অতিরিক্ত টাকা খরচ বলিয়া লেখা হইল, সেগুলি সিম সাহেব সমস্তই আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ক্যাস বহি হইতে প্রতিদিন বাঙ্গালা খতিয়ানে জমাগুলি উঠান হইলে একাউন্টেন্টের বহিতে পরিষ্কার করিয়া লেখা হয় এবং তাহার পরে ইংরাজী খতিয়ানে উঠাইবার জন্য তাহার লেখককে হিসাবগুলি দেওয়া হয়। পাছে ধরা পড়ে, এই কারণে এই ইংরাজী খতিয়ানকারী ক্যাশ বহিতেও অঙ্ক বদলাইতে কুণ্ঠিত হইত না। এদিকে প্রতি পৃষ্ঠার নীচে লিখিত মজুত বাকী ঠিক রাখিয়া যাইত। যাণ্মাসিক হিসাব ঠিক করিবার সময় একাউন্টেন্ট এই মজুত বাকীতে যেন ভ্রম আছে বলিয়া কতকগুলি বাজে জমা খরচ করিয়া হিসাবে মিলাইয়া রাখিত। ক্যাশ বহিতে অঙ্ক বদলাই

করাতে তাহারই লেখকের স্কন্ধে দোষ আসিতে পারিত, কিন্তু তুইটি ছাড় হইয়া যাওয়াতেই খতিয়ান লেখকই দোষী প্রমাণিত হইল। একটিতে এক পৃষ্ঠার নীচে ১৯৪৬৯ টাকা লিখিত থাকিলেও পর পৃষ্ঠার আরম্ভে তাহাকে ৪৯৪৬৯ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে ক্যাশ বহির অঙ্ক বদলাইতে ভুলিয়া গিয়াও খতিয়ানে বদলান হইয়াছে। ধরা পড়িবার ভয়ে সিম খতিয়ানে নিজের নামীয় খতিয়ান খোলায় নাই। যদি ডাক্রুজ গুপ্ত সন্ধান না পাইতেন, তাহা হইলে এই জুয়াচুরী যেরূপ চতুরতার সহিত নিষ্পন্ন হইয়াছিল তাহাতে ধরা পড়া অসম্ভব ছিল। যাহাই হউক ডিরেক্টরদিগের কানে এই ঘটনা পৌঁছিবামাত্র তাঁহারা স্থির করিলেন যে ব্যাঙ্কের কোন বেতনভুক্ কর্ম্মচারী কোন প্রকার বাণিজ্য বা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না এবং ব্যাঙ্কে কোন কর্ম্মচারীর নামে বেতন ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে টাকা আদান প্রদানের হিসাব থাকিবে না। এইসময় অবধি একজন করিয়া সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন, টাকা কড়ির জমা খরচের উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন। কেরাণীর সংখ্যাও বর্দ্ধিত করা হইল। এখন ঐ যে ১,২০,০০০ টাকা তছরূপ হইল, পাছে ইহা লইয়া গোলযোগ করিলে ব্যাঙ্কের তুর্ণাম ঘটে, এই কারণে দ্বারকানাথ সমস্ত টাকাটা নিজে জমা দিলেন। অবশ্য অপরাধীগণ কর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত হইলেন। এই চুরির ইতিবৃত্ত সবিস্তার বলিলাম, যাহাতে স্বদেশীয়গণ সেই সময়ে দ্বারকানাথের দায়িত্ব ভালরূপে বুঝিতে পারেন। আরও কিরূপে যোগ সাজোসে ভয়াবহ চুরি হইয়া সেক্রেটারী, খাজাঞ্চী প্রভৃতি বিপদে পড়িতে পারেন, তাহারও যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাইবেন।

আর একবার বিলাতের গ্লিন-হ্যালিফ্যাক্স কোম্পানী এবং কাউটস্ কোম্পানী, এই তুই কুঠীর উপর এই ব্যাঙ্ক হইতে তুই বৃহৎ হুণ্ডী (Bill of Exchange) গিয়া উপস্থিত হয়। প্রথমোক্ত কোম্পানী স্বীকার করিল, কিন্তু দ্বিতীয় কোম্পানী অস্বীকার করিল। দ্বারকানাথ এই সময়ে বিলাতে ছিলেন এবং তিনি নিজে উক্ত হুণ্ডীর

প্রাপ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করিলে তবে কাউটস্ কোম্পানী তাহা স্বীকার করিল।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের মোটামুটি ইতিহাস আমরা দেখিয়া আসিলাম। পর পরিচ্ছেদে ইহার পতনের বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষে ব্যাঙ্ক টাকা দেওয়া বন্ধ করে এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই ইহার 'ইন-লিকুইডেশন' নামে কার্য্য চলিতে লাগিল অর্থাৎ ইহার হিসাব নিকাশ হইয়া দেখা যাইতে লাগিল যে ঋণের কতটা অংশ পরিশোধ হইতে পারে। ইহাও বলিয়া আসিয়াছি যে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্পাদক গর্ডন সাহেবই ইহার পতনের বীজ রোপন করেন।

এই বৎসরে মূলধন চরম সীমায় উঠিয়াছিল—এক কোটী টাকা। ব্যাঙ্কের মন্ত্রণাগৃহে আলোচনা চলিতে লাগিল এতটাকা কিরূপে লাভজনক কারবারে খাটান যাইতে পারে। অবশেষে সম্পাদক গর্ডন-সাহেবরূপী-শনি এই ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিয়াই ইহার সর্ব্বনাশ ঘটাইলেন। তাঁহার প্রস্তাবগুলি আমরা এক একটি করিয়া যথাবুদ্ধি আলোচনা করিয়া দেখিব।

তাঁহার প্রথম প্রস্তাব হইল প্রধানত নীলকুঠীওয়ালাদিগের কুঠীর দলিল-দস্তাবেজ জামিন রাখিয়া এবং তদুপরি কুঠীর বাৎসরিক সম্ভাব্য মালের উপর বিবেচনা করিয়া কুঠীওয়ালাদিগকে ধার দেওয়া। প্রকারান্তরে ইহা দাদন দেওয়া মাত্র। আর একটি নিয়ম তাঁহারই আমলে প্রবর্ত্তিত হয়—তাহাকে নগদাধার বলা যাইতে পারে—ইংরাজীতে তাহাকে 'ক্যাস-ক্রেডিট্' বলে। ইহার ফলে উপযুক্ত বিবেচনা হইলে কোন লোকের নিকটে তাঁহার নিজের জামিনে এবং তৎসঙ্গে ধরিবার ছুঁইবার মত হউক বা কোন ব্যক্তিগত হউক, উপযুক্ত-মত অবান্তর কতকগুলি জামিন লইয়া নির্দিষ্ট পরিমাণে সেই লোককে ধার দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল ধার অবশ্য খুব অল্পদিনের জন্য দেওয়া রীতি এবং এই কারণে ইহাকে এক প্রকার সেই অধমর্ণেরই

নগদ জমার মধ্যে ধরিয়া লওয়া হয়। ইহার পূর্ব্বে যে লোককে যতবারে যত টাকা ধার দেওয়া হইত সমস্তই একসঙ্গে একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে সুদ সমেত চুকাইয়া দেওয়া হইত। কিন্তু এই নগদাধারের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পর অবধি আর সেরূপ করা হইত না—এখন হইতে এই নগদাধারের অধমর্ণগণ সুবিধামত প্রায়ই নিজের বা অপরের ব্যক্তিগত জামিনে ধার লইতেন এবং সুবিধামত যতটুকু সাধ্য হইত তাহাই চুকাইয়া দিতেন, ইহার ফলে একই অধমর্ণ হয়তো তুই তিন-বারে এত টাকা ধার লইতেন যাহা পূর্ব্বে সাহস করিতেন না। প্রত্যেক অধমর্ণের প্রতি নগদাধার পৃথক পৃথক করিয়া প্রদর্শিত হইত। তাহার উপর ধার চুকাইবার সময়ও নির্দ্দিষ্ট ছিল না। ইহার ফলে হয়তো একই কুঠীওয়ালা নিজের কুঠী প্রভৃতি জামিন দিয়া একবার মোটা টাকা ধার লইলেন, আবার হয়তো খুচরা ধার দশ বার দফে লইয়া মোটের উপর আরও একটা মোটা টাকা ধার লইলেন, যাহা পরিশোধ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। এখন, অংশীদারী একরারনামা অনুসারে কোন ঋণ চার মাসের অধিক পড়িয়া থাকিতে দিবার নিয়ম ছিল না। তাই বলিয়া সেক্রেটারী গর্ডন কি ব্যাঙ্ককে নষ্ট করিবার পথে লইয়া যাইতে পশ্চাৎপদ হইতে পারেন?—কখনই নহে। তিনি এক ফাঁকি বাহির করিলেন। নগদাধারের অধমর্ণদিগের হ্যাণ্ডনোট প্রতি তিন মাস অন্তর সম্পূর্ণ বদলাইয়া লইয়া খাতাপত্র ঠিক রাখিতে লাগিলেন। এই কার্য্য হইতেও স্পষ্টই বোধ হয় যে, হয় কমিশন অথবা অন্য কোন প্রকার স্বার্থের বশীভূত হইয়াই গর্ডন এই পথ প্রবর্ত্তিত করিয়া ছিলেন। যখন একরারনামায় ঋণ পরিশোধের সময় স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল, তখন তাহার বিপরীতে কার্য্য করাকে আমরা জুয়াচুরী ব্যতীত অন্য কোন নামে নির্দ্দেশ করিতে পারি না। তিনি না হয় আইনের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছেন, তাই বলিয়া ঐতি-হাসিক কলঙ্ক হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই।

নীলকুঠীওয়ালাদিগকে দাদন দিবার বিরুদ্ধে পরিচালক সভায় আপত্তি উঠিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি যে, এই আপত্তিকারীদিগের

মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন। কিন্তু একা দ্বারকানাথের আপত্তি টিঁকিবে কেন? সেক্রেটারী হইলেন সাহেব। তিনি আবার ম্যাকিন্টস কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব অংশীদার। ইহা ব্যতীত আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে এই সময়ে দশ হাজার অংশীদারের মধ্যে মোটে সাত শত অংশ দেশীয়দিগের হস্তে ছিল, অবশিষ্ট সমস্তই ইংরাজদিগের হাতে। এ অবস্থায় পরিচালক সভায় যে সাহেব সেক্রেটারীর পরামর্শে ইংরাজ কুঠীওয়ালাদিগের নিকটে দাদন দিবার বিরুদ্ধে আপত্তি উড়িয়া যাইবে ইহা জানা কথা। হইলও তাই—আপত্তি টিঁকিল না। দ্বারকানাথের হৃদয়ে ন্যায়পরতার সহিত স্বদেশপ্রেম বড়ই দৃঢ়মূল ছিল। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে দাদন দেওয়া এবং নগদাধার প্রকৃতপক্ষে সাহেবদিগেরই সুবিধার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যতক্ষণ আপত্তি করিবার ছিল, আপত্তি করিলেন, কিন্তু যখন সেই আপত্তি টিঁকিল না, তখন স্থির করিলেন যে গুটিকয়েক ইংরাজ কুঠীওয়ালার হস্তে ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা ছাড়িয়া দিবার পরিবর্ত্তে যথাসাধ্য স্বদেশের টাকা স্বদেশের কার্য্যে প্রযুক্ত করা উচিত। তিনিও তখন সাধ্যমত কার-ঠাকুর কোম্পানীর জন্য দুই প্রকারেই টাকা ধার লইলেন এবং আরও অনেক বাঙ্গালীকে ব্যাঙ্ক হইতে ধার দেওয়াইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এরূপ প্রথা থাকিলে ব্যাঙ্ক টিঁকিতে পারিবে না এবং ইহার পতন হইলে পরিণামে স্বদেশীয় অংশীদারগণের স্কন্ধেই ঋণ পরিশোধের গুরুভার বেশী পড়িয়া যাইবে, কারণ সাহেবদিগের তখনও এদেশে বিশেষ কোনরূপ আকর্ষণ ছিল না—তাঁহারা কেবল হ্যাট কোট প্যাণ্ট পরিয়া আসিতেন এবং এদেশ হইতে অর্থ লুটিবার সুবিধা হইলে লুটিতেন, নচেৎ সেই হ্যাট কোট প্যাণ্ট পরিয়া স্বদেশে ফিরিতেন। তাঁহাদিগের ধরিবার ছুঁইবার কিছুই এদেশে থাকিত না।

যখন প্রথাদ্বয় প্রবর্ত্তিত হইল, তখন অন্যান্য কুঠীওয়ালাদিগের ন্যায় তিনিও তাহার সুবিধাটুকু ভোগ করিবার অধিকার হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিলেন না। তিনিও তাঁহার কার-ঠাকুরের মূল কারবার এবং তদধীনস্থ বিভিন্ন কারবারের জন্য যথাসাধ্য ঋণ গ্রহণ করিয়া অবশ্য

কারবারগুলিকে বিস্তৃত করিয়া সেকালের ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রধান আসন গ্রহণ কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সুদূর কালের ব্যবধানে আমাদিগের বোধ হয় এরূপ ধার না লইলে ভালই করিতেন—তাহাতে তাঁহার কারবার বেশী বিস্তৃত না হউক, বেশী স্থায়িত্বলাভ করিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নগদাধারের প্রথায় প্রথমে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার জাহাজ-মেরামতী কারখানার জন্য আড়াই লক্ষ টাকা ধার করেন। এরূপ ঋণের সীমা ছিল তিন লক্ষ। ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে গিলমোর কোম্পানী তাঁহাদের কয়লার খনির দলিল-দস্তাবেজ এবং আশ্চর্য্য তাঁহাদের নিজেদের গুদামে রক্ষিত কয়লার জামিনে অনেক টাকা হাওলাৎ লইয়াছিলেন। ইহার পর আবার কলিকাতার বাড়ী বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া হইল।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একজন ডিরেক্টর নীলকুঠীওয়ালাদিগের আরও সুবিধাজনক এক প্রস্তাব করিলেন যে, যদি কোন নীলকর ও তাঁহার কলিকাতাস্থ প্রতিনিধি একযোগে লক্ষ টাকা মূল্যের কোন কুঠীর দলিল বন্ধক রাখেন এবং তৎসঙ্গে বৎসরের শেষে উৎপন্ন মাল ব্যাঙ্ককে দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন, তবে তাঁহাকে বৎসরের প্রথমে আনুমানিক মূল্যের কিছু বাদ দিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে এবং যখন সেই নীলকর স্বীকার করিবেন যে, মাল তাঁহার গুদামে উঠিয়াছে, তখন তাঁহাকে সেই অবশিষ্ট মূল্যও দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য যে ইহা পরিচালক সভায় গৃহীত হইল। সেক্রেটারীর সেরূপ চেষ্টা না থাকিলে যে ইহা গৃহীত হইত, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। ইতিপূর্ব্বেই এই মন্ত্র অনুসরণ করিয়াই তিনি কয়েকজন কয়লাখনির অধিকারীদিগের নিজেদের গুদামস্থিত কয়লার উপর ধার দিয়াছিলেন। এরূপ হাওলাতী প্রথা জুয়াচুরী ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাঁহাদের মাল, তাঁহাদের নিজেদের গুদামে, মাল রহিল, তাহার কেনাবেচার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহাদের রহিল, তাহার লাভ লোকসান তাঁহারা নিজেদের মনের মত করিয়া দেখাইতে পারিতেন, এই অবস্থায় মাল নামেমাত্র বন্ধক রাখিয়া তাহার উপর হাওলাৎ দিতে কোন ব্যবসায়ী

রাজী হইতে পারে না। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে নীলকুঠীর উপর কর্জ্জের বাকী পড়িয়াছিল ৪৩,১৫, ৮০০ টাকা এবং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে নীলকুঠী প্রভৃতির উপর কর্জ্জও হাওলাৎ দেখা যায় (১৩৭৮৫৪৭৭ টাকা) এক কোটী সাঁইত্রিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার চার শত সাতাত্তর টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে উপরোক্ত হাওলাতের বাকী পড়িয়াছিল ছাপ্পান্ন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার টাকা।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রণাসভায় পুনরায় আপত্তি উঠিল যে, এরূপ জমীদারী বা নীলকুঠী বা অন্য কোন কুঠী বা ইমারতের উপর হাওলাৎ দেওয়া উচিত নহে। একটি প্রধান যুক্তি এই যে, একরারনামার সর্ত্ত অনুসারে যে সকল স্থলে অধমর্ণের নিকট টাকা আদায় না হয়, সেই সকল স্থল ব্যতীত অন্যত্র অবান্তর জামিনে হাওলাৎ দেওয়া নিয়ম বিরুদ্ধ। দ্বিতীয় যুক্তি এই যে এইরূপে কুঠীওয়ালাদিগকে হাওলাৎ দিলে তাহাদিগের কারবারের পতনে ব্যাঙ্কের নিজ হইতে সেই লোকসানী কারবার চালাইতে বাধ্য হইবার গুরুতর সম্ভাবনা আছে, কারণ উপযুক্ত রূপ নীল না জন্মাইতে পারিলে বন্ধকী সম্পত্তির বিশেষ কোনই মূল্য হইবে না। গর্ডন সাহেবের রাজত্ব কালে এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইবার আশা করা বৃথা। ইহা তো গৃহীত হইলই না, প্রত্যুত ইহার বিরোধী একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল যে এইরূপ হাওলাতী প্রথা অতি লাভজনক, অতি নিরাপদ। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি এই হাওলাতী প্রথার ফলে নীলকুঠী এবং রেশম ও অন্যান্য কুঠীর উপর কর্জ্জ ও হাওলাতে প্রায় ৯৭ লক্ষ ৬৩ হাজার দাঁড়াইয়াছিল। এই বৎসরের শেষে ফার্গুসন ব্রাদার্স, গিলমোর কোম্পানী প্রভৃতির নীল-কুঠীর ও অন্যান্য কুঠীর পতনে গোড়াতেই প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা আটকাইয়া গেল, তাহার উপর সেই টাকা উদ্ধারের আশায় আরও ২৫ লক্ষ টাকা তদুপরি আটকান হইল। কেবল দুইটি কুঠীর উপরেই ৩০ লক্ষ টাকা নীলকুঠী মাত্র বন্ধক রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কোন্ কুঠীওয়ালাকে কত টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য এ সকল বিষয়ে সেক্রেটারীর তীব্র দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ছিল।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ষাণ্মাসিক সভায় স্থির হইল যে ব্যাঙ্কে যে সকল নীলকুঠী বন্ধক দেওয়া আছে, সেগুলিকে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নহে— তাহাদের উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনমত হাওলাৎ দেওয়া হউক। তাঁহারা দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া এই মত প্রকাশ করিলেন যে, ঐ সকল দেউলিয়া নীলকুঠীর সত্ত্বাধিকারীগণ হাওলাতের উপায়ে ব্যাঙ্ক হইতে যে সাহায্য পাইতেছিলেন, সহসা সে সাহায্য বন্ধ করিলে তাঁহাদের বড়ই কষ্ট হইবে। কি দয়া! ইহা স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র। ইহার ভাবার্থ এই যে কুঠীওয়ালাগণ সাধারণের অর্থে ব্যাঙ্কের ছায়াতে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবেন। এই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে ছিলেন, ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

ব্যাঙ্কের স্থাপন কালে একটি প্রধান কর্ত্তব্য এই স্থির হয় যে সাধারণ ব্যবসায়ী মাত্রকেই ব্যাঙ্ক সাহায্য করিবে। কিন্তু হাওলাতী প্রথায় পরিণামে দাঁড়াইল যে ইহার অধিকাংশ টাকা কয়েকটি মাত্র কুঠীওয়ালা গ্রাস করিয়া ফেলিল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ছয়টি কুঠীওয়ালার হাতে নীল কুঠীর জামিনে ৭৩ লক্ষ টাকা উদরস্থ করিয়াছিল। তন্মধ্যে কার-ঠাকুরের ঋণ পরে পরিশোধ করা হইয়াছিল। এইরূপে ব্যাঙ্ক যে টাকা বাহিরে ছড়াইতে পারিত, তাহা কয়েকটি কুঠীওয়ালার হাতে পড়িয়া যাওয়াতে ব্যাঙ্কের অন্যান্য প্রয়োজন অনুসারে টাকা পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিল। কুঠীওয়ালাগণ পরিচালক হইয়া যে নিজ ক্ষমতার কিরূপ অপব্যবহার করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় একটি পুস্তকে উল্লিখিত আছে। কলভিল গিলমোর কোম্পানী এক সময়ে ২৪ লক্ষ টাকার (মূলধনের সিকি অংশের) ঋণী ছিলেন; ককরেল কোম্পানী নগদাধার বা হাওলাৎ লইয়াছিলেন ১৬ লক্ষ টাকার। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ফার্গুসন ব্রাদার্স ব্যাঙ্কের নিকটে একুশ লক্ষ টাকার ঋণী থাকিয়া 'ফেল' হইয়া গেল। ব্যাঙ্ক ইঁহাদের অধিকাংশ সম্পত্তি আবার ইঁহাদিগকে ধারে বিক্রয় করিল। তদ্ব্যতীত ইহাদের নীল কুঠীর পশ্চাতে ব্যাঙ্ক আরও টাকা ঢালিতে লাগিলেন। তদপেক্ষা যদি এই টাকাটা লোকসানী খাতে খরচ লিখিয়া এরূপ হাওলাতী

কারবার একেবারে বন্ধ দিত, তাহা হইলে সম্ভবত ব্যাঙ্ক স্থায়ী হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হইবে কেন—শনিরূপী গর্ডন মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে গর্ডন 'বিল অফ এক্সচেঞ্জ' অথবা হুণ্ডীর কারবারেরও পত্তন করেন। ব্যাঙ্ক এখানে লণ্ডনের উপর অপর লোকের হুণ্ডী কিনিয়া লণ্ডনস্থ কোন ব্যাঙ্কের উপর আদায়ের ভার দিত এবং সেই ব্যাঙ্কের উপর নিজের হুণ্ডী টানিয়া বাজারে বিক্রয় করিত। অপর লোকের হুণ্ডী ব্যাঙ্ক সস্তায় কিনিত এবং ব্যাঙ্কের তখন খুব প্রতিষ্ঠা ছিল বলিয়া তাহার হুণ্ডী বাজারে বেশী দামে বিক্রয় হইত। এই হুণ্ডী বেচার দাম হইতে হুণ্ডী কেনার দাম বাদ দিয়া যাহা থাকিত, তাহাই ব্যাঙ্কের লাভ। অবশ্য ব্যাঙ্ক এই আদায় হুণ্ডী কিনিত এবং বেচিত যে লণ্ডনস্থ ব্যাঙ্ক উভয় হুণ্ডীই স্বীকার করিবে। এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ক্রীত হুণ্ডী লণ্ডনে স্বীকৃত হইবার উপর বিক্রীত হুণ্ডীর স্বীকার ও তজ্জনিত লাভের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। এখন, লণ্ডনে যে হুণ্ডী গেল, তাহা এখনি স্বীকৃত হইবে কি না সে কথা নহে, কিন্তু দশ মাস পরে যখন সেই হুণ্ডী দেওয়া হইবে তখন তাহা লণ্ডনস্থ ব্যাঙ্ক গ্রাহ্য করিবে কি না, তাহার উপরেই সমস্ত কারবারটুকু নির্ভর করিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একবার ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই প্রকার হুণ্ডী বিলাতের ব্যাঙ্কওয়ালা অস্বীকার করিয়া অবশেষে দ্বারকানাথ ঠাকুরের আবশ্যক হইলে টাকা পরিশোধ করিবার ভার লইলে তবে স্বীকার করিয়াছিল। ব্যাঙ্ককে এতদূর বিপদে টানিয়া আনিয়া গর্ডন যে বুদ্ধিমানের মত কাজ করেন নাই, তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। দ্বারকানাথ ঠাকুর সেবার বিলাতে না থাকিলে হুণ্ডী নিশ্চয়ই অস্বীকৃত হইত এবং তাহা হইলে ছয় বৎসর পূর্ব্বেই ব্যাঙ্কের কার্য্য উঠাইয়া দিতে হইত। কিন্তু তাহা যে হইবার নহে, তখন যে দ্বারকানাথ ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি স্বহস্তে যাহা রোপন করিয়াছেন, নিজের জীবন থাকিতে তাহাকে মরিতে দিবেন? তিনি তাহা পারেন নাই। যে হুণ্ডীর পরিশোধের

ভার দ্বারকানাথকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ আটাশ লক্ষ টাকা।

বিলাতী হুণ্ডীর কারবার যখন এত দূর চলিয়াছিল, তখন গর্ডনের আমলে দেশী হুণ্ডীর কারবারও যে খুব বিস্তৃত হইবে তাহা বলা বাহুল্য। বাস্তবিক এই সময়ে মূলধন যেমন অতিরিক্ত সঞ্চিত হইয়াছিল, সেই মূলধন নষ্ট করিবার অনেক উপায়ও এই সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ক্রমে নগদ টাকা যখন কুঠীওয়ালারা নিজেদের হাতে উঠাইয়া লইল, তখন তাহাদের সহিত ব্যাঙ্কের হুণ্ডীর কারবার চলিতে লাগিল। সচরাচর যে দেশী হুণ্ডীর কারবার চলিয়া থাকে, তাহা ব্যবসায়ী মাত্রেই জানেন। কিন্তু এই ব্যাঙ্কের জুয়াচুরী হুণ্ডীর কার্য্য বুঝিবার জন্য একটু তলাইয়া দেখিতে হইবে। কুঠীওয়ালারা মাল কিনিয়া টাকার জন্য অস্থির হইয়া হুণ্ডী কাটিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা লইলেন। অবশেষে যখন টাকা পরিশোধ করিবার দিন আসিল, তখন সেই কুঠীওয়ালা ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই হাওলাৎ করিয়া হুণ্ডীর টাকা পরিশোধ করিলেন। এইখানেই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রকৃত পক্ষে ব্যাঙ্কের লাভ না হইয়া লোকসানই হইতে লাগিল। ইহার ফলে কাগজে পত্রে ব্যাঙ্কের খুবই টাকা আসিতে লাগিলেও নগদ টাকা সমস্তই হস্তান্তরিত হওয়াতে ব্যাঙ্ক অন্তঃসারশূন্য হইতে লাগিল এবং নিজের প্রয়োজন কালে, নিজের মান রক্ষার কালে নগদ টাকার অভাবে কাগজের ভারে ডুবিয়া গেল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে নোটের অতিশয় আধিক্য হওয়াতে কাগজের ভারে অনেক ব্যাঙ্ক ডুবিয়া গিয়াছিল, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কও একদিক দিয়া বলিতে গেলে কাগজের ভারে ডুবিয়া গিয়াছিল। হুণ্ডী, নোট, হ্যাণ্ডনোট প্রভৃতি কাগজের খেলা ইহার শেষাবস্থায় অত্যাধিক মাত্রায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। লোকেরা তাহাকে হুণ্ডী ও হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া টাকা লইতে লাগিল, এদিকে ব্যাঙ্ক নিজে যে সকল নোট বাজারে ছাড়িয়াছে, তাহা ভাঙ্গাইতে আসিলে টাকা দিতে পারিল না, নিজের হুণ্ডী হয়তো যথাসময়ে পরিশোধ করিতে

পারিল না। ব্যাঙ্ক যেদিন টাকা দেওয়া বন্ধ করিল, সেদিন তাহার ক্যাসবাক্সে মোটে ৭৪০ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। কোটী টাকার কি পরিণাম ?[১]

ম্যাকিণ্টস কোম্পানী যখন ফেল হয়, তখন তাহার সত্ত্বাধিকারীগণ শ্রীরামপুরে পলাইয়া বসিয়া থাকেন। তাহার কারণ, তাঁহারা পূর্ব্বাবধি নিজেদের দেউলিয়া অবস্থা জানিতে পারিয়াও লোকদিগকে জানিতে দেন নাই, উল্টা তাহাদের নিকট হইতে গচ্ছিত লইতে কুণ্ঠিত হন নাই। সেই ম্যাকিণ্টস কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব অংশীদারদ্বয় গর্ডন এবং ষ্টুয়ার্ট যখন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন জানা কথা যে ব্যাঙ্কে জুয়াচুরীর স্রোত চলিবে এবং পরিণামে তাহারই ফলে ব্যাঙ্কের মহাপতন ঘটিবে। ষ্টুয়ার্টকে ব্যাঙ্কের বিলাতস্থ অংশীদারগণ নিযুক্ত সেক্রেটারী হইবার জন্য প্রেরণ করেন। এখানে তিনি একটা বিলাতী হুণ্ডীর টাকা বোম্বাই নগরে পাঠাইবার জন্য প্রাপ্ত হইয়া কতক টাকা পাঠাইয়াছিলেন, বাকী টাকা ব্যাঙ্কের অন্যান্য ক্যাসের সহিত মিশাইয়া ফেলিলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে পরে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ষ্টুয়ার্টের রাজত্বকালে তো ব্যাঙ্ক পতনের অবস্থায়। কিন্তু গর্ডনের আমলেই ব্যাঙ্ক উন্নতির শিখরে উঠিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাই গর্ডনেরই মহিমা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গীত হইয়াছে।

ব্যাঙ্কের একটি প্রধান অংশীদার ও-হ্যানলন সাহেব গর্ডনের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা তাহা হইতে কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিয়া এই কালিমা-মাখা পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব।

এই গর্ডন যখন ম্যাকিণ্টস কোম্পানীতে ছিলেন, তখন ও-হ্যানলন স্বীয় পুত্রকে পাঠাইবার জন্য প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ম্যাকিণ্টস কোম্পানীর নিকটে পাঠাইয়া দেন। গর্ডনের পরামর্শে তাহা

১ Hindu Intelligence, P.159

যথাস্থানে প্রেরিত না হইয়া কোম্পানীর ক্যাসে জমা হইয়া গেল। অথচ তাহার কয়েক দিন পরেই ম্যাকিণ্টস কোম্পানী ফেল! ও-হ্যানলন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে গিলমোর কোম্পানীর নিকট হইতে নিজে তাহাদের দেউলিয়ার অবস্থা শুনিয়া গর্ডনকে বরাবর বলিয়া আসিতেছিলেন, তৎসত্ত্বেও গিলমোর কোম্পানীকে লক্ষ লক্ষ টাকা কৰ্জ্জ ও হাওলাৎ দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল জুয়াচুরীর উপায় স্বরূপে যেই খোদ ডিরেক্টরের পদ খালি হইত, অমনি গর্ডন নিজেদের দলের একজনকে নানা উপায়ে সেই পদে বসাইতেন। যাঁহারা যত বেশী দেউলিয়া হইয়াছেন, তাঁহারাই তত ডিরেক্টর হইবার অধিকারী বিবেচিত হইতেন। ও-হ্যানলন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তিনি গর্ডনকে গিলমোর কোম্পানী সম্বন্ধে যাহা কিছু সন্ধান দিয়াছিলেন, গর্ডন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদিগকে তাহা জানান আবশ্যক বোধ করেন নাই এবং নিজেও তাহাদের নিকট হইতে ধার দিবার কালে ভালরূপ বন্ধক লইতেও মনোযোগী হন নাই। গিলমোর কোম্পানীর হিসাব গর্ডন এরূপ পরিষ্কার রাখিতেন যে, এই কোম্পানীর পতনের পর যখন আদালত হইতে জিজ্ঞাসা করা হইল যে ইহার নিকট ব্যাঙ্কের পাওনা কত, তখন গর্ডন আন্দাজে বলিলেন যে তিন লক্ষের উপর, কিন্তু হিসাবে তাহা দাঁড়াইল প্রায় এক লক্ষ টাকা। এই সকলের পরেও কি আর সন্দেহ থাকে যে, গর্ডনের সহিত গিলমোর প্রভৃতি দেউলিয়া কোম্পানী সমূহের বন্দোবস্ত ছিল? তিনি নিজে সেক্রেটারী হইয়াও বাণিজ্যের জুয়াখেলাতেই উন্মত্ত।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরে ব্যাঙ্ক ফেল হয়, কিন্তু জুলাই মাসে প্রতি অংশে শতকরা সাত টাকা করিয়া লাভ দেওয়া হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে এই লাভ লোকদিগের গচ্ছিত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, কারণ মূলধন অনেক পূর্ব্বেই ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কের হিসাব রক্ষক বোনো সাহেব বলেন যে ডিরেক্টর নিজেদের নামে হুণ্ডী কাটিয়া এই টাকা উঠাইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, লোকেদের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য কয়েকজন ডিরেক্টর নিজেরাই সম্ভবমত অংশ সকল

কিনিতে লাগিলেন—যেন সেগুলির তখনও অনেক মূল্য, বাস্তবিক তখন ব্যাঙ্ক পতনোন্মুখ। এই সকল শেষোক্ত জুয়াচুরীর কালে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইহলোকেই ছিলেন না।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন হইতে আমরা কয়েকটি বিষয় শিক্ষা লাভ করিতেছি। প্রথমত বিশেষরূপ দেখিয়া শুনিয়া প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়। ব্যাঙ্কে নগদ টাকা যতদূর সম্ভব অধিক রাখা কর্ত্তব্য। কাগজপত্র অপেক্ষা ধরিবার ছুঁইবার মত জিনিস রাখিয়া তাহার মূল্যের কতক অংশ মাত্র ধার দেওয়া যাইতে পারে। কাগজপত্রের কাজ পরিমাণমত করিতে হয়। দাদন প্রথা ব্যাঙ্কের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। যে পরিমাণে হুণ্ডী প্রভৃতির কাজ চলিবে অন্তত তাহার সিকিবাদে নগদ টাকা মজুত রাখিতে হইবে। সেক্রেটারী, খাজাঞ্চী এবং একাউন্টেন্ট, এই তিনটি কর্ম্মচারী বিশ্বস্ত ও কর্ম্মদক্ষ হওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মেডিকেল কলেজ

যে সকল কার্য্যের ফলে দ্বারকানাথ ঠাকুর তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরলদিগের নিকটে দেশীয়দিগের মুখপাত্রস্বরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন, মেডিকেল কলেজ সংস্থাপনে সর্ব্বান্তঃকরণে সহায়তা তন্মধ্যে একটি প্রধানকার্য্য। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা অথবা হিন্দুকলেজ সংস্থাপনে তিনি প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মেডিকেল কলেজের সংস্থাপন ও উন্নতিকল্পে তিনি ততোধিক সহায়তা করিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি এবিষয়ে সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর না হইলে আজ মেডিকেল কলেজের সুন্দর সৌধ দেখিতে পাইতাম না এবং তাহার ফলস্বরূপ ইংরাজ চিকিৎসকদিগের সহিত সমস্পর্দ্ধী দেশীয় চিকিৎসকগণেরও আবির্ভাব দেখিতে পাইতাম না।

তিনি 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্' কথার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। মনুষ্যজীবন রক্ষা করিতে গেলে দুইটি উপকরণ আবশ্যক—আহার এবং পীড়ার শান্তিকারক ঔষধ। মানুষ প্রথমে আহার করিয়া জীবনধারণ করিতে পারিলে এবং চিকিৎসাদ্বারা পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে তবে না ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে এবং নানা ভাষার নানা বিষয় শিক্ষালাভ করিয়া হৃদয়কে প্রশস্ত ও উন্নত করিবে। আমরা দেখিয়াছি যে দ্বারকানাথ সকল বিষয়েরই মূলে যাইয়া ধরিতেন। মানুষের জীবন রক্ষা প্রয়োজন—জীবন রক্ষার একমাত্র উপকরণ আহার, আহার করিতে গেলেই অর্থ চাই এবং অর্থের সর্ব্বপ্রধান উপায় বাণিজ্য। তাই তিনি কর্ম্ম ছাড়িয়া সর্ব্বপ্রথমেই বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশীয়দিগকে দেখাইলেন যে সাধুতা এবং একনিষ্ঠা থাকিলে বাণিজ্যে ইংরাজ-দিগের সহিত সমকক্ষ হওয়া যায়, স্বাধীনতা লাভ করা যায়—ইংরাজ

কুঠীওয়ালাদিগের মুৎসুদ্দি হইয়া তাহাদিগের দাস হইয়া পরাধীনতার কূপের মধ্যে বাস করিবার পরিবর্ত্তে স্বাধীনতার মুক্তবায়ু সেবন করা যায়। সেইরূপ মানুষের পীড়া হইলে ভাল চিকিৎসা প্রয়োজন। চিকিৎসা ভাল হইতে গেলে ভাল চিকিৎসক আবশ্যক এবং তাহা সাধারণের সুলভ হওয়া আবশ্যক। ইহার জন্য একটি চিকিৎসা শিখিবার ভাল স্থান আবশ্যক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মেডিকেল কলেজের মত চিকিৎসা শিক্ষার স্থান এখানে মনুষ্যজীবন রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। তাই, দ্বারকানাথ ইহার প্রথমাবধি স্বীয় জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ইহার উন্নতিকল্পে প্রাণপণে সহায়তা করিয়াছিলেন।

আমরা গ্রন্থের প্রারম্ভেই দেখিয়া আসিয়াছি যে সেকালে কলিকাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি মহামারীর দুর্দ্দান্ত প্রকোপ ছিল। অথচ তখন কোন প্রণালীরই ভাল চিকিৎসা প্রচলিত ছিল না। যদি কবিরাজ দেখান হইত, তবে তাঁহার সকল রোগেই প্রধান ব্যবস্থা দীর্ঘ—তাহাতে রোগী অনেক স্থলে মারাও পড়িত। আবার যাঁহারা ইংরাজী চিকিৎসা করাইতেন তাঁহাদের পক্ষেও ঐ প্রকার বিপদ—ইংরাজী চিকিৎসকগণ সকল রোগেই রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা করিতেন। তাহাতেও অনেক রোগীর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিত। কোম্পানীর সৈন্য এবং জাহাজের ইউরোপীয় নাবিকগণের জন্য দমদমায় এবং বর্ত্তমান মেডিকেল কলেজের স্থানে হাসপাতাল বলিয়া জিনিস ছিল বটে, কিন্তু লোকের ধারণা ছিল যে এই সকল হাসপাতালে যে কি প্রণালীর চিকিৎসা চলিত, তাহা কেহই জানিত না কারণ কোন রোগীই হাসপাতালে প্রবেশ করিবার পর তাহার বাহিরে পদার্পণ করিবার অবসর পায় নাই।

ক্রমে যখন গবর্ণমেণ্টের বোধ হইল যে তাঁহাদের নিজেদের বিভিন্ন কর্ম্মস্থলে কর্ম্মচারীগণের চিকিৎসার জন্য ভাল চিকিৎসক আবশ্যক, তখন তাঁহারা সংস্কৃত কলেজে হিন্দুদিগের জন্য এবং মাদ্রাসায়

মুসলমানদিগের জন্য চিকিৎসা শিক্ষার শ্রেণী খুলিয়া এবং আরও পরে দেশীয় চিকিৎসক প্রস্তুত করিবার জন্য ১৮২২ খৃষ্টাব্দে 'দেশীয় চিকিৎসকের বিদ্যালয়' নামে এক বিদ্যালয় খুলিলেন। শেষোক্ত বিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলমান জাতি নির্ব্বিশেষে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ছাত্র সংখ্যার সীমা ছিল কুড়িজন। ছাত্রদিগের বয়স আঠারো হইতে কুড়ি হওয়া চাই এবং সচ্চরিত্র ও নাগরী বা পারসী বর্ণমালায় হিন্দুস্থানী ভাষা কহিবার ও লিখিবার সক্ষম হওয়া চাই। বৈদ্য হাকিমদিগের সন্তানগণের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইত। ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদের বেতন মাসিক ২০ হইতে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং তাহাদের পেনসনের বন্দোবস্তও ছিল। সার্জন জেমস জেমসন মাসিক ৮০০ টাকা বেতনে ইহার পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন একটি মুন্সী (৬০ টাকা), একটি কেরাণী (৩০ টাকা) এবং একটি চাপরাশী (৫ টাকা), এই কয়েকটি কর্ম্মচারী ছিল। বলা বাহুল্য যে কি সংস্কৃত কলেজে, কি মাদ্রাসায় এবং কি এই বিদ্যালয়ে, কোথায়ও ভালরূপ চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত না। চিকিৎসা শিখাইবে কে? শিখাইবার যন্ত্র কোথায়? কোন্ সাধারণ ভাষাতেই বা শিক্ষা দেওয়া হইবে? এই শেষোক্ত বিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানী ভাষাতে ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রের কতকগুলি ঔষধ ও তাহার গুণাবলী বিষয়ে সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন উপদেশ দেওয়া হইত। ডাক্তার ব্রেটন ও টাইটলার ঐ বিদ্যালয়ের ক্রমান্বয়ে অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রস ঐ বিদ্যালয়ে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার উপদেষ্টা ছিলেন। ছাত্রদিগকে তিনি যে উপদেশ দিতেন তাহাতে সোডার গুণ সর্ব্বদাই ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি সোডাতত্ত্ব ব্যতীত আর কিছু জানিতেন বলিয়া বোধ হয় না। যখন তখন সোডার মহিমা শুনিয়া শুনিয়া ছাত্রেরা বিরক্ত হইয়া তাঁহার নাম সোডা রাখিয়াছিল। সেকালের নব্য বঙ্গের নেতৃগণ এই সোডাকে লইয়া সর্ব্বদা কৌতুক করিতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ে প্রকাশ্য সংবাদপত্রে "সোডা ও তাঁহার ছাত্রগণ" শীর্ষক এক

প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ডাক্তার টাইটলার একজন প্রাচ্য পক্ষপাতী এবং খেয়ালী লোক ছিলেন। তিনি নিজ পুত্রের ছাগলের গাড়ীতে চড়িয়া গড়ের মাঠে বাহির হইয়াছিলেন। এদেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষাতে চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, এই কারণে মেডিকেল কলেজ সংস্থাপনে তিনি অনেক আপত্তি উঠাইয়াছিলেন। অপরদিকে সংস্কৃত কলেজে চরক ও শুশ্রুত এবং মাদ্রাসায় আবিসেন্না পড়ান হইত।

এদিকে ইংরাজ-রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিলাত হইতে বহু অর্থ দিয়া এত ডাক্তার আনা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ এদেশীয়দিগকে ইংরাজী প্রণালীতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যার অবস্থা অবগত হইবার জন্য সে সময়ের কতিপয় বিদ্বান ব্যক্তিকে লইয়া এক কমিটি নিযুক্ত করিলেন। তাহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন জে, গ্রাণ্ট এবং সভ্য ছিলেন সাদারল্যাণ্ড, ট্রিভিলিয়ান, টমাসস্পেন্স, রামকমল সেন এবং ব্রামলি। তাঁহারা ডাক্তার টাইটলারের প্রত্যেক আপত্তি খণ্ডন করিয়া এক সুদীর্ঘ মন্তব্যে মেডিকেল কলেজ সংস্থাপন এবং তথায় ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন।

এই ভিত্তির উপর গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী কতকগুলি প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে এই কলেজ সংস্থাপন স্থির হইল। ইহাতে ইংরাজী ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়াও স্থির হইল; ৫০টি নিয়মিত ছাত্র লওয়া হইবে, তাঁহাদের ভদ্রবংশ ও সচ্চরিত্রের বিষয়ে প্রমাণ দিতে হইবে। শিক্ষা কমিটির উপর ইহার পরিচালনের ভার হইল। শিক্ষা কমিটিতে প্রধান হাসপাতালের সার্জন, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের স্থায়ী সৈন্যের ডাক্তার, দেশীয় হাসপাতালের সার্জন, চক্ষু চিকিৎসালয়ের পরিদর্শক এবং কোম্পানীর ঔষধ প্রস্তুতকারক বসিবেন। একটি

অধ্যাপক বাৎসরিক ২০০০৲ টাকায় এবং একটি সহকারী অধ্যাপক বাৎসরিক ৮০০০ টাকায় নিযুক্ত হইবেন। নিয়মিত ছাত্র ব্যতীত ইহা যে কেহ ইংরাজী ও বাঙ্গালা অথবা ইংরাজী এবং হিন্দুস্থানী লিখিতে পড়িতে পারিবে এবং ভদ্র বংশোৎপন্ন ও সচ্চরিত্র, তাহাদের সকলেরই জন্য জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে উন্মুক্ত হইবে। এই সকল প্রস্তাব অনুসারে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে মেডিকেল কলেজ খোলা হয়। ডাক্তার ব্রামলি ইহার প্রথম অধ্যাপক, ডাক্তার গুডিভ সহকারী অধ্যাপক এবং ডাক্তার ওষানেভি রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

মেডিকেল কলেজ খোলা হইবার পর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ তারিখে আশান্বিত চিত্তে দ্বারকানাথ ব্রামলি সাহেবকে উৎসাহ দিয়া এক পত্র লিখিলেন—"আমাদের স্বদেশীয়গণের মধ্যে মেডিকেল কলেজ অত্যন্ত সুফল আনয়ন করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে যে উপকার হইবে, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি; কিন্তু আমি ইহাও জানি যে, আপনার গোড়াতেই অশেষ বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে।" আর একটি কথা তিনি বলিয়াছেন, যাহা সে সময়ে অত্যন্ত সত্য ছিল—"আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে স্বদেশীদিগকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহিলে অর্থ পুরস্কার অপেক্ষা অধিকতর প্রলোভনের সামগ্রী আর কিছুই নাই।" এই শতাব্দী কালের শিক্ষা বিস্তারের ফলে আজ কাল অবশ্য ইহার দুই একটি মাত্র ব্যতিক্রম স্থল দেখা যাইতেছে। যাহা হউক তিনি কেবল মুখের উৎসাহ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি দেশীয় ছাত্রগণের চিকিৎসা বিদ্যা শিখিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য তিন বৎসরের জন্য পুরস্কার স্বরূপে বিতরণার্থে বাৎসরিক দুই হাজার টাকা দিতে স্বীকার করিলেন এবং যাহাতে এই টাকা যাহারা কলেজে যথার্থ অধ্যয়ন করিয়াছে, এরূপ দেশীয় ও নিয়মিত ছাত্র আট-দশ জনের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিলেন, যাহাতে ছাত্রদের নিকট এই পারিতোষিকের একটা মর্য্যাদা থাকে, নিতান্ত অল্প হইয়া না যায়। ইহার উত্তরে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা কমিটি তাঁহার উন্নত মানব-হিতৈষণার প্রশংসা

করিয়া ধন্যবাদ জানাইলেন। মেডিকেল কলেজের পুরস্কার বিতরণের দিবসে ও দ্বারকানাথের উদ্দেশ্যে তাঁহার কলেজের উন্নতি বিষয়ে যত্ন এবং এই দানের জন্য শিক্ষা কমিটি মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। আজ এই কলেজ হইতেই চিকিৎসকের নিত্য সৃষ্টি হইতেছে। এই কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রেরা মফঃস্বলে, সৈনিক বিভাগে, রেলওয়ে বিভাগে, জাহাজে, চা-করদিগের বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশের সর্ব্বত্র চিকিৎসা-নৈপুণ্যে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর প্রাণ রক্ষা করিয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদভাজন হইতেছেন।

বিদ্যালয় তো প্রতিষ্ঠিত হইল, চিকিৎসা বিদ্যা ছাত্রগণ কণ্ঠস্থ করিতে লাগিল—কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যা তো আর কেবল কণ্ঠস্থ করিবার বিদ্যা নহে, হাতে কলমে শব ব্যবচ্ছেদ না করিলে চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতিই হইতে পারে না। এই শব ব্যবচ্ছেদের অভাবে আমাদের দেশে কবিরাজগণের বিদ্যা যেমন সেই আদিমকালের ঔষধ ও চিকিৎসায় সীমাবদ্ধ আছে, মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণেরও বিদ্যা সেইরূপ কণ্ঠস্থ বিদ্যা মাত্রে পর্যবসিত হইয়া কোনই উপকারে আসিত না, যদি না এ বিষয়েও দ্বারকানাথ অগ্রসর হইয়া ভারতবাসীকে পথ প্রদর্শন করিতেন। সে সময়ে শব ব্যবচ্ছেদের প্রতি ভারতবাসী-মাত্রের, বিশেষত হিন্দুদিগের এক বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। লোকের ধারণা ছিল যে শব স্পর্শ করিলে জাতি নষ্ট হইবে। যখন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিলে, সতীদাহ নিবারণে সাহায্য করিলে সে সময়ে লোকে জাতি নষ্ট করিবার ভয় প্রদর্শনে সাহস করিত, তখন শব স্পর্শ করিলে জাতিনাশের বিশেষ ভয় ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাধীনতা যাঁহার প্রাণমনে প্রস্ফুরিত, তিনি সামান্য জাতিনাশের ভয়ে দেশের একটা মহদুপকার সাধনে পশ্চাৎপদ হইতে পারেন না। দেশীয়দিগের হৃদয় হইতে এই জাতি নাশের ভয় দূর করিবার জন্য তিনি স্বয়ং অবসর পাইলেই কলেজে ছাত্রগণের মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ দান করিতেন। আমাদের সে কালের বৃদ্ধ আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে প্রচার আছে যে তিনি কেবল

উপস্থিত থাকিতেন না, তিনি সর্ব্ব প্রথম নামে মাত্র শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া শব স্পর্শের ভয় ছাত্রদিগের মন হইতে অপনোদন করিলেন। তিনি ছাত্র ছিলেন না বলিয়া সে কথা কোন পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। মধুসূদন গুপ্ত সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যকশ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন। মেডিকেল কলেজ খুলিবার পরেও তাঁহাকে এই কলেজের পণ্ডিত করিয়া রাখা হইল। দ্বারকানাথের উৎসাহে ও দৃষ্টান্তে বল পাইয়া এই পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তই অতি গোপনে কলেজের বহিঃ প্রাঙ্গণস্থিত এক গৃহে সর্ব্বপ্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার একখানি প্রতিমূর্ত্তি এই কারণে কলেজ গৃহে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার দেখাদেখি ক্রমে অপরাপর ছাত্রগণও ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া রীতিমত শব ব্যবচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইল। মধুসূদনের প্রথম শব ব্যবচ্ছেদের হিন্দু সমাজে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল।[১]

এই বৎসরেই ১৯শে এপ্রিল তারিখে দেশীয় হাসপাতালের অধ্যক্ষগণের নিকট ডাক্তার মার্টিন পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে উক্ত হাসপাতাল প্রধানত অস্ত্র চিকিৎসার জন্যই রক্ষিত, এদিকে গরীব লোকেরা জ্বরজ্বালাতে বিনা চিকিৎসাতে মারা যাইতেছে। সুতরাং এই নগরের কোন মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটা জ্বরের হাসপাতাল খোলা কর্ত্তব্য। এই পত্র তদানীন্তন বঙ্গের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তার সমীপে প্রেরিত হইলে তিনি কলিকাতার স্বাস্থ্য এবং জ্বরের হাসপাতালের উপযোগিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করিলেন। দ্বারকানাথ এই কমিটির একজন সভ্য ছিলেন এবং ইহার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রমও করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন শিক্ষা কমিটির সম্পাদক ডাক্তার মাউয়াট মিউনিসি-পাল কমিটির চেয়ারম্যান স্যার জন পিটার গ্রাণ্টকে এই হাসপাতালের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে কার্য্যও হইতে লাগিল। দ্বারকানাথ এবং অন্যান্য ধনীগণ ইহাতে যথেষ্ট

১ Goodeve's Lecture. Hindu Intelligence; P. 220

সাহায্য করিলেন। মতিলাল শীল মেডিকেল কলেজের সংলগ্ন এক খণ্ড জমি, আনুমানিক ১২ হাজার টাকা মূল্যের—ছাড়িয়া দিলেন। এই সকল চেষ্টার ফলে পটলডাঙ্গাস্থ জ্বরের হাসপাতাল (বর্ত্তমানে মতিলাল শীল বহির্হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ৩রা সেপ্টেম্বর লর্ড ডালহাউসী এই হাসপাতালের ভিত্তি ফ্রীমেসনদিগের বাদ্য ও আমোদের মধ্যে স্থাপিত করেন। মিউনিসিপাল কমিটি প্রায় সাড়ে পঞ্চান্ন হাজার টাকা উঠাইয়া ছিলেন, তাহা শিক্ষা বিভাগের হাতে দিলেন। ডাক্তার মাউয়াটের আর একখানি পুস্তিকা প্রকাশের ফলে সাধারণ চাঁদা হইতে ৩৬ হাজার টাকা উঠিয়াছিল। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ইহাতে ৫০ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ডাক্তার মাউয়াট একজন সুদক্ষ কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একাধারে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, উক্ত কলেজের সম্পাদক, শিক্ষাবিভাগের সম্পাদক, গবর্ণমেণ্টের পুস্তক সমূহের তত্ত্বাবধায়ক, বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক এবং নূতন স্থাপিত জ্বর-হাসপাতালের প্রথম চিকিৎসক ছিলেন।

দ্বারকানাথ প্রথমবার বিলাত যান ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে। তথাকার লণ্ডনস্থ কলেজ হাসপাতাল প্রভৃতি দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে কলিকাতার মেডিকেল কলেজে বিলাতের কোন মেডিকেল কলেজের পদাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিতে পারে না—তবু তখন ডাক্তার ব্রামলির ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর পর তিন চারজন অতিরিক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে স্বদেশীয় কয়েক ব্যক্তি বিলাত হইতে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিয়া না আসিলে এদেশে চিকিৎসার প্রকৃত উন্নতি হইবে না। তাই তিনি প্রত্যাগমন করিয়া দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রাকালে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সরকারের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, যে যে ছাত্র তাঁহার সঙ্গে ইংলণ্ড যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের যাতায়াত ব্যয় এবং তথায় থাকিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিখিবার ব্যয় সমস্তই তিনি দিতে প্রস্তুত আছেন। বর্ত্তমান কালেরও 'কালাপানি' পার হইলে জাতিনাশের ভয়ে যখন ভারতবাসীগণ পশ্চাৎপদ হয়েন, তখন সেই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন সবেমাত্র জ্ঞানালোকে

আমাদিগের চক্ষু পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, সে সময়ে ছাত্রদিগের 'কালাপানি' পার হইতে যাওয়া সম্ভব নহে। ডাক্তার গুডিভ এবং দ্বারকানাথ উভয়েই হতাশ হইতেছিলেন যে কেহ বুঝি আর অগ্রসর হয় না। অবশেষে 'তুইটা বালক তাঁহার সঙ্গী হইবার জন্য অগ্রসর হইল।' এই তুইটা বালকের নাম ভোলানাথ বসু এবং গোপালচন্দ্র শীল চক্রবর্ত্তী। গবর্ণমেণ্টও দ্বারকানাথের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া দ্বারকানাথের সঙ্গী আরও তুইটি ছাত্রের ভার লইতে স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের নাম সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী এবং দ্বারকানাথ বসু। চারিটি ছাত্র ডাক্তার গুডিভের তত্ত্বাবধানে দ্বারকানাথের সঙ্গে ইংলণ্ড গিয়া সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ইংরাজ ছাত্রগণকে চমকিত করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ নিজেও যেমন একভাবে মহাসম্মানের উপর তাঁহার ইংলণ্ডবাস কাটাইয়াছিলেন, তেমনি তিনি যে সকল ছাত্রকে বিলাতে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাও সচ্চরিত্র, বিদ্যাবল প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণে বিলাতের ছাত্র মহলে ভারতীয় মর্য্যাদা বর্দ্ধিতই করিয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার হেনরি গুডিভ তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন যে তুই শতের অধিক ইংরাজ ছাত্রগণের মধ্যে তুইজন ব্যতীত আর কেহই উপরোক্ত ছাত্রগণের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন নাই। এক ভোলানাথ বসু তিনটি বিষয়ে সুবর্ণপদক পাইয়া সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। সূর্য্যকুমার পরিশেষে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ডাক্তার গুডিভের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী হইলেন। সকল ছাত্রেরই সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে ডাক্তার গুডিভ ভূয়োভূয় সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। সূর্য্যকুমারকে গবর্ণমেণ্ট ১৫০০ টাকা অতিরিক্ত দিয়াছিলেন। অন্যান্য ছাত্রগণের প্রত্যেকের খরচ পড়িয়াছিল প্রায় ৮০০০ টাকা, তাহাতেই তাঁহারা ভদ্রভাবে কাটাইয়া সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিলেন, আর আজকাল পনেরো হাজার হইতে ৩০ হাজার পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়াও সেরূপ শ্রেষ্ঠতালাভ করিতে পারেন না—ইহার কারণ অপব্যয় ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পি এণ্ড কোম্পানী প্রতিষ্ঠা

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবন আমরা যতই পর্য্যালোচনা করি, ততই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার গভীরতা দেখিয়া স্তম্ভিত হই। ইহার কারণ এই যে, তিনি তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন—স্বাধীনতা ও পরোপকার। স্বাধীনতার একটি প্রধান সহায় অর্থ এবং অর্থের মূল বাণিজ্য। তাই সর্ব্বপ্রথম দেশে বাণিজ্যের যাহা যাহা প্রধান অঙ্গ ছিল, সে সকলই অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই বাণিজ্যের প্রধান অঙ্গই ছিল বিলাতের সহিত আদান প্রদান। এই ভারতবর্ষের একস্থানের উৎপন্ন দ্রব্য অপরস্থানে পাঠাইয়া অর্থ-সংগ্রহের যতটুকু বাণিজ্য আবশ্যক, তাহা করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইতে পারে নাই। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া জানিতেন, তাই ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সম্পূর্ণ বিদেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভারতকে পুনরায় সোনার ভারত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের ধান্য পশ্চিমে বিক্রয় করা এবং পশ্চিমের গোধুম বঙ্গদেশে বিক্রয় করা তাঁহার বৃহৎ কল্পনার নিকট মুদির কারবার বলিয়া প্রতীত হইত। তাই তিনি বাল্যকালাবধি ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য সংস্থাপনের অভিলাষী ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এরূপ বাণিজ্যের একটি প্রধান উপকরণ ষ্টীমার বা বাষ্পীয় পোত। আমরা দেখি যে তিনি সর্ব্বপ্রথম জাহাজটানা ষ্টীমার কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা; তিনি অন্তর্বাণিজ্যের সহায়তার জন্য ইণ্ডিয়া জেনেরল ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর প্রস্তাব করিয়া পরিকল্পনা দিয়াছিলেন; জাহাজ মেরামতী কার্য্যের জন্য সর্ব্বপ্রথম পাটোয়ারি (ডকিং বিজ্‌নেস্) কার্য্য খুলিয়াছিলেন; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কয়লার খনির কার্য্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। বহির্বাণিজ্যের সম্বন্ধেও

তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে ষ্টীমার থাকিলে এ বিষয়ে যেমন উন্নতি হইবে, এমন আর কিছুতে নহে। তিনি ইহার জন্য অবসর খুঁজিতেছিলেন। পূর্ব্বে পালওয়ালা জাহাজে করিয়া এদেশের মাল ছয় মাসের কমে পৌঁছিত না। তাহার উপর উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাইবার কালে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত হইতে জাহাজ ডুবিবার অত্যন্ত ভয় ছিল। সম্ভবত এরূপ বিলম্বে এবং এই সকল বিপদের সম্ভাবনায় তাঁহাকে সময়ে সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেও হইয়াছিল। যাহাই হৌক্ তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে ইংরাজ যখন আমাদের রাজা হইলেন, তখন ইংরাজদিগেরই সহায়তায় ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য করিয়া স্বদেশের ধন বৃদ্ধি করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও যুক্তি সঙ্গত এবং সেই মাল প্রভৃতি যত শীঘ্র ইংলণ্ডে যাতায়াত করিতে পারিবে, ইংলণ্ডের সহিত যত শীঘ্র পত্র ব্যবহার প্রভৃতি চলিতে পারিবে, ততই দেশের শান্তি স্থায়ী হইবে, বাণিজ্য বিস্তৃত হইবে এবং স্বদেশের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইবে।

তিনি যে অবসর খুঁজিতেছিলেন, সেই অবসর আসিয়াছিল ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক মহোদয় এ বিষয়ের জন্য যথেষ্ট চিন্তা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের হস্তে কতকটা অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে যে কোন ষ্টীমার সত্তর দিনে পৌঁছিতে পারিবে, তাহার অধিকারীকে উক্ত অর্থ হইতে পুরস্কার দেওয়া হইবে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন জনসন তাঁহার "এনটার প্রাইজ" ষ্টীমার চালাইয়া এই পুরস্কার গ্রহণে উদ্যত হইলেন। কলিকাতায় আসিতে পূর্ব্বে ১১৩ দিন লাগিয়াছিল। এই কারণে উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া অধিকতর সত্বর আসিবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিতে হইল। অবশেষে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ইউফ্রেটিস এবং পারস্য উপসাগর হইয়া পথ খোলা যায় কি না দেখিবার জন্য কর্ণেল চেকনীকে প্রেরণ করিলেন। ইহার বাধা সকল অলঙ্ঘনীয় বলিয়া এই পথও পরিত্যাগ করিতে হইল। অবশেষে লোহিত সাগর দিয়া কোন পথ করা যাইতে

পারে কিনা তদ্বিষয়ে পরীক্ষাই বাকী রহিল। লর্ড বেন্টিঙ্কের আদেশে ইউলিসিস নামক এক জাহাজ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ২০শে মার্চ্চ তারিখে ডাক লইয়া বোম্বাই ছাড়িয়া এক মাসে সুয়েজ বন্দরে উপনীত হইল। আরও তিনবার যাতায়াতের পর বুঝা গেল যে উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিলে বোম্বাই হইতে ইংলণ্ডে ৫৫ দিনে পৌঁছান যায়। ইহার কাপ্তেন ছিল লেফটেনাণ্ট ওয়াভহর্ণ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ব্যয় বাহুল্য কারণে বেন্টিঙ্কের অনেক অনুরোধের পরও ইউলিসিস জাহাজে ডাক প্রেরণ করা স্পষ্ট করিয়া বারণ করিলেন। অবশেষে এই বিষয় পার্লামেণ্ট সভায় উঠিয়া উক্ত জাহাজেই ডাক পাঠান স্থির হইল, কিন্তু ডিরেক্টরগণের বিরোধিতাবশত উহা আর কার্য্যে পরিণত হইল না।

দ্বারকানাথ ঠাকুর এদিকে এই পথ দিয়া যাতায়াতের জন্য একটি ষ্টীমার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, এই পথই পরিণামে এক মাত্র পথ দাঁড়াইবে। Charls Becket, Green Law, Captain James Barber, M. A. Curtis এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বঙ্গ, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ, এই তিন প্রেসিডেন্সির প্রতিনিধি লইয়া লণ্ডন নগরে এক অস্থায়ী কমিটি বসিল এবং এদেশ হইতেও দরখাস্ত পড়িতে লাগিল। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক তখন এদেশ হইতে ফিরিয়া গিয়াছেন—তিনিও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিলেন। এই কমিটির প্রতিনিধি স্বরূপে কয়েকজন সভ্য ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের এই বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য রাজস্ব সচিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। অপরদিকে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতির সহিত পার্লামেণ্টের সভ্য এবং লণ্ডনস্থ বণিকগণের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহারও সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণও এ বিষয়ে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন। কলিকাতার কমিটি বিলাতের কমিটিকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে

চাহিলে অর্দ্ধপথে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না—ইহাকে শেষ পর্য্যন্ত সম্ভবত ভাল করিয়া করিতে হইবে।

লণ্ডনস্থ কমিটি ডিরেক্টরগণের নিকটে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার স্থূল কথা এই—(ক) ইংলণ্ড হইতে মাল্টা পর্য্যন্ত একটা জাহাজ চলুক, মাল্টা হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত দ্বিতীয় জাহাজ হউক; (খ) আলেকজান্দ্রিয়া হইতে সুয়েজ বন্দর পর্য্যন্ত যাত্রী ও মাল চালানের ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লইবে। (গ) তিনখানি ষ্টীমার ইংলণ্ড হইতে মাল্টার জন্য, চারখানি ষ্টীমার সুয়েজ বন্দর হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত এবং দুইখানি ষ্টীমার মাল্টা হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিবে। মাল্টাকে ইংলণ্ড হইতে আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী আড্ডা করিবার কারণ এই যে, অন্তত ইংলণ্ড হইতে মাল্টা পর্য্যন্ত জাহাজগুলি quarantine আইনের মধ্যে না পড়িয়া যায়। (ঘ) এই ব্যবস্থা দাঁড় করাইতে মোট খরচ পড়িবে ২০ লক্ষ টাকা। (ঙ) বাৎসরিক খরচ আন্দাজ ১২ লক্ষ টাকা পড়িবে। (চ) প্রথম আরম্ভকালে অবশ্যই আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইবেই এবং সেই কারণে গবর্ণমেণ্টের কাছে বাৎসরিক সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা তাঁহাদের এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক পাঠাইবার জন্য প্রত্যাশা করা গেল। সাধারণের চিঠিপত্র ভারত হইতে বিলাতে পাঠাইবার মাশুলাদি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরই থাকিবে। (ছ) প্রতিমাসের প্রথম তারিখে এক একটি ষ্টীমার বোম্বাই ছাড়িয়া ইংলণ্ডে ডাক পৌঁছিবে ৫৫ দিনে—বৎসরের মধ্যে আর বিরাম পড়িবে না।

এই প্রস্তাব অবশ্য আরও বিস্তৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার টারটন সাহেব এই সম্পর্কে বিলাতে প্রেরিত হইয়া লণ্ডন কমিটির সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইহার যে সুদূর ফল কি তাহা অনেকে বুঝিতে না পারাতে প্রথম প্রথম বাধারাশি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

এই সকল আন্দোলনের যে ফল হয় নাই তাহা নহে। পেনিন্সুলার এণ্ড ওরিয়েণ্টাল কোম্পানী (সংক্ষেপে যাহাকে

পি এণ্ড ও কোম্পানী বলা যায়) সর্বপ্রথম স্পেন ও পর্টুগালের বন্দর পর্য্যন্ত জাহাজ চালাইবার অধিকার লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় সনন্দ অনুসারে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত ইহার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল।

এই কোম্পানীর প্রিকার্সার নামক প্রথম ষ্টীমার ভারতে আসিবার সংবাদ পাই। এই ষ্টীমারকে কার্য্যের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিতে তিনলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই টাকা চাঁদা করিয়া ইউনিয়ন ও আগ্রা ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ করিয়া উঠান হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ এই ষ্টীমারের জন্য ব্যয় হইয়াছিল সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। তখন কোম্পানীর প্রত্যেক অংশের মূল্য ৫০০ টাকা—অথচ এই ষ্টীমারের ব্যয় সংকুলান করিবার জন্য অংশ কিনিবার লোক পাওয়া যাইতেছিল না। যখন উপরোক্ত ব্যাঙ্কদ্বয়ের ঋণ পরিশোধের কথা হইল, তখন কোম্পানী নিজেদের অংশ দ্বারা সেই ঋণ শোধের প্রস্তাব করিয়াছিলেন—কোম্পানীর হাতে তখন লক্ষ টাকাও ছিল কিনা সন্দেহ। অবশেষে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই চাঁদাদাতাদিগের সভায় তাঁহাদের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির উপর এই তিন লক্ষ টাকা উদ্ধারের উপায় স্থির করা বিষয়ে সম্পূর্ণ ভার প্রদত্ত হইল। কমিটি আবার বিলাতস্থ চার জন সভ্যের উপর সম্পূর্ণ ভার দিলেন—ডিকেন্স, নিউ কামেন, সি. লায়াল এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বারকানাথ এই সময়ে বিলাতে ছিলেন। প্রিকার্সার আসিবে কিনা নিশ্চয় না থাকাতে বিভিন্ন আড্ডায় যে কয়লা ছিল, তাহা ইণ্ডিয়া জাহাজের জন্য বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক দ্বারকানাথ ঠাকুর পি এণ্ড ও কোম্পানীর অংশীদার হইবার এই অবসর ত্যাগ করেন নাই। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক অংশ কিনিয়া প্রধানতম অংশীদার হইয়া কোম্পানীকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছিলেন।

আমরা দেখি যে এই পি এণ্ড ও কোম্পানীর ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে সুয়েজ বন্দর হইয়া ষ্টীমার যাতায়াতের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে চার্লস বেকেট গ্রীণল এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর সর্ব্বপ্রথম আসন অধিকার

করেন। কলিকাতা রিভিউর এক সংখ্যায় দেখিয়াছিলাম যে দ্বারকানাথের নিজের জাহাজ ছিল এবং সেই জাহাজের নাম ছিল "দ্বারকানাথ"; তিনি সেই ষ্টীমারে নাকি প্রথমবার বিলাত গমন করিয়াছিলেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী কলিকাতার অধিবাসীদিগের এক সভায় 'গ্রীনল'কে ইংলণ্ডে ও ভারতের ষ্টীমার দ্বারা সংযোগ সাধনে তাঁহার পরিশ্রমের জন্য কি স্মৃতিচিহ্ন দেওয়া হইবে তদ্বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। উক্ত সভায় সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী জর্জ্জ টমসন তাঁহার বক্তৃতায় ইংলণ্ড ও ভারতের অধিবাসীদিগকে একত্র আনয়ন করিবার পক্ষে দ্বারকানাথকে বাষ্পের ক্ষমতার জীবন্ত সাক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।

যে পি এণ্ড ও কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন একজন বঙ্গবাসী, আজ সেই কোম্পানীর ষ্টীমার সমূহ ইংলণ্ডের সামরিক ষ্টীমারের ঠিক পরেই ক্ষমতাবান্—বর্ত্তমান এই কোম্পানী ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষমতার এক প্রধান সহায়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইহার ৬০ খানি ষ্টীমার ছিল—তাহার ধারণ শক্তি সর্ব্বশুদ্ধ একলক্ষ টন এবং তাহাদের চলিবার শক্তি মোটের উপর কুড়ি হাজার ঘোটকের সমান। এই সকল ষ্টীমার আজ, কোথায় অষ্ট্রেলিয়া, কোথায় জাপান, পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া ফেলিয়াছে। কোথায় ৫৫ দিনে কলিকাতা হইতে লণ্ডনে ডাক প্রেরণ এক সময়ে কতকটা অসম্ভব ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইত, আর আজ ডাক যায় ১৭ দিনে। এই কোম্পানীরই ষ্টীমার সমূহই ইংলণ্ডের সাগরাধীশ্বর নামের যথার্থ সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বেণ্টিঙ্কের বিদায়কালীন অভিনন্দন

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মার্চমাসে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক পদত্যাগ পূর্ব্বক বিলাত যাত্রা করেন। বেণ্টিঙ্ক নিয়মিত রূপে কাজ চাহিতেন—তাঁহার নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া প্রশংসা পাওয়া যাইত না—তিনি নিজেও যেমন পরিশ্রম করিতেন, তেমনি কর্ম্মচারীগণের নিকট হইতেও কড়ায় গণ্ডায় পরিশ্রম আদায় করিবার কারণে যেমন তিনি দেশীয়গণের গভীর শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার স্বদেশীয়গণের মধ্যে নিন্দুকগণের নিকট হইতে নিন্দালাভও ঘটিয়াছিল।

কোন্ কোন্ কার্য্যের জন্য তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এই স্থলে সংক্ষেপে সেইগুলি উল্লেখ করিব।

তিনি প্রথম ভারতে পদার্পণ করিয়াই দেখেন যে প্রায় কোটী টাকা দেনা। তখন তিনি কমিশন বসাইয়া যে সকল অন্যায় খরচ হইত, তাহা উঠাইয়া দিতে লাগিলেন। অহিফেন বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারীর বেতন বাড়িতে বাড়িতে বৎসরে পঁচাত্তর হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। তাহা এবং আরও অন্যান্য কর্ম্মচারীর বেতন অযথা বর্দ্ধিত ছিল, সেই সকল বেতনের হার কমাইয়া দিলেন। একদিকে ব্যয় সংক্ষেপ, অপরদিকে রাজস্বের সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি নানা উপায়ে গবর্ণমেণ্টের আয় এতটা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার সাত বৎসর শাসনকালের শেষে প্রায় দেড়কোটী টাকা উদ্বৃত্ত দেখাইতে পারিয়াছিলেন। তিনি ব্যয় সংক্ষেপের জন্য পূর্ত্তবিভাগের অনেক কার্য্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন ইংরাজ লেখক তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন। আমরা কিন্তু বিবেচনা করি যে ইহাতে ভারতবাসীরই উপকার সাধিত হইয়াছিল। যদি পূর্ত্তবিভাগের কাজ সমান তেজে

১২

চলিত, তাহা হইলে ভারতবাসীর অদৃষ্টে হয়তো কোন নূতন করভার পড়িত।

বেন্টিঙ্ক উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জন্য প্রধান আদালতের প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং এলাহাবাদে রেভেনিউ বোর্ড সংস্থাপিত করিয়া তদ্দেশের প্রজাগণের যে কি উপকার করা হইয়াছে, তাহা একমুখে বলা যায় না। পূর্ব্বে সামান্য আপীলের জন্য দিল্লী হইতে শত শত ক্রোশ এবং তৎসঙ্গে নানা বিঘ্নরাশি অতিক্রম করিয়া কলিকাতায় আসিতে হইত। সকলের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না, সুতরাং সাধারণের সুবিচার লাভের আশাও সুদূর পরাহত ছিল।

কতকগুলি কার্য্যের জন্য বেন্টিকের স্মৃতি দেশীয়দিগের হৃদয়ে চিরপূজা প্রাপ্ত হইবে। তন্মধ্যে দেশীয়দিগকে উচ্চপদে নিয়োগ একটি প্রধান। লর্ড কর্ণওয়ালিস বিবেচনা করিতেন যে দেশীয়দিগের সহায়তায় ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ উৎকোচ প্রভৃতি গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবেন না এবং তৎসঙ্গে ইহাও ভাবিতেন দেশীয়গণ রাজকার্য্যের পক্ষে অনুপযুক্ত, সেই কারণে তিনি কোন দেশীয় ব্যক্তিকে রাজকর্ম্মে নিয়োগ করিতে নিষেধবিধি প্রচার করিয়াছিলেন। বহুবৎসর বাদে লর্ড বেন্টিঙ্ক তাহা রহিত করিয়া ভারতীয়দের ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর সহকারী হইবার অধিকার দিলেন। ডিরেক্টরগণ বহুপূর্ব্বাবধিই বুঝিয়াছিলেন যে সুবিচার প্রদান করিবার আশা করিলে দেশীয় কর্ম্মচারী রাখা আবশ্যক। বেন্টিঙ্কেরও হৃদয়ে বরাবর "দেশীয়দিগেরও জন্য রাজকীয় সম্মান ও পুরস্কারের দ্বার-সকল উন্মুক্ত করিয়া দিবার" অভিলাষ জাগ্রত ছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে দেশীয়দিগের অধিকার ঘোষণা করিয়া তাঁহার সেই অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিলেন।

দ্বিতীয়, সতীদাহ নিবারণ। এই বিষয় সবিস্তার ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বেন্টিঙ্কের মত স্বাধীনচেতা, ধর্ম্মভীরু ও নির্ভীক হৃদয় গবর্ণরজেনারেলের সহায়তা না পাইলে ইহা নিবারিত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ।

তৃতীয়, দেশীয় খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে কর্ম্মে নিয়োগ করিবার

অধিকার প্রদান। ইহার পূর্ব্বে বিদ্রোহ প্রভৃতির আশঙ্কায় যে সকল দেশীয় ব্যক্তি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন, তাঁহাদিগকে কোন প্রকার রাজকর্ম্মে এমন কি কোন প্রকার কেরাণীরও কর্ম্মে নিয়োগ করা হইত না। ইহার অন্যায্যতা সম্বন্ধে বোধ হয় অধিক বাক্যব্যয় অনাবশ্যক। বেণ্টিঙ্ক নেটিভ খৃষ্টানদিগের উন্নতির সেই মহান বাধা অপসারিত করিয়া দিলেন। সতীদাহ নিবারণের কারণে যাঁহারা ঘোর আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বেণ্টিঙ্কের এই কার্য্যের জন্য তাঁহার উদারতা ও মহত্ত্বের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

চতুর্থ, ঠগী নিবারণ। যাঁহারা ঠগী কাহিনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে এই কার্য্যে বেণ্টিঙ্ক কিরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। ঠগীদিগের হস্তে কাহারও নিস্তার ছিল না। তীর্থ যাত্রী প্রভৃতি সকল প্রকার পথিকেরই এই সুগঠিত হত্যাকারীর সম্প্রদায়ের হস্তে এক প্রকার প্রাণ সমর্পণ করিয়া থাকিতে হইত—কখন্ কে যে ভবলীলা সম্বরণ করেন, তাহা কেহই বলিতে পারিত না। কত ঠগী পথিকদিগের সঙ্গে ছদ্ম বেশে পরিভ্রমণ করিত। রাজপথের ধারে বিশ্রামাগারের মুদিগণও অনেক সময়ে ঠগী সম্প্রদায়ভুক্ত হইত। ইহার উপর জমিদার, স্বাধীন রাজগণ প্রভৃতিও ঠগীদিগের নিকটে উৎকোচ প্রাপ্ত হইয়া কেবল তাহাদিগের সহায়তা করিতেন তাহা নহে, অনেক সময়ে তাহাদিগকে নিজরাজ্যে আশ্রয় দিয়া বিচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেন। এ অবস্থায় যে বেণ্টিঙ্কের পক্ষে ঠগী নিবারণ যে কতদূর দুরূহ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

পঞ্চম, ষ্টীমার প্রভৃতির সাহায্যে অন্তর্বাণিজ্যের সহায়তা করা। বলিতে গেলে রেলওয়ে খুলিবার পূর্ব্বে বেণ্টিঙ্কই কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ষ্টীমার শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড সরল করিয়া দিয়া লোকের যাতায়াত এবং সুতরাং অন্তর্বাণিজ্যের উন্নতিও অত্যন্ত সুগম করিয়া দিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ, ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা। হিন্দু কলেজের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিলে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে বেণ্টিঙ্কের আমলেই ইংরাজী

ভাষার বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে কিনা, এই বিষয় লইয়া গবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগীয় কর্ম্মচারীগণের মধ্যে বিবাদ একেবারে উচ্চ সীমায় উঠিয়া ছিল। অবশেষে বেন্টিঙ্কই ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া বিদ্যালয়সমূহে তাহারই অনুমোদনে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সেই বিবাদ ভঞ্জন করিয়াদিলেন। আজ যে ভারতবর্ষ নিজের মঙ্গল, নিজের অধিকার, নিজের একতা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে, এ সকলই সেই ইংরাজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠার ফল, ইহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

সপ্তম, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা। যদিও বেন্টিঙ্কের পদত্যাগের কয়েক মাস পরে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু ইহার আয়োজন এবং ইহার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে গবর্ণর জেনেরলের অনুমোদন ও সম্মতি গ্রহণ সকলই বেন্টিঙ্কের শাসনকালে তাহারই উদ্যোগে ও চেষ্টায় সম্পন্ন হইয়াছিল।

অষ্টম, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে বন্ধন ঘনিষ্টতর হইবার সূত্রপাত করা। সুয়েজবন্দরের পথ দিয়া যে অল্প দিনে উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াত সংঘটিত হইতে পারে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্তে পরিণত করা বেন্টিঙ্কের আমলেই ঘটিয়াছিল।

মনুষ্য সর্ব্বকালেই মনুষ্য থাকিবে—দোষগুণে জড়িত মনুষ্য থাকিবে। দোষ না থাকিলে মনুষ্য আর মনুষ্য থাকিতে পারে না, দেবতার স্থান অধিকার করিত। বেন্টিঙ্কও যে একেবারে দোষ শূন্য ছিলেন তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার হৃদয় উপযুক্ত সীমার মধ্যে স্বাধীনতার ভাবে যেমন নিমগ্ন ছিল, তেমনি তিনি সেই প্রকার স্বাধীনতার বীজ ভারতে রোপণ করিবার অভিলাষ পোষণ করিয়া গবর্ণর জেনেরলের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অভিলাষের ফলে তাঁহাকে একটু অন্যায়ের পথে দুএকবার অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। হিন্দু অথবা মুসলমান ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তাঁহার পূর্ব্বে সে ব্যক্তি পৈতৃক উত্তরাধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইত। বেন্টিঙ্ক দেখিলেন যে ইহা অন্যায় এবং তিনি উঠাইয়া

দিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন। কিন্তু এ বিষয়ে হিন্দুমুসলমানের এতদূর একতা ছিল যে বেন্টিঙ্কও প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া এই বিষয়ক নিয়ম সমুহ উঠাইয়া দিতে সাহস করেন নাই। অবশেষে বিভিন্ন আইনের সংশোধন সূত্রে তিনি উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় আইনের মধ্যে লুকাইয়া চুরাইয়া এই ভাবের কথা বসাইয়া দিলেন যে "এই আইন প্রযুক্ত হইবার কালে যাঁহারা হিন্দু বা মুসলমান থাকিবে, তাঁহাদিগের পক্ষে হিন্দু ও মুসলমান উত্তরাধিকারের আইন খাটিবে।" ইহার অর্থ যে উত্তরাধিকারী হইবার পর অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আর উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না। দেশীয়গণ ইহার ফল সে সময়ে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না,—যখন বুঝিলেন, তখন এ বিষয়ে আন্দোলনেরও আর সময় রহিল না। এইটি লুকাইয়া চুরাইয়া করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল কিনা, তাহা গবর্ণর জেনেরলেই বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে এ বিষয়ে কতটুকু দোষ দিতে পারি তাহা বলিতে পারি না।

তাঁহার দ্বিতীয় দোষ লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার মুল পত্তন করা। তাঁহার পুর্ব্বে লর্ড কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে রেগুলেশণ অনুসারে কোন লাখেরাজ বে-আইনী প্রমাণিত হইলে তবে তাহার উপর কর ধার্য্য হইত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইহার উপর আরও জোরের আইন পাস হইল—তাহাতে কালেক্টর বে-আইনী বুঝিলেই লাখেরাজ দখল করিতে পারিতেন, জমিদারকে উচ্চ আদালতে আপীল করিতে হইত। ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ ভাবিতেন যে কতকগুলি জমিদার রাজত্বের সমুদয় সুখ ভোগ করিবে অথচ তাহার জন্য রাজস্বের একটি কানাকড়িও দিবে না, ইহা বড় অন্যায়। আবহমানকাল এই লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার ইচ্ছা তাই ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং ডিরেক্টরগণ, সকলেরই মধ্যে প্রবল ছিল। বেন্টিঙ্কও বোধ হয় এই দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই সকল বাজেয়াপ্তী মহল হইতে বাৎসরিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা আসিতে লাগিল এবং ইহার বন্দোবস্ত-কার্য্যে ৮০ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল।

যাহাই হৌক্ চন্দ্রের সুখকর কিরণের গুণে যেমন একটি কলঙ্ক

চিহ্নও আবৃত হইয়া যায়, সেইরূপ বেণ্টিঙ্কের শাসন কালের উপরোক্ত দুইটি কলঙ্ক ধরাই যাইতে পারে না। বেণ্টিঙ্ক যখন বিলাত যাত্রা করেন, সেই সময়ে কি ইংরাজ, কি ভারতবাসী সকলে একবাক্যে তাঁহার গুণগানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সামরিক বিভাগে অর্দ্ধবাট্টা প্রবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হওয়ায় বেণ্টিঙ্ককে প্রথমে ইংরাজদিগের নিকটে অনেক নিন্দা ও অপমানও সহ্য করিতে হইয়াছিল। এ-সকল সত্ত্বেও ইংরাজগণ তাঁহার বিদায়কালে এদেশীয়দিগের সহিত একস্বরে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক জাতি আপনাদিগের মধ্যে সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর হিন্দুজাতির মুখপাত্র হইয়া সংস্কৃত কলেজের বৃহৎ গৃহে সভা আহ্বান করিলেন। তথায় বেণ্টিঙ্ককে জাতীয় আশীর্ব্বাদ ব্যঞ্জক এক অভিনন্দন পত্র দেওয়া স্থির হইল। সেই অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইলে বেণ্টিঙ্ক তাঁহার একটি সুন্দর উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার অংশ নীচে উদ্ধৃত হইল।

"You alone can accurately judge of the effects of our administration. You can best decide upon its failure or success, and your gratifying testimony upon this occasion encourages me to hope that we have not last sight of the great end and purposes of British Government in India, as laid down for our guidance by the Legislature and the Home authorities, and so eloquently and justly described in your address to be these—'To establish a community of feeling and interest between races separated by almost every conceivable circumstances of alienation. To effare all distinction between conquerors and conquered; and to make all in heart and mind, in hopes and aspirations, one with Englishmen'

It is the consumnation of this great truth that is to be devoutly to be prayed for. The foundation once solidly laid, the greatness and honour of Britain, the happiness, prosperity, and independence of India can never be impaired. But it would ill become me in my position to conceal the unpleasant fact that, during my course, I have seen too much of this conqueror's spirit, of the pride of domination, of the abuse of power, and of the too general oppression of the strong over the weak, to be able to pronounce that this wished for time is arrived. This evils still require the strong hand of authority to put them down, the establishment of a more simple code of laws, and what is of greater importance, a more efficacious administration of them.."

এইরূপ দেশীয় কর্ত্তৃক অভিনন্দন দেওয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। সতীদাহের সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহনকে লইয়া অভিনন্দন দিয়াছিলেন। এই অভিনন্দন দ্বিতীয়।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি দেশীয় বিদেশীয় সকলেই চাঁদা দিয়া প্রস্তুত করাইয়াছিল। তাহার ভিত্তি প্রস্তরে মেকলের লেখনী প্রসূত যে গুণবাদ খোদিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে আমরা উপসংহার করিব।

"This statue is erected to William Cavendish Bentinck, who during seven years ruled India with eminent prudence, integrity and benevolence ; who, placed at the head of a great empire, never laid aside the simplicity and moderation of a private citizen ; who infused into oriental despotism the spirit of

British freedom; who never forgot that the end of Government is the welfare of the Governed; who abolished cruel rites, who effaced humiliating distinctions; who allowed liberty to the expression of public opinion; whose constant study it was elevate the moral and intellectual character of the Government committed to his charge;—this monument was erected by men who, differing from each other in race, in manners, in language, and in religion, cherish, with equal veneration and gratitude, the memory of his wise, upright and paternal administration."

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পশ্চিম ভ্রমণ

বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার পর এদিকে বেণ্টিঙ্ক মহোদয় স্বদেশে প্রস্থান করিলেন, আর দ্বারকানাথও তীর্থযাত্রার উদ্দেশে কলিকাতা হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার তীর্থভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে নানা স্থানে তীর্থদর্শনের সঙ্গে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সর্ব্ববিধ অবস্থা বুঝিয়া আসিবেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর ডাকের গাড়ীর সাহায্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের তীর্থদর্শনে বহির্গত হইলেন। সঙ্গে মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্রদের অন্যতম এবং তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক দ্বারকানাথ গুপ্ত চলিলেন। ইনিই পরে ডি. গুপ্ত নাম ধারণ করিয়া জ্বর-রোগের ধন্বন্তরি ঔষধ প্রচার করিয়াছিলেন।

তিনি কাশী, প্রয়াগ, আগ্রা ও মথুরা দর্শন করিলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মন্দির ও মসজীদ প্রভৃতির কারুকার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তখনও সেই সকল কারুকার্য্য সিপাহীবিদ্রোহের যুদ্ধজাত সংঘর্ষে এবং দস্যুদিগের হস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। আগ্রাতে তাজমহল দেখিয়া নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন এলাহাবাদ অঞ্চলে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার মাতার দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটিল। "১৭৫৭ শকে দিদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন আমার পিতা এলাহাবাদ অঞ্চলে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন। বৈদ্য আসিয়া কহিল, 'রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না।' অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ীর বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁহার মত নাই। তিনি বলিলেন যে, 'যদি দ্বারকানাথ বাড়ীতে থাকিত, তবে তোরা

কখনই আমাকে লইয়া যাইতে পারতিস নে।' কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না। তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল। তখন তিনি কহিলেন, 'তোরা যেমন আমার কথা না শুনে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে গেলি, তেমনি আমি তোরদের সকলকে খুব কষ্ট দিব, আমি শীঘ্র মরিব না।' গঙ্গাতীরে লইয়া একটি খোলার চালাতে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে তিনি তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন।"...

"রাত্রি প্রভাত হইলে দিদিমাকে দেখিবার জন্য আবার গঙ্গাতীরে যাই। তখন তাঁহার শ্বাস হইয়াছে। সকলে ধরাধরি করিয়া দিদিমাকে গঙ্গার গর্ভে নামাইয়াছে, এবং উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে 'গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম' নাম ডাকিতেছে। দিদিমার মৃত্যু হইল। আমি নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, তাঁহার হস্ত বক্ষঃস্থলে, এবং অনামিকা অঙ্গুলিটি উৰ্দ্ধমুখে আছে। তিনি 'হরিবোল' বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরলোকে চলিয়া গেলেন।

"মহাসমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল। আমরা তৈল হরিদ্রা মাখিয়া শ্রাদ্ধের বৃষকাষ্ঠ গঙ্গাতীরে পুঁতিয়া আসিলাম। এই কয়দিন খুব গোলযোগে কাটিয়া গেল।"[১]

দ্বারকানাথ তাঁহার মাতার মৃত্যুর সংবাদ খুব সম্ভবত মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রাপ্ত হন নাই। সম্ভবত মৃত্যুর পর সংবাদ পাইয়া বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ মথুরা ও বৃন্দাবন দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাস্থল বলিয়া বৈষ্ণবদিগের পরমতীর্থ। বলা বাহুল্য দ্বারকানাথ ব্রাহ্মসমাজের দলভুক্ত হইলেও অন্তরে বৈষ্ণবভাব সকল তখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বৃন্দাবনে গিয়া দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইলেন। তমাল কুঞ্জের নিম্নে চোবে ব্রাহ্মণগণ পরম পরিতোষের সহিত প্রত্যেকে ভাং খাইয়া ক্ষুধার উদ্রেক করিয়া তিন চার সের করিয়া মেঠাই পুরী আহার করিলেন এবং যাইবার কালে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে আশীর্ব্বাদ

[১] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিয়া যাইতে লাগিলেন। আমরা শুনিয়াছি যে বৃন্দাবনে কেশীঘাটের কাছে দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এক অন্নচ্ছত্র আছে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন আগ্রায় কেল্লা দেখিতে যান, তখন কতকগুলি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী আইরিস সৈন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজেদের দুঃখ জানাইল যে তাহাদের গির্জ্জার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন সাহায্য না পাওয়াতে তাহা সংস্কারের অভাবে পতনোন্মুখ অবস্থায় আছে। দ্বারকানাথ অনুসন্ধানে তাহা সত্য জানিয়া গির্জা মেরামতের জন্য ৫০০৲ টাকা দিলেন।

দ্বারকানাথ তাঁহার এই ভ্রমণকালে তথাকার রাজস্ব বন্দোবস্ত, জমির কিরূপ জমা প্রভৃতি সকল বিষয় তন্নতন্ন অনুসন্ধান করিয়া আসিলেন।

সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা

দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত প্রতিভা কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। তিনি পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিয়াই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লইয়া পড়িলেন। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে লৌহ গরম থাকিতে থাকিতেই আঘাত করা উচিত। এই প্রবাদের অর্থ তাঁহার ন্যায় অপর কোন ভারতীয় সেকালে বুঝিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। লর্ড বেন্টিঙ্কের পর লর্ড অকলাণ্ড ভারতের গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্যে যোগ দিবার বিলম্ব থাকাতে গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সিলের সভাসদ সার চার্লস মেটকাফ সেই মধ্যবর্ত্তীকালের জন্য উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। দ্বারকানাথ যখন লর্ড বেন্টিঙ্কের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন, তখন বলাবাহুল্য যে তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁহার মত সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। মেটকাফ স্বাধীনতার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর বুঝিলেন যে মেটকাফ গবর্ণর জেনেরল থাকিতে থাকিতে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা প্রদায়ক আইন পাস করাইতে পারিলে এই উন্নতির যুগে সে স্বাধীনতা হরণ করা নিতান্ত সহজ হইবে না। তাই তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এইক্ষেত্রে আবার তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা ও দূরদর্শিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বঙ্গদেশ ও পশ্চিমাঞ্চল ঘুরিয়া আসিয়া বেশ বুঝিয়াছিলেন যে প্রজাদের অনেক দুঃখ গবর্ণমেণ্টের কাছে জানাইবার আছে কিন্তু সকল প্রজার সাধারণ দুঃখ যদি প্রজাদের প্রত্যেকে স্বয়ং গবর্ণমেণ্টের কাছে উপস্থিত করে, তবে তাহাকে সেই খরচ বহন করিতে হয়তো সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে, অথচ তাহার বিশেষ কোন ফল হইবে না। কিন্তু যদি সমবেত ভাবে

প্রজাগণ কোন দুঃখ গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করে, তবে তাহাদের সেই সমবেত ক্রন্দন গবর্ণমেণ্টের বধিরতা নষ্ট করিবেই। প্রজাগণের ক্রন্দন সমবেত ভাবে উপস্থিত করিতে গেলেই একটা সাধারণ সভা আবশ্যক। কিন্তু কেবল সভায় বিশেষ কিছু ফল হইবে না। প্রজাগণের সমবেদনা উদ্রেক করিবার জন্য সেই সভায় একটি সংবাদপত্ররূপ যন্ত্র চাই এবং সেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই। স্বাধীন সংবাদপত্র না থাকিলে, এক কথায়, সাধারণত মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা না থাকিলে রাজনৈতিক উন্নতির পথে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় না। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথমাবধি বুঝিয়াছিলেন যে ভারতের আর্থিক অবনতি দূর করিবার জন্য যেমন বাণিজ্য প্রধান সহায়, সেইরূপ রাজনৈতিক উন্নতি সাধনে সংবাদপত্র প্রধানতম সহায়—বলিতে গেলে স্বাধীন সংবাদপত্রই রাজনৈতিক উন্নতির প্রধানতম অবলম্বন। তাই দ্বারকানাথ অবসর বুঝিয়া একেবারে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য হস্তক্ষেপ করিলেন।

মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত ভারতীয় সংবাদ পত্রের নাম বেঙ্গল গেজেট। ইহা ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জানুয়ারী শনিবার প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদকের নাম জেম্‌স্‌ অগষ্টস্‌ হিকি। হিকি এক সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছাপাখানার প্রিণ্টার ছিলেন। ১৭৭৫-৬ খৃষ্টাব্দে একবার বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে অনেক টাকায় ঋণগ্রস্ত হইয়া কারাগার দর্শন করিতে হইয়াছিল। কারণ তাঁহার উত্তমর্ণেরা আংশিক পরিশোধ গ্রহণ করিবেন না। জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত দুই হাজার টাকা দিয়া একটা মুদ্রাযন্ত্র কিনিয়া সংবাদ পত্র প্রকাশরূপ অভিনব উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিয়া ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু হিকির অন্তরে সংবাদপত্রের মূল আদর্শ ছিল চিন্তায় স্বাধীনতা রক্ষা। তিনি তাঁহার কাগজে একবার লিখিয়াছিলেন যে, "যদিও দাসত্বের জন্য আমি জন্মগ্রহণ করি নাই, কিন্তু আত্মার স্বাধীনতা লাভের

জন্য শারীরিক দাসত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিতেও পশ্চাদপদ হইব না।"[১]

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম ডুয়েন নামক এক আইরিস 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড' নামক একখানি কাগজ প্রকাশ করিয়া অভদ্র ভাষার জন্য গবর্ণমেণ্টের কোপে পড়িলেন। ডুয়েন তাহা না জানিয়াও ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বরে Sir John Shore-এর কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পাইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। সে ভাবিল Breakfast এর নিমন্ত্রণ। সেখানে গিয়া বন্দী হইয়া বিলাতে প্রেরিত হন। (Saujal II, 115.) কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া ক্রমে ব্যক্তিগত কুৎসা ও গালাগালিতে সংবাদপত্রখানি পূর্ণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেন হেষ্টিংসের স্ত্রীর সম্বন্ধেও বক্রোক্তি করিয়া লিখিলেন যে স্ত্রৈণ হেষ্টিংসকে বলিয়া তিনি অনেক অন্যায় কার্য্যও করাইয়া লয়েন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর ওয়ারেন হেষ্টিংস হিকির সংবাদপত্র ডাকে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, ইহাতে তাঁহার গালাগালির মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। হেষ্টিংস সুপ্রীম কোর্টে তাঁহার নামে নালিস করিয়া তাঁহার কারাবাস ব্যতীত সাতহাজার টাকার ডিক্রী পাইলেন। ইহার ফলে ছাপাখানা প্রভৃতি হিকির যাবতীয় সম্পত্তি ক্রোক হইল, কাজেই ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে বেঙ্গল গেজেটের বিলোপ সাধিত হইল।

বেঙ্গল গেজেটের সময় ইণ্ডিয়া গেজেট প্রভৃতি আরও চার-পাঁচখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সকলগুলিই স্থানীয় সংবাদ ও কুৎসা লইয়া থাকিত। কাহারও লেখা উন্নত ধরনের ছিল না। গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম কর্ম্মচারীগণও সে লেখনীর মুখে বড় বাদ পড়িতেন না। অবশেষে টিপু সুলতান প্রভৃতি দোর্দণ্ড প্রতাপ রাজন্যবর্গের সহিত গবর্ণমেণ্ট যখন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের

১ I was not bred to a slavish life of hard work, yet I take a pleasure in enslaving my body in order to purchase freedom for my mind and soul.

স্বাধীনতা রোধক কতকগুলি আইন পাস হইল। তখন ইংরাজগণ ভাবিতেন যে সংবাদ পত্রের সংবাদ হইতে শত্রুপক্ষগণও কোন গুপ্ত সন্ধান পাইতে পারে। এমন কি, ভারতীয় বন্দরে জাহাজ সমূহের যাতায়াত পর্য্যন্ত সংবাদ পত্রে প্রকাশ করা বন্ধ হইল। এই বিধি অনুসারে প্রত্যেক প্রবন্ধই গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কর্ম্মচারীকে দেখাইয়া মুদ্রিত করিতে হইত। এই সময়ে ফরাসাজাতিরও ভারতে খুব প্রাধান্য। ক্রমে যখন অন্যান্য ইউরোপীয়জাতির প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়া গেল, তখন হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টেরও ভয় কমিয়া গেল। তথাপি ৩০ বৎসর এই স্বাধীনতারোধক আইনের প্রভাব অব্যাহত ছিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে এই নিয়মকে আরও কঠিন করা হইল।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আলোচনা চলিতে লাগিল। কিন্তু এখন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন যুক্তি দেখাইয়া স্বাধীনতা প্রদানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে উচ্চতম রাজ কর্ম্মচারীগণ রাজস্ব হইতে জাঁকজমক রক্ষা করিতেছেন, তাহা হইতেই প্রজাগণের হৃদয়ে একটা বিস্ময় ও ভীতি মিশ্রিত যে শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক হইয়া থাকে, তাহার উপরেই ইংরাজ রাজত্বের স্থায়িত্ব নির্ভর করে, মন্ত্রীগণের এই মত সত্ত্বেও লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড প্রবর্ত্তিত পরীক্ষা বিধি রহিত করিয়া দিলেন। তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছিলেন "that he was in the habit of regarding the freedom of publication as the natural right of his fellow subjects, to be narrowed only by special and urgent cause assigned. Further, it is salutary for supreme authority, even when its intentions are most pure, to look to the control of public opinion."

এই অভূতপূর্ব্ব মত প্রকাশে ডিরেক্টরগণের (India House) বড়ই ক্রোধ হইল এবং পরীক্ষার বিধি পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবার আদেশ করিয়া এক পত্র লিখিত হইল, কিন্তু তদানীন্তন মন্ত্রী ক্যানিং তাহা

আর অনুমোদন করিলেন না—ডিরেক্টরদিগকে তাহা ফেরত দেন নাই। তথাপি লর্ড হেষ্টিংস নিজ কৌন্সিলের সভ্যদিগের সম্মান রক্ষার জন্য বিশপ, জজ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে এবং যে সকল প্রবন্ধ সমাজের শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত করিতে পারে এরূপ প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিলে হয় নির্ব্বাসন অথবা সুপ্রাম কোর্টের বিচারে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা রাখিয়া দিলেন। কিন্তু সুপ্রীমকোর্টের কাছে এরূপ প্রথম দরখাস্তে কোর্ট ফৌজদারী বিধির মধ্যে তাহা আনিতে অস্বীকার করিল এবং লর্ড হেষ্টিংসও তাঁহার আমলে সম্পাদককে নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে অস্বীকার করিলেন।

হেষ্টিংস কর্ত্তৃক মুদ্রাযন্ত্রের এরূপ স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে নূতন নূতন কাগজ দেখা দিল। তন্মধ্যে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা জার্নাল' নামে এক কাগজ বাহির হয়। বকিংহাম নামে একজন ইংরাজ সম্পাদক এবং স্যাণ্ডফোর্ড আর্ণট নামক এক ইংরাজ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। সেকালের সম্পাদকপত্রের মধ্যে ইহা খুব উন্নত ধরনের কাগজ ছিল, ইহার পূর্ব্বে সংবাদপত্র সমূহ কেবল বিজ্ঞাপন, বিলাতী কাগজের উদ্ধৃত প্রবন্ধ, পুলিস রিপোর্ট এবং খোস গল্প সমূহের আধার ছিল। বকিংহাম সংবাদপত্র উন্নতভাবে পরিচালনের আদর্শ ধারণ করিলেন। হেনরি মেরিডিথ পার্কার প্রমুখ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী অথচ সুলেখক যুবকগণ কলিকাতা জার্নালের লেখক শ্রেণীভুক্ত হইলেন। এই সকল লেখকের সাহায্যে এবং লর্ড হেষ্টিংস প্রদত্ত স্বাধীনতা ঘোষণার ফলে গবর্ণমেণ্টের অনেক কার্য্যের তীব্র সমালোচনা প্রকাশ হইতে লাগিল। যে সকল কর্ম্মচারী হেষ্টিংসকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম এডাম। ইনি হেষ্টিংসের স্বদেশ গমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের স্বদেশগমনের পর এডাম সাহেব অস্থায়ী গবর্ণর জেনেরল হইতে না হইতে এপ্রিল মাসে এক বিধি প্রচারিত হইল যাহা দ্বারা ইচ্ছামত কোন কিছু মুদ্রিত করিবার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল। কলিকাতা জার্নাল নির্ভীকভাবে গবর্ণমেণ্টের

অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে Dr. Bryce নামক ধর্ম্মযাজক ইহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী John Bull কাগজ বাহির করিলেন। ইহার প্রবন্ধ সকল সুপ্রীম কোর্ট গ্লানিকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, কিন্তু তাহার ফলে সম্পাদক গবর্ণমেণ্টের ষ্টেসনারি অফিসের মোটা বেতনে কেরানীপদে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম্ম তাঁহার নিজের সম্প্রদায় এবং ডিরেক্টরগণ কেহই অনুমোদন করিলেন না। সুতরাং বকিংহাম ঠাট্টা করিয়া লিখিলেন যে ধর্ম্মযাজক যে সময়ে উপদেশ রচনা করিবেন, সেই সময়ে তৎপরিবর্ত্তে ফিতার বাণ্ডিল এবং গালার বাতি গণিয়া থাকেন। এডাম বকিংহামের সংবাদপত্রের লাইসেন্স বন্ধ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। বকিংহাম ডিরেক্টরগণের নিকটে ক্ষতিপূরণের নালিস করিলেন। তাহা নিষ্ফল হইল। সহকারী সম্পাদককেও ধরিয়া জাহাজে তুলিয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

যে আইনের দ্বারা এডাম মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করিলেন, সেই আইনের বলেই শেরিফের মধ্য দিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত সাধারণ সভা আহ্বান করা বন্ধ হইয়া গেল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুলাই তারিখে ডিরেক্টরগণ পত্র লেখেন—

'We direct, on the receipt of this dispatch, that public notice be issued forbidding, under pain of our high displeasure, any public assemblage either of our own servants, or of private merchants, traders or other inhabitants whatsoever, without first obtaining the sanction of the Government through the medium of the Sheriff for the time being; and we further direct that with the application for holding such meetings, the subjects intended to be taken into consideration, be also submitted to your previous consideration, in order that you may have it in your power to judge of

the propriety of allowing the questions that may be proposed to be agitated, and on us consideration whatever is the Sheriff or the officers presiding at such meetings to allow any subject to be considered that has not been previously submitted for your consideration. We have full confidence, however, that our Govt in India will not preclude our servants or other European inhabitants from meeting for the purpose of expressing their sentiments, whenever proper subjects are submitted for their deliberation.'

এডাম সাহেব তাঁহার আইন করিবার কালে এই পত্র হইতে যথেষ্ট বল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেকালে একটা নিয়ম ছিল যে আইন সকল সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইত। অনুমোদন করিবার পুর্ব্বে জনসাধারণের মতামত শ্রবণ করিবার অধিকার সুপ্রীম কোর্টের ছিল। এডাম তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইনও সুপ্রীম কোর্টের অনুমোদনার্থে প্রেরণ করিলেন। সেই সময়ে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর এই আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের নিকট এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন। তাহাতে দ্বারকানাথ ঠাকুর মুখপাত্র হইয়া প্রসন্নকুমার ঠাকুর, স্বীয় দুইপুত্র এবং রামমোহন রায়ের স্বাক্ষরিত করিয়া এই দরখাস্ত পাঠান। তিনি সে সময়ে কোন ইংরাজকে সে দরখাস্তে স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করেন নাই, কারণ তাহার ফলে সেই ইংরাজের ভাগ্যে নির্ব্বাসন দণ্ডও ঘটিতে পারিত; কিন্তু দেশীয়দিগের পক্ষে সে বাধা ছিল না, কারণ তখনকার প্রজাতন্ত্র বিরোধী গবর্ণমেণ্টও দেশীয়দিগকে এই কারণে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিতে সাহস করিতেন না। তথাপি দ্বারকানাথ দেশীয়দিগকে সেই দরখাস্তে স্বাক্ষর করিতে কিছুতেই সম্মত করাইতে পারেন নাই। তাঁহারা সকলে ভাবিয়াছিলেন যে তাহার পরদিনই স্বাক্ষরকারীগণ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিবেন! যখন সেখানে অকৃতকার্য্য হইলেন, তখন

তাঁহারা প্রিভি কৌন্সিলে দরখাস্ত করিলেন, সেখানেও তাহা অগ্রাহ্য হইল।

লর্ড আমহার্ষ্ট যখন শাসনভার গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংহারক আইনের সপক্ষে চলিতেন, কিন্তু ক্রমে কার্য্যত স্বাধীনতা দিয়াছিলেন—এমন কি, তাঁহার নিজের কার্য্যের সমালোচনাতেও বিরক্ত হইতেন না। কিন্তু তিনি সেই সকল আইন উঠাইয়া দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি বলিতেন যে সেই আইন যখন রাজনীতিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা প্রস্তুত এবং ডিরেক্টরগণের অনুমোদিত, তখন তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সেই আইনের কোন সাহায্য গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু ইঁহার সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা কার্য্যত হৃত না হইলেও সাধারণ সভা সম্বন্ধীয় বিধি অপরিচালিত থাকিত না। অনেক সভা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আহুত হইলেও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। একবার জন পামার এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কতকগুলি গুরুতর বিষয় সম্পর্কে অধিকার ব্যঞ্জক আইন প্রণয়নের জন্য পার্লামেণ্টে দরখাস্ত করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণ সভা আহ্বান করিবার জন্য শেরিফের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তদুত্তরে তদানীন্তন শেরিফ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ১২ই মে তারিখে এক নোটিস জারি করিলেন যে এই সভা হইবে না।[২]

এইরূপ সাধারণ সভা আহ্বানে বাধা পাইয়া কলিকাতাবাসী কি ইংরাজ, কি দেশীয় সকলেরই কিরূপ মর্ম্মান্তিক লাগিত তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি কিনা সন্দেহ। হাত পা বাঁধা; সহস্র কষ্ট হইলেও সাধারণ সভা আহ্বান করা অসম্ভব। সকলেই বৎসর বৎসর নীরব রহিলেন। অবশেষে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে, যখন লর্ড বেণ্টিঙ্কের দেশীয়দিগের

২ Notice is hereby given that the meeting called under a requisition, signed by J. Palmer, Esquire, and other inhabitants of Calcutta and advertised for the 17th instant at the Town Hall, will not take place.

Calcutta
12th May 1827.

(S. d.) J. Plowden
Sheriff

উন্নতিতে সহায়তা তাঁহাদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ পাইল, তখন দ্বারকানাথ আবার তাঁহার ইংরাজ বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে এডাম সাহেবের প্রবর্ত্তিত আইনের বিরুদ্ধে সকৌন্সিল গবর্নরজেনেরলের নিকট এবং কোম্পানীর পুনঃপ্রদত্ত সনন্দ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের নিকট দুইটি আবেদন কারবার জন্য টাউন হলে এক সাধারণ সভা আহূত হইয়াছিল। সেই সভায় সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার টি. ডিকেন্স পার্লামেণ্টকে আবেদন করা উপলক্ষ্যে বক্তৃতাকালে পূর্ব্বোক্ত শেরিফের নোটিসকে 'a most jealous, senseless, and capricious exertion of arbitrary power' বলিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ তদনুমোদনে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন যে "বেণ্টিঙ্ক মহোদয় থাকিতে থাকিতেই এই আইন উঠাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হউক; কারণ, বেণ্টিঙ্কের দেশীয়দিগের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়া বুঝা যায় যে তিনি নিশ্চয়ই ইহা উঠাইয়া দিতে রাজী হইবেন এবং ইহা একবার উঠিয়া গেলে অন্য কোন ভবিষ্যৎ গবর্ণরজেনেরলের পক্ষে আবার এইরূপ আইন করা অসম্ভব হইবে।" দ্বারকানাথ অবস্থাটি বেশ বুঝিয়াছিলেন, তাই এই শেষোক্ত কথাগুলি বলিতে পারিয়াছিলেন।

বেণ্টিঙ্ক যদিও বিশ্বাস করিতেন যে ভারতবর্ষের ন্যায় বহু বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যকে সুশাসিত করিতে গেলে মুদ্রাযন্ত্রের এবং মতামতের স্বাধীনতা একান্ত আবশ্যক, তথাপি সেই স্বাধীনতা হরণের ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, যখন তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে সাহসের সহিত সৈন্য বিভাগের ভাতা হ্রাস করিতে হইয়াছিল। এই কারণে ইংরাজগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উঠে এবং বেণ্টিঙ্ক তাঁহাদের অপ্রিয় হইয়া উঠেন। ইংরাজ সম্পাদিত সংবাদপত্র সকল তাঁহার প্রতি অতি অভদ্র গালাগালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। সে সময়ে অনেকে বেণ্টিঙ্ককে মুদ্রাযন্ত্রের শাসনের জন্য

পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি তদনুসারে কার্য্য না করিলেও একথা বলা যায় না যে সেগুলি তাঁহার হৃদয়কে একেবারে স্পর্শ করে নাই। দ্বিতীয়ত তিনি যখন মাদ্রাজের গবর্ণর ছিলেন, সেই সময়ে তথাকার অবস্থায় তাঁহার মত ছিল 'It is necessary, in my opinion, for the public safety, that the press in India should be kept under the most rigid control. It matters not from what pen the dangerous matter may issue ; the higher the authority, the greater the mischief.' তিনি নাকি গবর্ণরজেনারল থাকিবার কালে মীরাটের এক মাসিকপত্রের সম্পাদক বড়ই গালাগালির বাড়াবাড়ি করাতে কাগজ বন্ধ করিবার ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন (১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে)। যাই হৌক, তিনি বঙ্গদেশের মুদ্রাযন্ত্রকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া যে কার্য্যত স্বাধীনতা দিয়াছিলেন ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক যাইবার পর তাঁহারই সভাসদ সার চার্লস মেটকাফ গদিতে আরোহণ করিয়াই তাঁহার প্রথম কার্য্য হইল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান। দ্বারকানাথ প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আবেদনের উত্তরে বেণ্টিঙ্ক বলিয়াছিলেন যে শীঘ্রই ব্যক্তিগত কুৎসা এবং রাজবিদ্রোহ বাঁচাইয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান বিষয়ক শীঘ্রই একটা আইন হইবার সম্ভাবনা আছে। এদিকে মেটকাফ বলিতেন যে তিনি যদি গবর্ণরজেনেরল হইতেন, তাহা হইলে মুদ্রাযন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন। ইহার উপর স্বাধীনতার ঐকান্তিক ভক্ত মিলটনের উপর প্রবন্ধ লেখক মেকলে এই সময়ে কৌন্সিলের একজন সভাসদ ছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মুদ্রাযন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতাপ্রদ আইন প্রণীত হইয়া ১৫ই সেপ্টেম্বর পাস হইয়া গেল।

দ্বারকানাথ ঠাকুর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে সংবাদপত্র সকলের একজন প্রধান উৎসাহদাতা হইবেন তাহা বলা বাহুল্য। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে যখন

শ্রীরামপুর হইতে মার্সম্যান সাহেব প্রভৃতি মিসনারীগণ 'সমাচার দর্পণ' নামে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, তখন দ্বারকানাথ ঠাকুরই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন।

কয়েকটি কাগজের সহিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের কিছু ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তন্মধ্যে 'বেঙ্গল হরকরা' নামক কাগজের তিনি একজন প্রধান অংশীদার ছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম সাপ্তাহিক আকারে বাহির হয়, তৎপরে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে দৈনিক হয়। 'কলিকাতা জার্নাল' উঠিয়া যাইবার পর উদারনীতির ইহাই প্রধান পত্র হয়। প্রথমে মঙ্গলবার প্রাতে ছোট folio কাগজে বাহির হইত, পরে শনিবারে বাহির হইতে থাকে। 'বেঙ্গল হরকরা'ই ভারতে সর্ব্বপ্রথম দৈনিক কাগজ—১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৭এ এপ্রিল একখানা quarts কাগজে বাহির হয়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারীতে ইহা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়া Indian Daily News নামে পরিচিত হয়।[৩]

'ইণ্ডিয়া গেজেট' এবং 'বেঙ্গল কুরিয়ার'এর যাহা কিছু সত্ত্ব ও সম্পত্তি, সমস্তই নীলামে হরকরা কিনিয়া লইয়াছিল—১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর।

এই হরকরাতে এক সময়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী অনেকে লিখিতেন, তন্মধ্যে হেনরি মেরিডিথ পার্কার সর্ব্বপ্রধান।—ইনি 'one of the most gifted men that ever came out to this country.' গবর্ণমেণ্টের চিকিৎসাবিভাগের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী ডাক্তার জন গ্রাণ্ট ইহার লেখক ছিলেন। তিনি Apothecary General ছিলেন। কলিকাতার করোনার এবং মেরীন বোর্ডের সেক্রেটারী চার্লস বেকেট গ্রীনল ইহার লেখক ছিলেন। জেম্‌স্‌ সাদারল্যাণ্ড ইহার এক সময়ে সম্পাদক হইয়াছিলেন। ইনি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হুগলীর এক স্কুলমাষ্টার, পরে কলেজের অধ্যাপক এবং তাহারও পরে মেরীন

৩ বিংশ শতাব্দীর প্রথমেও এই সংবাদপত্র প্রচলিত ছিল। তাহার পর উঠিয়া যায়।

বোর্ডের সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। এই হরকরায় প্রবন্ধের জন্য ইংলণ্ড ও ভারতের ষ্টীমার সংযোগ শীঘ্র সাধিত হইতে পারিয়াছিল। 'জনবুল' যে সময় বাহির হয় সেই সময়ে দ্বারকানাথ হরকরার অংশ কেনেন যাহাতে স্বদেশের পক্ষ সমর্থন হয়। হরকরা আফিসে বড় লাইব্রেরী ছিল।

এই হরকরা ছাপাখানা হইতে 'লিটারারি গেজেট' নামক এক সাপ্তাহিক সাহিত্যিক কাগজ বাহির হইত।

হরকরা ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইলেও ক্রমে ইহার তিন প্রধান স্বত্বাধিকারী ছিলেন—দ্বারকানাথ ঠাকুর, কর্ণেল ইয়ং এবং স্যামুয়েল স্মিথ।

'বেঙ্গল কুরিয়ার'এর সম্পাদক ছিলেন জেম্‌স্ প্রিন্সেপ। ইনি কার-ঠাকুর কোম্পানীর অংশীদার উইলিয়ম প্রিন্সেপের ভ্রাতা।

'ইণ্ডিয়া গেজেট'এর সম্পাদক উইলিয়ম এডাম। ইনি রামমোহন রায়ের এবং দ্বারকানাথের পরম বন্ধু। ইনি একেশ্বরবাদী হইয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মাসিক হাজার টাকা বেতনে শিক্ষা বিষয়ে অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

একবার দ্বারকানাথ ঠাকুর হরকরা আপিসে যাইবার কালে তাঁহার গাড়ীর ঘোড়া ক্ষেপিয়া ছুটিয়াছিল। গাড়ী উল্টাইয়া গেল এবং তাঁহার একটা পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। হরকরা আফিসের পাশেই ডাক্তার মণ্টগমেরি মার্টিন নামক এক অস্ত্র চিকিৎসক ছিলেন। তিনি প্রথম সাহায্য করিয়া তাঁহার পা সারাইয়া দিলেন। তখন দ্বারকানাথ তাঁহার কথামত একটি সংবাদপত্র তাঁহার জন্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ডাক্তার মার্টিন 'বেহার হেরল্ড'এর সম্পাদক হইলেন। ইহার জন্য দ্বারকানাথকে অনেকবার মানহানির মকদ্দমায় পড়িতে হইয়াছিল। পরিণামে 'বেঙ্গল হরকরা'র নিকটে 'বেঙ্গল হেরল্ড' বিক্রীত হইয়াছিল।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জোয়াকিম হেওয়ার্ড ষ্টকলার দ্বারকানাথের সাহায্যে 'ইংলিশম্যান' কাগজ প্রকাশিত করিলেন। এই ষ্টকলার দ্বারকানাথ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যাহা কিছু ভাল তাহাতেই তিনি

মুক্তহস্ত ছিলেন। হরকরার অংশীদার ও সম্পাদক স্যামুয়েল স্মিথ আলেকজাণ্ডার কোম্পানীর কাছে সাত লক্ষ টাকায় ঋণী হইয়া তাহাদের দোষ বলিতে পারিতেন না। উইলিয়ম এডাম 'ইণ্ডিয়া গেজেট'এ ম্যাকিণ্টস কোম্পানীকে কিছু বলিতে পারিতেন না, কারণ ইঁহারাই কাগজকে পোষণ করিতেন। কুরিয়ার সম্পাদক জর্জ প্রিন্সেপ পামার কোম্পানীর অংশীদার ছিলেন। সুতরাং এই সকল কাগজের স্বাধীনতা ছিল না। এই সময়ে সেই বাণিজ্য সঙ্কট ঘটিয়া যাওয়াতে ষ্টকলার তাঁহার 'ইংলিশম্যান' কাগজে সেই সঙ্কটের লোকসানভাগী বিধবা প্রভৃতির পক্ষ লইলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইহা কাপ্তেন ম্যাকনাটনের হাতে গেল। ষ্টকলার ইন্‌সল্‌ভেণ্ট হইলেন।

বাঙ্গালা সংবাদপত্র এই সময়ে ছিল 'সংবাদ প্রভাকর' এবং 'সংবাদ ভাস্কর'। ভাস্কর গুড়গুড়ে (গৌরীশঙ্কর) ভট্টাচার্য্যের সম্পাদকত্বে গালি পূর্ণ হইত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহার প্রবন্ধ প্রভৃতি সুন্দর ভাষায় লিখিত হইত। দ্বারকানাথ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া প্রভাকরের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রেরনাতে, তাঁহারই সাহায্যে প্রভাকর সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক প্রভাকর প্রধাণত ইহার পদ্যময় প্রবন্ধ সকলের গুণে, সত্বর লোকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিলেন। দুই বৎসর পরে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাল হওয়াতে প্রভাকর কিছুকালের জন্য উঠিয়া যায়। মধ্যে তিনি কটকে গিয়া ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে কটক হইতে ফিরিয়া আবার প্রভাকরকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তখন প্রভাকর সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হইতে লাগিল। আর দুই বৎসর পরে আষাঢ় মাস হইতে তাহা দৈনিক রূপে প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে দ্বারকানাথ ইঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ 'সংবাদ কৌমুদী' প্রতিষ্ঠিত করিয়া রামমোহন রায়কে তাহার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন তাহা জীবিত ছিল।

দ্বারকানাথ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার যেরূপ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজের নামেও কোন নিন্দা কোন কাগজে প্রকাশিত হইলে যে তাহা তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করিবেন তাহা বলাই বাহুল্য। 'জ্ঞানান্বেষণ' নামক দ্বিভাষী পত্র রামগোপাল ঘোষ এবং তাঁহার সহপাঠীগণের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন তারকচন্দ্র বসু। ইনি যখন ডেপুটি কলেক্টর হইলেন, তখন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রসিককৃষ্ণ মল্লিক একবার দ্বারকানাথ ঠাকুরকে তীব্র আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন আত্মীয় তাঁহাকে চাবুক মারিতে উপদেশ দেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার অন্যায় হইয়াছে। সেই অবধি রসিকবাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরম বন্ধু হইয়া পড়িলেন।

Reformer কাগজ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে ফ্রো সাহেব সম্পাদন করিতেন।

মেটকাফের প্রতি সম্মান

দ্বারকানাথ যখন তাঁহার চির-অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিলেন, যখন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভ সংসিদ্ধ হইল, তখন দ্বারকানাথ মেটকাফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করিয়া কি থাকিতে পারেন? এই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য তিনি কয়েকটি ইংরাজ ও বাঙ্গালী বন্ধু মিলিয়া এক সভা আহ্বান করিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুন তারিখে এই সভা হয়। এই সকল সভাতে সেকালে ইংরাজ ব্যারিষ্টারগণ যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। বর্ত্তমানকালের ইংরাজ ব্যারিষ্টারদিগের ন্যায় কেবল নিজেদের অর্থ চিন্তায় নিমগ্ন না থাকিয়া দেশের স্বাধীনতা ও মঙ্গলকামনার চিন্তাতেও যথেষ্ট সময় দিতেন।

অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার টার্টন এক জ্বলন্ত বক্তৃতার পর প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করেন—"ভারতের মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ে প্রস্তাবিত আইন দেখিয়া এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক বিধি উঠাইয়া দেওয়াতে কলিকাতার অধিবাসীগণ সার চার্লস মেটকাফের প্রতি যে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দবোধ করিতেছেন, তাহা জ্ঞাপনার্থ তাঁহাকে একটা অভিনন্দন দেওয়া যাউক।"

দ্বারকানাথ ঠাকুর এই ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশ করিয়া এই সভায় বলিলেন—"মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার বিরোধী সর্ব্বপ্রকার বাধা দূরীকরণে তিনি বরাবর গভীর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ের প্রত্যেক সাধারণ অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিয়াছেন। এই কারণে এই স্বাধীনতা লাভে তাঁহার আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক এবং যেহেতু তিনি এই বিষয়ক যুদ্ধে অনেক সাহায্য করিয়াছেন, তখন উপরোক্ত প্রস্তাব অনুমোদন না করিয়া থাকিতে পারেন না।"

কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি হইয়া মেটকাফকে ২০শে জুন তারিখে এই অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য যে দ্বারকানাথও এই সঙ্গে ছিলেন।

ইহার উত্তরে মেটকাফ বলিলেন যে, এক সময়ে ভারতবর্ষে কি ইংরেজ, কি দেশীয় কাহাকেও মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক স্বাধীনতা দেওয়া ভয়াবহ বোধ হইত। বর্ত্তমানে অনেকে ইউরোপীয়দিগকে দিতে বলেন কিন্তু দেশীয়দিগের পক্ষে তাহা ভয়াবহ বোধ করেন। আমি সে সকল ভয় করি না, প্রত্যুত অধিকার ও স্বাধীনতা বিষয়ে ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের জন্য বিভিন্ন আইন করা অত্যন্ত অন্যায় ও মুর্খতা বিবেচনা করি। মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে অবশ্য আইনের বিধি নিষেধ থাকিবে—কিন্তু যখনই দরকার হইবে, তখনই স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আইন করিতে পারিবেন। এ অবস্থায় সাধারণত মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার প্রধান বাধা দুরীভূত হইয়াছে।

ইহার পুর্ব্বে কথায় কথায় ইউরোপীয় ও দেশীয় প্রভেদ ধরা হইত। এই আইনের প্রসঙ্গে যে সেই প্রভেদ অনেকটা বিলুপ্ত হইল, ইহাই পরম লাভ।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা উপলক্ষ্যে এবং মেটকাফের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য একটি সাধারণ ভোজ দেওয়া হয়। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার লঙ্গভীল ক্লার্ক ইহার সভাপতি এবং হেনরি মেরিডিথ পার্কার ইহার প্রতিনিধি সভাপতি ছিলেন। ইহার পরিদর্শক ছিলেন তদানীন্তন যত ইংরাজ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। দেশীয় পরিদর্শক ছিলেন তিনজন—রসতমজী কাওয়াসজী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর।

দ্বারকানাথ এই সভায় উপস্থিত থাকিতে অক্ষম হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া এবং রাজকার্য্য ও রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার লাভে আনন্দ প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখেন—

'দেশীয় জমিদার ও সওদাগর হিসাবে এবং ইংরাজ জাতি ও যে

ইংলণ্ডের সহিত ভারতের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে আমার অধিকাংশ দেশীয় ব্যক্তি অপেক্ষা আমি বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে জানি বলিয়া আমার এই অবসরে মত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। আমার আন্তরিক বিশ্বাস যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি মহাফলপ্রদ কার্য্য করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের প্রজাশাসন বিষয়ে হস্ত, চক্ষু ও কর্ণে বল সঞ্চার করিবে এবং প্রজাগণও বুঝিতে পারিল যে শাসনকর্ত্তাগণ ন্যায়পরতার সহিত শাসন করিবেন, কারণ তাঁহাদের কার্য্যের বিচার করিবার অধিকার প্রজাগণকে দিয়াছেন।'

সভাপতি তাঁহার বক্তৃতাকালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের উপকারিতা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন। ইহাতে যে প্রজা বিদ্রোহের মূল নষ্ট হয় তাহাও বলিলেন।

সার চার্লস মেটকাফ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এই স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া এদেশেও দিয়াছেন।

হেনরি মেরিডিথ পার্কার দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রশংসাকালীন বক্তৃতায় বলিলেন 'Thank God, the honour due to the name connected with my trust, depends upon a more solid Foundation than my feeble word. That name is inscribed foremost amongst the foremost, on the roll of those most distinguished for mercantile liberality and commercial enterprise. It is among the first, if not the very first, on the list of active, able and munificent citizens to whom the whole community is indebted. The name of my friend is revered by many whom he has saved or established in life by his judicious advice or his liberal assistance. It is written in the hearts of thousands who have

partaken of his inexhaustible charity ; who have had cause to bless his boundless benevolence, confined to us caste, colour or creed. It shines brightly, surrounded with all that is urbane and kind and courtious, on the tablets of social hospitality. It is heard in the halls of our colleges, in the portion of those literary and scientific institutions which he has supported and enriched. It shines gloriously through an act,—a recent act of charity so princely, so magnificent, that I tax my memory in vain to discover a parallel to it within my own knowledge and experience.[8] Above all, the name of this admirable citizen is inseparably connected with that cause whose triumph we have met this night to celebrate. Gentlemen, need I say after this that it is the name of Dwarkanath Tagore.'

J. F. Leilth রামমোহন রায়ের প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন যে, শিক্ষাবিস্তার এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভ দেশীয়দিগকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি দৃঢ় ভক্তিমান রাখিবে।

৮ District Charitable Societyতে এক লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন।

দেওয়ানী জুরী প্রবর্ত্তন চেষ্টা

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর সনন্দ পুনঃপ্রদানের পর অবধি দশ বৎসরের মধ্যে ভারতে অনেক সাধারণ হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সুপ্রীম কোর্টে দেওয়ানী মকদ্দমায় জুরি প্রথা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা অন্যতর। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুলাই টাউন হলে শেরিফ এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় জুরি প্রথা সাধারণত বিস্তৃত ও উন্নত করা এবং কলিকাতায় দেওয়ানী মকদ্দমায় জুরি বিচার যাহাতে পাওয়া যায় তদ্বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল।

এই সভায় দেওয়ানী জুরির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক বড় বড় বক্তা বক্তৃতা করেন। জুরি বিচারে আইনের বিচারের পূর্ব্বে ঘটনার সত্যতা অনেকটা প্রমাণিত হয়, ইহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছিল। এই সময়ে 'বোর্ড অব কণ্ট্রোল' দেওয়ানী জুরি প্রথা অনুমোদন করাতে সভা স্থির করিলেন যে গবর্নর জেনেরলের কৌন্সিলে এই প্রথা প্রবর্ত্তন প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করা হউক এবং তৎসঙ্গে এই আবেদন পত্রের সঙ্গে যাইবার আইনের এক খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত হউক। এই কমিটি প্রয়োজন বিবেচনা করিলে অন্যান্য উপায় সকল অবলম্বন করিতে পারিবে। দ্বারকানাথ এই কমিটির সভ্য ছিলেন। এই বিষয়ে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন লঙ্গভীল ক্লার্ক এবং চার্লস প্রিন্সেপ। চার্লস প্রিন্সেপ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা উপলক্ষে যে ভোজ দেওয়া হইয়াছিল, সেখানেও দেখি কি মুদ্রাযন্ত্র বিষয়েও জুরি বিচারের অধীনে আনয়ন করিবার পক্ষে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে ঘটনা সত্য কি না, বর্ত্তমানে তাহা বিচারকদিগের মতামতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, ইহা ঠিক নহে। বিলাতের মত এখানেও জুরি প্রথা প্রবর্ত্তিত করা

কর্ত্তব্য। 'All its civil liabilities are left to the absolute discretion of the Judges, which English principles and English practice have denounced as a most unsafe tribunal.'

যাহাই হউক ঘটনার সত্যতা বিচার এবং আইনের বিচার পৃথক করা প্রার্থনীয় হইলেও দেওয়ানী মকদ্দমায় জুরি হইবার উপযুক্ত লোকের অল্পতা বশত গবর্ণমেণ্ট এই প্রথা প্রবর্ত্তন কিছুতেই অনুমোদন করিলেন না। এই বিষয় লইয়া বর্ত্তমানে আর একবার আন্দোলন উপস্থিত করিলে ভাল হয় না কি?

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কালা আইন

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কালা আইন লইয়া একবার তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহাতে ইংরাজদিগের সপক্ষে এই আইন প্রচারের বিরুদ্ধে ঘোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনী লেখক কিশোরীচাঁদ মিত্র ইহাতে কিছু আশ্চর্য্যভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কিশোরীবাবুর একটু বুঝিবার ভুল হইয়াছিল আমরা এই বিষয় সবিস্তার আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারিব। তাঁহার এই বিষয়ের বক্তৃতা, তাঁহার চিঠি হইতে যতদূর বুঝিতে পারি, অখণ্ডিত আকারে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই—সম্ভবত এই কারণে এই ভ্রান্তি ঘটিয়াছে।

কালা আইনের মুল আমরা দেখি লর্ড কর্নওয়ালিসের বিধি প্রবর্ত্তনের সময় অবধি রহিয়া গিয়াছে। ডিরেক্টরগণ ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে নবীকৃত সনন্দের বলে গবর্ণরজেনেরলকে কোম্পানীর ভারতীয় অধিকার সুশাসনে রাখিবার জন্য বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়াছিলেন। তদনুসারে একটি বিধি করিলেন যে, যে সকল ইউরোপীয় রাজধানী ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে বসতি স্থাপন করিতে অভিলাষ করিবেন; তাঁহাদিগকে একটা খত লিখিয়া দিতে হইবে যে, তাঁহারা দেওয়ানী মকদ্দমার স্থানীয় আদালতের বিচারাধীন হইতে আপত্তি করিবেন না। তদানীন্তন আইনজ্ঞ বিচারক চেম্বার্স, সার উইলিয়ম জোন্‌স্ আইনের মুখে এই বিধি টিঁকিবে না বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তথাপি যৎসামান্য টাকার জন্য সুপ্রীম কোর্টে দেশীয়গণ কথায় কথায় পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া বিচার প্রার্থনা করিলে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করে, এই কারণে সামান্য টাকায় মকদ্দমায় ইংরাজদিগকে স্থানীয় কোর্টের বশে আনিবার উপদেশ দিলেন। অবশেষে প্রথমে

স্থির হইয়াছিল যে, স্থানীয় আদালতের মুন্সেফ ৫০ টাকা পর্য্যন্ত বিচার করিতে পারিবেন। ক্রমে অবশ্য ইহা ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। ইহা ব্যতীত প্রথম প্রথম ফৌজদারী মকদ্দমা ছাড়িয়া পল্লীগ্রামবাসী ইংরাজদিগের, তাঁহাদিগের পদমর্য্যাদা যতই কম হউক না কেন, স্থানীয় আদালতে এমন কি ইংরাজ বিচারকগণেরও নিকটে বিচার হইবার নিয়ম ছিল না—সুপ্রীম কোর্টে একমাত্র তাঁহাদের বিচার হইতে পারিত। স্থানীয় আদালতের বিচারকগণ দেশীয়দিগের যে বিচার করিতেন, তাহার উপর অধিকাংশ স্থলেই আর আপীল চলিত না। ইংরাজদিগের কিন্তু ঐ ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত বিচারেও সুপ্রীম কোর্টে আপীল চলিত।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ৯৬টি আপীল মকদ্দমার মধ্যে ৭৭টি জজের রায় উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। দেশীয় জজের নিকট হইতে অথচ মোটে ৫৮টি আপীল হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩২টার রায় অন্যায় হইয়াছিল।

একবার ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যে আইন রদ হইয়া গিয়াছিল, সেই আইনের উপর বিচার হইয়াছিল।

এই তো দেখিলাম যে সেকালে মফঃস্বলে কিরূপ বিচার শ্রাদ্ধ ঘটিত। আবার সুপ্রীম কোর্টে বিচার করাইতে গেলে গবর্ণমেণ্টের এবং প্রজা উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত ক্ষতিকর হইত। একবার ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বরে এক ইংরাজ কেরাণী লাহোরে কারাগার পরিদর্শকের আফিস হইতে দুইশত টাকা চুরি করে। সুপ্রীম কোর্টে তাহার বিচার হইল ১৫ মাস পরে। এবং সেই লাহোর হইতে ১৫০০ মাইল সেই কয়েদী এবং সাত আটজন সাক্ষীকে আনিতে হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় সাক্ষীদিগের খরচা যেন গবর্ণমেণ্ট দিবেন, কিন্তু আসামীর পক্ষের খরচা দিবেন না।

সুপ্রীম কোর্টের বিচার বিষয়ে সায়র মুতাক্ষরীণ বলে—'That tribunal has power over all the English from the highest to the lowest, but sits in judgement by seasons and stated times. A whole life is needful to

attend their long, very long proceedings, and fill a decision is given, there is no comprehending what is going on and what is likely to follow, nor what is the probable end of the business. On the first complaint lodged by any one, be it ascertained or not, the defendant is obliged to find security to double the amount of his demand, and if he cannot afford such a security the poor man must go to prison; and if he cannot find bail, or the complaint is not withdrawn or hushed down, he must remain in prison ten or twelve years together, whether he is guilty or not guilty.···After all these miseries how painful it must be to a man to be in the dark about the event, and all the while in a cruel suspense about his fate, constantly bereft of his family and beloved children, and without being able to guess at what is to become of himself at last.'

দেশীয়গণ মফঃস্বলের আদালতের কষ্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের কষ্ট, এই উভয় প্রকার কষ্টই লাভ করিত। ইংরাজগণের পক্ষে কেবল সুপ্রীম কোর্টের বিচারে কষ্ট হইত। কিন্তু তাঁহারা মফঃস্বলের আদালতের স্বেচ্ছাচার অপেক্ষা সুপ্রীম কোর্টের বিচারও বেশী পছন্দ করিতেন।

মফঃস্বল আদালত (কি দেওয়ানী, কি ফৌজদারী) হইতে প্রকারান্তরে আপীল চলিত না। একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত তো আপীল আইন অনুসারেই চলিত না এবং সেই নির্দ্দিষ্ট সীমার পরে অতিরিক্ত ব্যয় পড়িত বলিয়া আপীল অত্যন্ত ধনীলোক ব্যতীত অন্যের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। যে আদালত হইতে আপীল করা অসম্ভব হইল, সেই সকল আদালতের অনেক স্থলে জেলা

ম্যাজিষ্ট্রেটগণও আমলাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেন। একটা ফৌজদারী মকদ্দমা দারোগার নিকট স্থাপিত হইলে হয় তিনি ঘুষ পেয়ে নির্দ্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। দেখা গিয়াছে, দারোগা দুইটা রিপোর্ট একই ঘটনায় দিয়াছে—একটাতে দোষী অপরটাতে অন্য দোষী। তাহার পর ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টর প্রভৃতি অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় সেই রিপোর্ট দেখিবার ভার আমলার উপর দিলেন। সে হয়তো ১০।১৫ টাকা পায়। আমলাই ফরিয়াদী ও সাক্ষীদিগের জবানবন্দী গ্রহণ করেন, যেরূপ ঘুষ মেলে, তাহার উপরেই জবানবন্দী কিরূপ লিখা হইবে তাহা নির্ভর করে। যদি আসামী বেশী ঘুষ দেয়, তবে সাক্ষীদিগের 'হাঁ' স্থলে 'না' লেখা হয় এবং ফরিয়াদীর জবানবন্দী অস্পষ্ট ভাষায় লেখা হয়। তাহার পরে যখন কাগজপত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে লইয়া আসা হয়, তখন সাক্ষীদিগের জবানবন্দী তাড়াতাড়ি পড়া হয়, সাক্ষীরা ভয়ে ভয়ে সমস্তই স্বীকার করে। যদি কোন সাক্ষী অস্বীকার করিল, তবে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে মিথ্যা বলার জন্য কারাবাসের ভয় দেখান। এই কাগজপত্র উচ্চতর আদালতে যাইলে যদি কেহ অস্বীকার করে, তবে তাহার অদৃষ্টে মিথ্যা ভাষণের জন্য জেলখানার সম্ভাবনা আছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহীত সাক্ষ্য ঘটনাস্থলে লওয়া হইয়াছে বলিয়া অধিক মূল্যবান বিবেচিত হয়। ইহা ছাড়া পুলিসের অত্যাচার যথেষ্ট ছিল—তাহার প্রতিবিধান ছিল না—ভুল হইয়াছে বলিলেই হইল। মারের চোটে নির্দ্দোষ দোষ কবুল করিত। দেওয়ানী মকদ্দমায় ১০০০ টাকার দাবীতেই ৩৫০ টাকা লাগিত।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক দেওয়ানী মকদ্দমার এই পার্থক্য উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু ফৌজদারী বিষয়ে ইহা উঠিয়া যাওয়া বড় সহজ হইল না। এই বৎসর গবর্ণর জেনেরলের এক আইন পাস হইল। ইহা দ্বারা ফৌজদারীতে মফঃস্বল আদালতের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল বন্ধ হইয়া গেল। এই আইনের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে দরখাস্ত করিবার জন্য কলিকাতাবাসী অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুরোধে

শেরিফ টাউন হলে এক সভা আহ্বান করেন। ঐ বৎসর ১৮ই জুন এই সভা হয়। এই সভায় এই প্রসঙ্গে স্থাপিত হয় 'That in consequeince of the passing of Act XI of 1836, the government has declared an intention of abolishing all appeals to the only Courts of Justice in India, independent of the government, whereby the rights and property of British subjects resident in the interiar are rendered insecure, and the application of British skill and capital to the improvement of the resources of India will be checked, and it is therefore expedient to memorialise the Court of Directors and Board of control to repeal or disallow this Act.'

দ্বারকানাথ একটি সুন্দর বক্তৃতায় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তাহার সার মর্ম্ম এই যে, 'কলিকাতার সওদাগরদের মধ্যে জন পামার সর্ব্বপ্রধান—দেশীয়দিগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেছেন। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজেরা দেশীয়দিগকে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করিতেন। কয়েকজন ব্যতীত সাধারণতঃ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ এ দেশের জন্য কিছুই করেন নাই। যাহাদিগকে Interloper বলে তাহারাই বরঞ্চ করিয়াছে। সওদাগর, অন্যান্য স্বাধীন ইংরাজ ঔপনিবেশিক এবং ইংরাজ আইন ব্যবসায়ীদের জন্যই কলিকাতার দেশীয়দিগের এত শ্রীবৃদ্ধি। এখন সেই সকল ইংরাজদের স্বাধীনতা থাকাতেই তাঁহারা দেশীয়দিগের সাহায্য করিতে পারিতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উভয়ের সমান ব্যবস্থা করিতে চাহেন অর্থাৎ দেশীয়দিগকে উঠাইতে না পারিয়া ইংরাজদিগকে নামাইয়া দিব, তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিব। মফঃস্বল আদালতের ব্যবস্থাই খারাপ। সেখানে ন্যায্য খরচায় ২০গুণ ঘুষ দিয়াও ঠিক ফল পাওয়া যায় না। একা কলেক্টরের হাতে এত কাজ যে কিছুতেই পেরে উঠেন না। সারা জীবন দরখাস্ত দিলেও কোন ফল হবে না। আমার নিজের ৪ লক্ষ

টাকা আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। সেখানে আদালতের হাতে জীবন নিশ্চিন্ত নহে। Court of Directorsদের ইচ্ছা যে সার্ব্বভৌম ক্ষমতায় এদেশ শাসন করেন। এই আইন সেই ইচ্ছার অনুকূল।'

সংবাদ পত্রে তাঁহার বক্তৃতা বলিয়া যাহা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার সার মর্ম্ম এই। ইহাতে তাঁহার খুবই নাম হইয়াছিল। তাঁহার কালে বিচার বিক্রয় হইত বলা যায়। তাঁহার জীবনী লেখক লিখেছেন যে আশ্চর্য্য দ্বারকানাথ এই আইনে ইংরাজ ও দেশীয়ের মধ্যে বিচারের সমতা স্থাপনের চেষ্টা উপলব্ধি করেন নাই। মফঃস্বলের আদালতের হস্ত হইতে যে ইংরাজগণ মুক্ত থাকিবে, ইহা কোন শাস্ত্রের অনুমোদিত হইতে পারে না। ইহা ঠিক নহে। দ্বারকানাথ ভাবিয়াছিলেন যে আমরা দাসের জাতি হইয়াছি বলিয়া ইংরাজদিগকেও দাসের জাতি হইতে দেওয়া ঠিক নহে—তাহা হইলে উন্নতি সুদূর পরাহত। দেশীয়দিগের উন্নতি হউক, কিন্তু সমতার অর্থে ইংরাজদের অবনতি করা হইতে পারে না।

ইহা ব্যতীত, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সংবাদপত্রে সমুদয় উঠে নাই। তিনি মফঃস্বলের আদালতের বিচার হইতে সুপ্রীম কোর্টে আপীল উঠিয়া যাইবার পক্ষেই প্রধান আপত্তি করিয়াছিলেন।

'With regard to my speech in the Town Hall, not one half of it is reported. I gave my reasons why I should not trust my person and that on the simple ground that the company's servants have to do so much that it is quite out of their power to do any business without giving their native amlaps a power which is generally abused. Let me even ask you how you would have liked to be tried by E. Boxwell, whose decision you know, was nothing but Ram channd Dutta's decision. I did not bring any sweeping charge against the service, but my observations were

upon the bad system and that govt. for want of good hands were obliged to put college boys without any experience to become our rulers at once. Now I think if you were in our situation you would not much like to get justice in such a court. As for the supreme court and its expense, I have said just as much on this as on the other and think if Legislative council will take our evedence we can point out what a deal of fees could be reduced in that court.'[১]

ইহার ফলে মফঃস্বল কোর্টের জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের গাত্রকণ্ডূয়ন ঘটিল। মেদিনীপুরের জজ Abercrambie Dick ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বরের 'ইংলিশম্যান' কাগজে আমলাদের হইয়া এক পত্র পাঠাইলেন—

'Baboo Dwarkanath, in his speech, gave expression to sentiments that influenced him in supporting the European portion of the Community of Bengal, which must be deemed highly creditable and generous. Was however his unmeasured reprobation of his own countrymen, without a single fact substantiation there of, equally generous ?'

তদুত্তরে দ্বারকানাথ ঠাকুর বলেন—'the present characteristic failings of natives are a want of truth, a want of integrity, a want of independence'. এবং এই সকলের মূল কারণ মুসলমান শাসনের কুফল। এখন অনেক ব্যতিক্রম পাওয়া যায়।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময়ে পামার প্রভৃতি মফঃস্বলবাসী ইংরাজগণ দেশীয় হিতৈষী ছিলেন, সুতরাং তাঁহার উপরোক্ত প্রকারের

১ Letter to R. W. Maxwell, Barisaul. Dt, 7, 7. 36

মনের ভাব হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ক্রমে ইংরাজ-সংখ্যা যত বাড়িতে লাগিল, তাহার মধ্যে ভালর সঙ্গে মন্দর দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাদের অত্যাচার প্রজাকুলের অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলাতে নীলকরগণ যথেচ্ছাচারী দুর্দ্দান্ত রাজার ন্যায় হইয়া উঠিলেন। অথচ সে অত্যাচার নিবারণের উপায় রহিল না। অত্যাচারী ইংরাজগণ আপনাদিগকে কোম্পানীর ফৌজদারী আদালতের বাহিরে রাখিয়া, সুপ্রীম কোর্টের দোহাই দিয়া, সচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই সকল অত্যাচার এতই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের ও কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকে এই অনিষ্টকর নিয়ম রহিত করিবার জন্য নূতন রাজবিধি প্রণয়নের পরামর্শ দিতে লাগিলেন। তদনুসারে তৎকালীন ব্যবস্থাসচিব বীটন সাহেব চারিখানি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

1. Draft of an Act abolishing exemption from the jurisdiction of East India Company's criminal courts.

2. Draft of an Act declaring the privileges of Her Majesty's Eurapean subjects.

3. Draft of an Act for the protection of judicial officers,

4. Draft of an Act for triel by Jury in the Company's courts.

পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন তদানীন্তন ইংরাজগণ যে কেবল এদেশবাসী অসহায় কৃষ্ণবর্ণ প্রজাকুলের প্রতিই অত্যাচার করিতেন তাহা নহে। তাঁহাদের অত্যাচার হইতে কোম্পানীর জুডিসিয়াল অফিসারদিগকে বাঁচান আবশ্যক হইয়াছিল।

যাহা হউক এই চারটি আইনের পাণ্ডুলিপি গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভাতে উপস্থিত হইবামাত্র এদেশবাসী ইংরাজগণ ইহাদের কালা আইন (Black Acts) নাম দিয়া তদ্বিরুদ্ধে ঘোরতর

আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তাঁহাদের সম্পাদিত সংবাদপত্র সকলে ঐ চার আইন প্রণেতাদিগের প্রতি অভদ্র গালাগালি বর্ষণ চলিতে লাগিল। বীটন তাঁহাদের উপহাস, বিদ্রূপ ও আক্রোশের লক্ষ্যস্থলে পড়িলেন। ইংরাজগণ কলিকাতাতে এক মহাসভা করিয়া পার্লামেণ্টের নিকট আবেদন করা স্থির করিলেন; এবং এদেশে ও ইংলণ্ডে ঐ আন্দোলন চালাইবার জন্য কতিপয় দিবসের মধ্যে ছত্রিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন।

আন্দোলনে দেশ কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। এ দেশীয়দের পক্ষ হইয়া বলিবার কেহই ছিল না। তাহাদের পক্ষ গুছাইয়া বলিতে পারে এমন সংবাদপত্রই ছিল না। এদেশীয়গণ নীরবে বাদবিতণ্ডা শুনিতে লাগিলেন এবং সদাশয় রাজপুরুষদিগের মুখাপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কেবল একমাত্র রামগোপাল ঘোষ উক্ত আইনগুলির পক্ষ লইয়া লেখনী ধারণ করিলেন। তিনি 'A few remarks on certain Draft Acts commonly called Black Acts' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ তাঁহার প্রতি এমনি চটিয়া গেলেন যে, তাঁহারা সমবেত হইয়া তাঁহাকে Agri-Horticultural Societyর সহকারী সভাপতির পদ হইতে অধঃকৃত করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহাকে উক্ত পদ হইতে অবিচার পূর্ব্বক অধঃকৃত করাতে বিরক্ত হইয়া সিসিল বীডন উক্ত সভার সভ্যপদ পরিত্যাগ করেন। অবশেষে আন্দোলনকারী ইংরাজদের অভীষ্ট পূর্ণ হইল। ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে কালা আইনগুলি ব্যবস্থা সভা হইতে অন্তর্হিত হইল। মফঃস্বলবাসী ইংরাজগণ আরও নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিলেন। নীলকরদিগের অত্যাচারে শত শত প্রজার প্রাণ পিষিয়া যাইতে লাগিল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আবার সেই আন্দোলন উঠে। অনেকদিন হইতে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ এবং হাইকোর্টের জজগণ অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন যে, মফঃস্বলবাসী ইংরাজদিগকে সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর ফৌজদারী আদালতের অধীন না করিলে এদেশীয় গরীব

প্রজাদিগের উপরে তাঁহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে পারা যাইবে না। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নীলকরদিগের অত্যাচারের কথা কর্ত্তৃপক্ষের ও কলিকাতাবাসী ইংরাজগণের কর্ণগোচর হওয়াতে সেই মনের ভাব প্রবল হইয়া উঠে। তদনুসারে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কলিকাতা হাইকোর্টের চীফজষ্টিস সুপ্রসিদ্ধ সার বার্ণেস পীকক গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রিসভাতে কোম্পানীর মফঃস্বলস্থ ফৌজদারী আদালতের এলাকা বর্দ্ধিত করিবার ও ইংরাজগণকে তদধীন করিবার উদ্দেশ্যে এক বিল উপস্থিত করেন। ইহাতে ইংরাজগণের মধ্যে আবার এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। কিন্তু এবারে তাঁহারা কোম্পানীর আদালতের অধীন হইব না এই রবটি না তুলিয়া, এদেশীয় বিচারকদিগের বিচারাধীন হইব না এবং ইংরাজ জুরির সহায়তা ভিন্ন বিচার হইবে না, এই বাণী ধরিলেন। ইহা কতকটা ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের ন্যায়। ইংরাজদিগের চেম্বর অব কমার্স, ট্রেডস এসোসিয়েসন, ইণ্ডিগো প্লাণ্টার্স এসোসিয়েসন প্রভৃতি সমুদয় সভা এই আন্দোলনে যোগ দিয়া টাউন হলে এক প্রকাণ্ড সভা করিলেন। রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রধান প্রধান সভ্যগণ এই আন্দোলনের প্রতি উদাসীন থাকিলেন না। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও হিন্দুপেট্রিয়টের সাহায্যে দেশের লোককে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। দেশের মান্যগণ্য সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তি সমবেত হইয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে টাউন হলে এক সভা করিলেন। ঐ সভাতে কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগের নিকটে প্রেরণের জন্য এক আবেদন পত্র গৃহীত হইল। সেই আবেদন পত্রে ১৮০০ লোকের স্বাক্ষর হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরেই মিউটিনির হাঙ্গামা উপস্থিত হওয়াতে তৎপরবর্ত্তী নবেম্বর মাসের পূর্ব্বে তাহা যথাস্থানে প্রেরণ করা হয় নাই। এ দেশীয়দিগের আবেদন পত্রের দশা যাহা হয়, ঐ আবেদন পত্রের দশাও তাহা হইয়াছিল। রাজারা যাহা ভাল বুঝিলেন তাহাই করিলেন, আবেদনকারীদিগের ফেউ ফেউ করা সার হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বারকানাথের সম্মান

দ্বারকানাথের চরিত্র ও কার্য্য কলাপে মুগ্ধ হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'জষ্টিস অফ দি পীস্' বা কলিকাতার শান্তিরক্ষক করিয়াছিলেন। তিনিই ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করিয়া ছিলেন। এই সম্মান তখনকার কালে অত্যন্ত গৌরবের ছিল।

দ্বারকানাথের জন্মবৎসরেই এক আইন পাস হইয়া প্রথম 'জষ্টিস অফ দি পীস'গণ নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার পূর্ব্বে কলিকাতার রাজস্ব আদায় প্রভৃতি জমিদারের হস্তে ছিল। কিন্তু ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের হস্ত হইতে কলিকাতার বন্দোবস্তভার গৃহীত হইয়া এই সকল শান্তিরক্ষকদিগের হস্তে অর্পিত হয়। এই আইনের বলেই প্রথম নিয়মিতরূপে ট্যাক্স ধার্য্য করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। শান্তিরক্ষকগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত নগরের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাদের অন্যতম প্রথম কার্য্য সার্কুলার রোড পাথর ফেলে পাকা করা। তাঁহারা নগর পরিষ্কৃত রাখিবারও ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুঝা গেল যে শান্তিরক্ষকগণ অন্যান্য কার্য্যের সঙ্গে সহরের ময়লা নিষ্কাশন বিষয়ে উপযুক্তরূপ মনোযোগ বিধানে অক্ষম। এই কারণে লর্ড ওয়েলেসলী এক বিশেষ কমিটি স্থাপন করিলেন। লর্ড ওয়েলেসলী তাঁহার সুবিখ্যাত মন্তব্যে নগরের উন্নতি বিষয়ক নানা প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। নগরোন্নতি সংসাধনী এক কমিটিও স্থাপিত হইল। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার অভিপ্রায় সকল সংসিদ্ধ হইতে পারে নাই।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বারকানাথ ও পুলিস সংস্কার

ভগবানের রাজ্যে কোন কিছুই একটি বিন্দুও অপরের সহিত বিচ্ছিন্ন নহে—সকলেই পরস্পরের সহিত সুদৃঢ় আকর্ষণ সূত্রে আবদ্ধ। কোথায় কোন্ অদৃশ্য জগতের অদৃশ্য সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র লুক্কায়িত আছে, আর কোথায় এই ক্ষুদ্র ধরণীর ক্ষুদ্রতম বালুকণা, কেহই কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। সকলেরই মধ্যে ঘনিষ্ঠ প্রেম-বন্ধন বিরাজমান। ভগবানেরও ইহাই মহিমা যে তিনি সংসারচক্রে প্রত্যেক অংশের মঙ্গল সাধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। এক অংশ ছাড়িয়া অপর অংশের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাখা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ। মহাপুরুষগণ ঈশ্বরের ছায়া। তাঁহারাও স্বভাবতই ঈশ্বরের নিয়ম অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সংসারের যে অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েন, সেই অবস্থাচক্রের প্রত্যেক অংশের মঙ্গল সাধনের প্রতি, প্রত্যেক অংশের উন্নতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন। নিজের ক্ষমতা অনুসারে আত্মসংসৃষ্ট জগতের প্রত্যেক অংশের প্রতি আত্মপ্রীতি সমভাবে প্রসারিত করিয়া জগৎকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন।

দ্বারকানাথ মহাপুরুষ ছিলেন। যে কার্য্যে তিনি দেখিয়াছেন যে স্বদেশের মঙ্গল, স্বজাতির মঙ্গল, মানবের মঙ্গল নিহিত ক্ষমতা থাকিলে তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্যে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছেন দেখিতে পাই। তাঁহার প্রীতি স্বদেশের প্রতি যেমন সম্প্রসারিত হইয়াছিল, সমগ্র মানব সমাজের প্রতিও সেইরূপই বিস্তৃত হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে বাণিজ্য প্রভৃতি উপায়ে যেমন তিনি স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ কালা আইনের ফলে ইংরাজজাতির স্বাধীনতা হরণের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে

স্বজাতির এবং অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজেরও নিকট হইতে উপহাস প্রভৃতির ভয় সত্ত্বেও তিনি ইংরাজজাতির হইয়া সংগ্রাম করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সমস্ত জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোথায় কাহার মঙ্গল করিব, কোথায় কাহার উপকার করিব, তাহারই অবসর অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহার জীবনের অবসান হইয়াছে।

এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও পুলিসের দৌরাত্ম্যগুণে লোকে সহজে ফৌজদারী মকদ্দমায় সাক্ষী হইতে চাহে না, তবু এখন পুলিসের উপর কত কঠোর বন্ধন এবং জনসাধারণ্যে কত শিক্ষাবিস্তার হইয়াছে। এই অবস্থায় শতাব্দী পূর্ব্বে পুলিসের কিরূপ প্রতাপ ও দৌরাত্ম্য ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। উদরের অন্নসংস্থানের পরেই লোকে জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদে ও শান্তির মধ্যে বাস করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। দ্বারকানাথ অন্ন সংস্থানে পথপ্রদর্শন করিলেন, বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিলেন, ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি। পুলিসের অবস্থা এবং ফৌজদারী বিভাগের দৌরাত্ম্য যে তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যাইবে, তাহা কখনই সম্ভবপর ছিল না। দ্বারকানাথের সময়ে পুলিসের জুলুম এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে তাহার প্রতিকার না করিলে ইংরাজ রাজত্বের উপরে ঘোর কলঙ্ক আসিত এবং এমন কি সেই জুলুম আরও অধিককাল স্থায়ী হইলে ইংরাজ রাজত্বের স্থায়িত্ব বিষয়েও আশঙ্কা আসিয়া পড়িত।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময়ে বিচার বিভ্রাটের চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে। কি দেওয়ানী, কি ফৌজদারী এবং কি পুলিশ সকল বিভাগেই বলিতে গেলে বিচার বিভ্রাট ছাড়া কথা ছিল না। বিচার বিভ্রাটই বা বলি কেন, প্রকৃত বিচার হইত কিনা সন্দেহ। বিচার গৃহ ধর্ম্মাধিকরণ নামের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। দেওয়ানী বিভাগের বিচার বিভ্রাট অথবা অত্যাচার তবু সহ্য হয়, কারণ তাহা হইতে অর্থ সাহায্যে নিষ্কৃতিলাভের আশা ছিল। জরিমানা হইল,

টাকা আদালতে ফেলিয়া দিলাম, নিষ্কৃতি পাইলাম। অথবা হুকুম হইল যে আমি আমার বিষয় পাইব না, অপরে পাইবে, তাহাও বুঝিলাম যে আমার বিষয় অপরকে দিলে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ফৌজদারী বিভাগের বিচার বিভ্রাট ঘটিলে লোকের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে। হত্যা না করিয়াও হত্যাকারী বলিয়া স্থির হইলে ফাঁসির হুকুম হইল। একবার ফাঁসি হইয়া গেলে তো আর সে ব্যক্তি পরে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইলেও ফিরিয়া জীবন লাভ করিতে পারে না। দেওয়ানী বিভাগে জরিমানা দিলাম, বিষয় সম্পত্তি হারাইলাম, ক্ষমতা থাকিলে আবার তদপেক্ষা অনেকগুণ অধিক বিষয় সম্পত্তি রোজগার করিবার সম্ভাবনা আছে। ফৌজদারী বিচারের ফলে একবার প্রাণ হারাইলে আর তাহা ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। পুলিস বিভাগও বলিতে গেলে ফৌজদারী বিভাগেরই একটি অঙ্গ। পুলিসের বিচারে ও নির্দ্দোষী দোষী সাব্যস্ত হইয়া শাস্তি প্রাপ্ত হইলে তাহা আর ফিরাইয়া লইবার প্রায় উপায় থাকে না। দোষী সাব্যস্ত হইয়া নির্দ্দোষীকে জেলে যাইয়া অপমান সহ্য করিতে হইল এবং হয়তো তথাকার পরিণাম এবং আহারাদির অভাবে শরীর ভাঙ্গিয়া গেল অথবা জেলের পরিবর্ত্তে যদি বেত্রাঘাতের আদেশ হয়, তবে তাহাই হইল, কিন্তু পরে সহস্রবার নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইলেও আর তাহা ফিরাইয়া লইবার উপায় নাই—যাহা হইল, তাহা হইয়া গেল, বিচারকালের জন্য একটা অন্যায় কলঙ্ক দাগিয়া গেল। দ্বারকানাথের সময়ে দেওয়ানী বিভাগের ন্যায় ফৌজদারী ও পুলিস বিভাগেও বিচার বিভ্রাট এতদূর গড়াইয়াছিল যে লোকেরা সহস্র প্রকারের অত্যাচার সহ্য করিলেও পুলিসে অথবা ফৌজদারীতে নালিস করিতে যাইত না, বরঞ্চ ঘুষ দিয়া নালিস করা অথবা কোন নালিসে সাক্ষ্য দেওয়া হইতে প্রাণপণে অব্যাহতিলাভের চেষ্টা পাইত।

আমাদের উপরোক্ত কথার যাথার্থ্য প্রত্যেক বিভাগের বিচার বিভ্রাটের কতকগুলি করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে প্রতিপন্ন করিব। দেওয়ানী বিভাগে লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত লইয়া যে বিচার বিভ্রাট হইয়া

গিয়াছে, তাহা অনেকদিন পর্য্যন্ত বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। আইন হইল বটে যে কতকগুলি অবস্থায় লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হইবে, কিন্তু অনেক স্থলেই সে সকল অবস্থার বিচার করিবার আর অবকাশ হইত না—লাখেরাজ শুনিলেই বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে। ইহাই কার্য্যত দাঁড়াইল। পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেট টেলার সাহেব এই বিচার বিভ্রাটের অনেকগুলি কীর্ত্তি রাখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বড়লাট সভা হইতে এক আইন পাস হইল যে বিচারকদিগকে তাঁহাদিগের বিচারপদ্ধতি সকল লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ হাইকোর্ট নিজেদের বিচার-পদ্ধতি সাধারণ্যে প্রকাশ করা স্থির করিলেন। সেই সকল প্রকাশিত বিচারপদ্ধতি হইতে অনেক বিভ্রাটের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

একবার ১৬০ টাকার একটি মকদ্দমা রুজু হয়। শুনিলে অবাক হইতে হয় যে আটদফায় এই মকদ্দমা আটজন বিচারকের নিকট বিচারার্থ আনীত হয়। সর্ব্বশেষ বিচারক স্থির করিলেন যে উভয়-পক্ষের সাক্ষ্য এমন সমান রকমের এবং খুব সম্ভবত একটি সাক্ষীরও বিবাদের প্রকৃত মুল বিষয়ের কোন তথ্যই জানা নাই, তখন বাদী ও প্রতিবাদীগণের মধ্যে টাকাটা বিভাগ করিয়া দিলেই সূক্ষ্ম বিচার করা হইবে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—রাজমহেন্দ্রীর দেওয়ানী জজের নিকট এক বিচার উপস্থিত যে বাদী একটা খতের বাবতে প্রতিবাদীর নিকট ৫৫ হাজার টাকা পাইবে। জজসাহেব মকদ্দমা তো ডিসমিস করিয়া দিলেন; কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া মিথ্যা মকদ্দমা আনয়নের কারণে বাদীর দাবী পরিমাণ টাকা অর্থাৎ ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করিলেন।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত—অপর একটি জজ সাহেব একটি মকদ্দমার রায়ে লিখিয়াছেন যে একটি বিশেষ দলিল প্রকৃত বা কৃত্রিম, তাহারই উপর সমস্ত মকদ্দমা নির্ভর করিতেছে। এদিকে সে বিষয়ে প্রমাণাদি গ্রহণ না করিয়াই ধরিয়া লইলেন যে দলিলখানি ঠিক। দলিলের স্বাক্ষরিত নামগুলি সত্যই স্বাক্ষরিত কিনা তাহার প্রমাণের জন্য কিম্বা দলিল-

খানি যে প্রকৃত নহে, জাল তাহারও প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিমত বিচার করিলেন। পরে যখন এই বিচারের বিরুদ্ধে আপীল হইল, তখম প্রকাশ পাইল যে ইহা মূল দলিলেরও নকল নহে, কিন্তু নকল দলিলের নকল।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত—ত্রিহুতের জজ সাহেব তাঁহার অধীনস্থ দেশীয় জজের সিদ্ধান্তের বিপরীত রায় দিলেন কিন্তু তাহা আবার আপীলে উল্টাইয়া গেল—আপীলের জজ তাঁহার রায়ে লিখিলেন যে জজ সাহেবের সিদ্ধান্ত নিতান্ত অবোধগম্য এবং পুনর্বিচারে এই বিষয়ে বোধগম্য রায় লিখিতে অনুরোধ করিলেন।[১]

পঞ্চম দৃষ্টান্ত—একবার একটি জজ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যে আইন রদ হইয়া গিয়াছে, সেই আইন অনুসারেই বিচার করিয়া দিলেন।

ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত—আর একবার একটি জজ অধীনস্থ দেশীয় জজের বিচারের আপীলে বাদীর দাখিলী দলিলগুলিকে প্রতিবাদীর দাখিলী দলিল স্থির করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে রায় দিলেন।

এইবারে ফৌজদারী বিভাগের বিচার বিভ্রাটের কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব। যদি এই সকল বিচারের ফলে লোকের প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয় উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে আমরা বিচারকদিগের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া অনেকবার হাস্যরসে নিমগ্ন হইবার অবসর লাভ করিতাম। এই সকল দৃষ্টান্ত সদর ফৌজদারী আপীল আদালত হইতে সংগৃহীত। আপীলের মকদ্দমা হইতেই যদি এই বিভ্রাটের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তবে যে সকল মকদ্দমায় আপীল হয় নাই, সেগুলি অনুসন্ধান করিলে যে আরও কত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে তাহার বোধ হয় সংখ্যা হয় না।

প্রথম দৃষ্টান্ত—একটি জজ সাহেব তাঁহার কর্ম্মস্থলে নূতন আসিয়া দেখিলেন যে একটি হত্যার মকদ্দমায় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জজ সাক্ষ্য

---

১ The decision of the judge is positively and absolutely unintelligible; the case is remanded and he is directed to try it again and to write an intelligible judgement upon it.

প্রভৃতি গ্রহণ করিবার পর প্রধান প্রধান সাক্ষী সকল তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। তিনি কি করেন, যে কয়েকজন সাক্ষী চলিয়া যায় নাই, এক অতি তুচ্ছ বিষয়ে তাঁহাদেরই সাক্ষ্য এবং কয়েদীদিগের একজনমাত্রের আত্মসমর্থক সাক্ষ্য লইলেন। পূর্ব্ব জজ-গৃহীত সাক্ষ্য এবং নিজ গৃহীত সাক্ষ্য এই উভয়ের উপরেই তিনি আসামীকে হত্যাপরাধে অপরাধী স্থির করিয়া প্রাণদণ্ড দিলেন এবং সত্যই সেই ব্যক্তির ফাঁসি হইয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—নিহত ব্যক্তির লাস পাওয়া গেল না, সুতরাং হত্যা হইয়াছে কিনা তাহাই স্থির হইল না, অথচ আসামী হত্যাপরাধী স্থির হইল।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত—জজ সাহেব আসামীর বক্তব্য জিজ্ঞাসা করিতেই ভুলিয়া গেলেন, অথচ সে হত্যাপরাধী স্থির হইল।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত—একব্যক্তি মনুষ্যবধ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া আসিল, জজ সাহেব সে বিষয়ে বিচার না করিয়াই প্রকাশ করিলেন যে তাহাকে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করা উচিত ছিল। এবং কেবল ইহা প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই—তিনি তাহাকে হত্যাপরাধে অপরাধী স্থির করিয়া বধদণ্ড প্রদান করিলেন। এই বিচারের ন্যায্যতা সম্বন্ধে পরে জজ সাহেব নিজেই সন্দেহ করিয়া উচ্চতর আদালতে বধদণ্ড অপেক্ষা অপর কোন লঘুতর দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে কিনা জানিবার জন্য মকদ্দমাটি প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কারণ যাহা দেখাইলেন, তাহা অতি অশ্রুতপূর্ব্ব যে 'পক্ষগণ পরস্পর আত্মীয় এবং পূর্ব্বে অত্যন্ত সদ্ভাবে ছিল'।

পঞ্চম দৃষ্টান্ত—একটি লোক তাহার ছেলের সঙ্গে নিজের কুটীরে ঘুমাইতেছিল। তাহাকে হত্যা করিবার অপরাধে দুইজন অভিযুক্ত হয়। আহত ব্যক্তির নাড়ীভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই অবস্থায় সহরের প্রধান ডাক্তারের নিকট নীত হয়। ডাক্তার তাহাকে 'নেটীব' দেখিয়া হাসপাতালের 'পটীবন্ধকের' (dresser) নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পটীবন্ধক বিশেষ কিছু করিতে পারিল না। তখন

ডাক্তার পরদিবস দেখিলেন যে আহত ব্যক্তির জীবন রক্ষা করা অসম্ভব, কিন্তু তথাপি অনেক মাইল দূরবর্ত্তী ক্যানানোর সহরে পাঠাইলেন। সেখানে ডাক্তার নাড়ীভুঁড়ি যথাস্থানে বসাইয়া দিলেও তাহাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। এই হত্যার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের একজন হত্যাপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু জজ সাহেব তাহার প্রতি দয়া প্রকাশের কারণ স্বরূপে বলিতেছেন—রাত্রি ঘোর অন্ধকার ছিল, তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির হত্যাকারী হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ আছে এবং আহত ব্যক্তি যথাসময়ে সেবাপ্রাপ্ত হইলে সম্ভবত বাঁচিতে পারিত।

ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত—একবার একটা লাস যে কাহার স্থির হইল না অথচ হত্যাপরাধে দুই বক্তির দণ্ড হইয়া গেল। উচ্চতর আদালতের জজ সাহেব এই রায় বাহাল করিবার কালে এবিষয়ে টুকিয়া মাত্র বলিলেন যে এরূপ যেন আর না হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের ফাঁসি হইয়া গেল।

সপ্তম দৃষ্টান্ত—রাগের বশে এক স্ত্রীলোক তাহার সন্তানকে মারিয়া ফেলিয়াছে স্বীকার করিল এবং তাহার প্রাণদণ্ড হইল। সেসন জজ সেই রায়ের বদলে তাহাকে আজীবন নির্ব্বাসন দণ্ড দিলেন কারণ 'নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা নিজেদের মেজাজের উপর কিছুমাত্র শাসন করিতে পারে না'।

অষ্টম দৃষ্টান্ত—উনিশ বৎসর পূর্ব্বে হত্যা করার অপরাধে এক ব্যক্তি সেসন জজের নিকট আনীত হয়। তিনি বধদণ্ডের পরিবর্ত্তে আজীবন নির্ব্বাসন দণ্ড দিলেন কারণ সেই হত্যার পর অবধি সে ব্যক্তি আর কোন উপদ্রব করে নাই। সুপ্রীম কোর্টের জজ এই দয়া প্রকাশে মত দিলেন কিন্তু অন্য কারণে—হত্যার পর বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে বলিয়া।

প্রায় চার হাজার মকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টে আপীল হইয়াছিল, তাহারই কতকগুলি দৃষ্টান্ত উপরে উদ্ধৃত হইল, কিন্তু এক লক্ষ সাত হাজার মকদ্দমার আপীলই হয় নাই, সেগুলির যে কি বিচারবিভ্রাট ঘটিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

এইবারে আমরা পুলিসের মকদ্দমার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া এরূপ বিচার বিভ্রাটের কারণ অনুসন্ধান ও আলোচনা করিব। ফৌজদারী বিভাগের সহিত পুলিসের বহুকালাবধি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ! পুলিস ধরিয়াই ফৌজদারীতে চালান দেয় এবং তথায় বিচার হইয়া আসামী শাস্তি বা মুক্তি পায়।

প্রথম দৃষ্টান্ত—এক সাহেব নালিস করিল যে তাহার বাবুর্চি পালাইয়াছে। সে ধৃত হইলে দেখা গেল যে কোন পূর্ব্ব দোষের জন্য তাহার কান কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। হুকুম—দশ বেত।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—এক ক্রীতদাসী পলাতকা হওয়াতে চৌকিদার কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হুকুম হইল ৫ বেত।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত—বেণীবাবু কাপ্তেন স্কটের গাড়ী মেরামত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া না করাতে হুকুম দশ জুতা।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত—মহম্মদ রামজানের বিরুদ্ধে নালিস করিল যে তাহার স্ত্রী মহম্মদের স্ত্রীকে গালি দিয়াছে। দেখা গেল যে উভয়ের স্ত্রীই দোষী। হুকুম যে আদালতের সময় তুচ্ছ বিষয়ে নষ্ট করিবার অপরাধে উভয় পক্ষেরই ৫৲ টাকা করিয়া জরিমানা হইল।

পঞ্চম দৃষ্টান্ত। সেজ সাহেব বলেন যে খোদাবক্স ও পেয়ারী আগাম বেতন লইয়াও কাজে মন দেয় না এবং অন্য জায়গায় কাজের চেষ্টা করিতেছে। হুকুম দশ জুতা।

এতদূর পর্য্যন্ত সকল বিভাগেরই বিচার বিভ্রাটের দৃষ্টান্ত দিয়া আসিলাম, এইবারে এরূপ বিচার বিভ্রাট হইবার কারণ কি একবার আলোচনা করিয়া দেখিব। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে দুইটি প্রধান কারণ দেখিতে পাই—একটি 'হেলিবেরি' এবং দ্বিতীয়ত দেশীয়গণকে উচ্চ কার্য্যে নিয়োগ না করা।

ইংলণ্ডে 'হেলিবেরি' নামক স্থানে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানার একটি বিদ্যালয় ছিল, সেইখানে কোম্পানীর প্রধান অংশীদারগণের যে সকল আত্মীয় নিতান্ত অকর্মণ্য তাহারা সেই বিদ্যালয়ে দুই একবৎসর কাটাইলেই ভারতে কর্ম্মের অধিকার লাভ করিতেন। ১৭ হইতে ২১

বৎসরের মধ্যে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রবেশ প্রার্থীকে 'ক্লাসিক্যাল' ভাষা সম্বন্ধে একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত। এই পরীক্ষা এত সহজ ছিল যে তাহার জন্য প্রায় কাহাকেও প্রস্তুত হইতে হইত না। তাহার পর 'হেলিবেরি'তে অস্ফুট সিবিলিয়ান দুই বৎসর বাসা বাঁধিয়া থাকেন এবং ভবিষ্যতের ভারতীয় কর্ত্তব্য সমুদয় সুনির্ব্বাহ করিবার জন্য সংস্কৃত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। ইহার উপর আবার পারস্য ভাষায়ও কিছু আলোচনা করিতে হয়। কিন্তু 'হেলিবেরি'র সর্ব্বপ্রধান কার্য্য সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ। যে পরীক্ষায় ছাত্রগণ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইবেন, সেই পরীক্ষা ক্ষেত্রে প্রাচ্যভাবের বড় বেশীরকমের ভড়ং দেখান হইত। সেই পরীক্ষায় সংসারক্ষেত্রে বিচরণের উপযোগী কোন বিষয়েরই পরীক্ষা লওয়া হইত না। অধিকন্তু পরীক্ষার ফলে প্রায়ই প্রকাশ পাইত যে বিশজনের মধ্যে উনিশজন পরীক্ষায় চূড়ান্ত পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন আর বাকী একজন খুব সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইবার পর কোম্পানীর ডেপুটী চেয়ারম্যান একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া দেন যে তাঁহাদের আশা সুদূর বিস্তৃত। ব্রিটিস সাম্রাজ্যের ও ক্ষমতার বিস্তৃতির সঙ্গে তাঁহাদেরও কর্ম্মক্ষেত্র কত বিস্তৃত। কোটী কোটী লোকের উপর তাঁহারা শাসন প্রভাব বিস্তৃত করিতে যাইতেছেন। এই শাসন কার্য্যে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ সাহায্য করিবে। পারস্য ভাষায় অধিকার প্রজাদিগের মঙ্গল সাধন করিবে। পেলির ধর্ম্মবিজ্ঞান রাজস্ব আদায়ের সহায়তা করিবে। গ্রীক গ্রন্থ সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার কার্য্যে সহায়তা করিবে। এইরূপ লম্বা চৌড়া বক্তৃতার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সংস্কৃত ভাষা, পেলির ধর্ম্মবিজ্ঞান এবং আত্মাভিমানে পূর্ণ হইয়া বালক সিবিলিয়ানগণ ভারত শাসনে আসিতেন। তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কারণ বিজ্ঞান চর্চ্চা করিলে হয়তো জগতের প্রকৃত উপকারে আসিতেন, কিন্তু সংস্কৃত বুলি শিক্ষা করিলে চাকুরী পাওয়া যাইত—উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

এদেশে আসিয়া যতদিন না কাজ পান, ততদিন তাঁহারা কেরানী বলিয়া অভিহিত হইতেন। এই কেরানীদিগকে সংস্কৃত ও পারস্য প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষার সম্পূর্ণতালাভের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বৎসর দুয়েক অধ্যয়ন করিতে হইত। বিলাতে এত খ্যাতি লাভ করিয়া এদেশে আবার জোয়ালের নীচে ঘাড় পাতা অপমানজনক বিবেচনা করিয়া কেরানীগণ ফোর্ট উইলিয়মে থাকিবার কয়েক বৎসর সাধ্যমত আমোদ প্রমোদেই কাটাইয়া দিতেন। হাজার পাঁচ করিয়া বৎসরে বেতন পাবেন, তাহাতে তাঁহাদের চলিবে কেন? তাহার তিন গুণ খরচ করিয়া বসিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যখন এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক, তখন অগত্যা দু-চারমাস দু-এক খানা পুস্তকের দু-চার পাতা এক পণ্ডিত বা মৌলবীর সাহায্যে দেখিয়া লইতে হয়—আর তাহা করিলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, কারণ যিনিই অধ্যাপক, তিনিই পরীক্ষক। এই প্রকারে উত্তীর্ণ হইলেই অমনি কেরানীপুঙ্গব মেজিষ্ট্রেট বা সহকারী কলেক্টররূপে নিযুক্ত হইয়া মফঃস্বলে প্রেরিত হইলেন—সেখানে সাহেবের প্রাচ্য ভাষার অধ্যয়ন কোন কার্য্যেই আসিবে না।

কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ একবার কোম্পানীরই অধীনস্থ এক কর্ণেল ছিলেন। তিনি ছাত্রগণের অধ্যয়নে অধিকতর মনোযোগ আনয়নের চেষ্টায় ছিলেন—সকলই বৃথা! একবার এই প্রাচ্যভাষার মহারথী ছাত্রগণের একজন পারস্য ভাষার পাঠগুলি নিজে সম্পূর্ণ না করিয়া অপর এক ছাত্রের লিখিত হইতে নকল করিতেছেন ধরা পড়িলেন। কর্ণেল বারণ করাতে কোরক-কলেক্টর রোষ-কষায়িত নেত্রে কর্ণেলকে বলিলেন যে তাঁহার ঘাড়ের উপর দিয়া লুকায়িতভাবে দেখিয়া নিতান্ত অভদ্রোচিত কার্য্য করিয়াছেন। কর্ণেল এই ভাষা প্রয়োগ উপরিতন কর্ম্মচারীর নিকটে জানাইলেন—ফলে তাঁহারা তাহা উপেক্ষা করিলেন। পরীক্ষার পূর্ব্বে যাহাতে ছাত্রদের অন্তত কতক পরিমাণে পাঠে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, সেই কারণে একবার প্রত্যেক ছাত্রকে একটা

exercise পারস্য বা উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিতে দেন। পাছে পরস্পরে দেখাদেখি করে, এই কারণে প্রত্যেককে পৃথক ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল। সকলেই নিজের নিজের সহিসকে দিয়া পাখা টানাইবার অনুমতি প্রার্থনামত লাভ করিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র করিয়া নিজেদের অধ্যাপকগণকে সহিসের বেশে সাজাইয়া আনিলেন এবং exercise শেষ করা পর্য্যন্ত সহিসবেশী অধ্যাপককে ঘরে বসাইলেন এবং নিজেরা পাখা টানিতে লাগিলেন।

এই প্রকার ছাত্র পরে যে কিরূপ বিচারক হইবেন, তাহা আর দুইবার করিয়া বলিয়া দিতে হয় না।

সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত অন্যান্য আদালতসমূহ 'হতভাগ্যদিগের আশ্রয় স্থান' হইয়া পড়িয়াছিল। যখন কোন সিবিলিয়ান সর্ব্ববিষয়ে একেবারে বুদ্ধিহীনতা প্রকাশ করিলেন তখনই তিনি জজের পদে নিযুক্ত হইতেন, কর্তৃপক্ষ seniorityর উপরে উন্নতি করিতে বাধ্য হইতেন না। হয়তো যে পদে বসিলেন চিরজীবন সেই পদেই কাটিয়া গেল। মাতার অঞ্চল ছাড়াইয়া অনভিজ্ঞ নবীন যুবকদিগকে সহসা আনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর প্রভৃতির পদে বসাইয়া দেওয়াতেই এইরূপ ফল ফলিয়াছিল। এমন কি ক্যাম্বেল মহোদয়ও তাঁহার *Modern India* গ্রন্থে বলিয়াছেন 'It seems to be considered that if at this time of life a man is fit for anything at all, he is fit for a judge ; and if he is fit for nothing, better make him a judge and get rid of him ; for once in that office, he has no claim to further promotion by mere seniority alone.' ডিরেক্টরগণও দেওয়ানী বিচারকদিগের অক্ষমতা বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন। গবর্ণর জেনেরেলের কৌন্সিলের সভ্য বিদ্বান্ সেক্সপীয়র সাহেবও এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—'Defective as the system unquestionably was, under which young men, almost immediately

on their quitting colleges were intrusted with the decision of civil suits, though small in amount, the present system, under which the judge will take his seat on the bench, utterly ignorant of the forms of pleading, of the rules of appeal, and of the constitution and powers of the courts below, which he is expected to control, is a hundred times worse.'

যদি কোন সিবিলিয়ান একটু কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলেন, তবে তাঁহাকে রাজস্ব বিভাগে রাখা হইল। রাজস্বের প্রতি ডিরেক্টরগণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তবে এই বিভাগও যে একেবারে কার্য্যকুশল সিবিলিয়ানে পূর্ণ ছিল তাহা নহে। এক রিপোর্টে গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে এই বিভাগেরও কর্মচারীগণ সাধারণত অত্যন্ত অকর্মণ্য, কারণ 'It is unreasonable to expect a collector to be competent to review a settlement, if he does not know what a settlement is, or how it is to be made!' আরও 'it cannot he right that the officer who has to review all the settlements made in his district, to administer every ward's estate, and to manage every estate that cames under his own immediate superintendence should have no personal acquaintance with any part of his district out of sight of his own house; should never have any direct or intimate relations with ryat or talookdar, or any practical knowledge of the rates, tenures, and common agricultural customs of his district.'

একে তো রাজ্য পরিচালনের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকেই এইরূপ নীরেট মূর্খ ছিলেন। তাহার উপর সেই ইংরাজ আমলের আদিম কালে এক এক জনের উপর কার্য্যভারই বা কত ছিল। লর্ড

কর্ণওয়ালিসের আমলে দেশীয়দিগকে কোন প্রকার উচ্চপদ দেওয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইতিহাসে দেখা যায় যে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে দেশীয়দিগের সহিত মিশিলে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী-দিগের নীতি দূষিত হইবে। কারণ যাহাই হউক, দেশীয়দিগের উচ্চপদ পাওয়া যে কর্ণওয়ালিসের আমলে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। তাহার ফলে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীগণের উপর অতিরিক্ত কার্য্যভার পড়িয়া গেল। এই উষ্ণপ্রধান দেশে সেই পাখাখবরফহীন কালে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিসমুহের প্রতি যখন গবর্ণমেণ্টেরও দৃষ্টি ছিল না সেই কালে, ইউরোপীয়গণের হস্তে কোন কার্য্যের আগাগোড়া ভার প্রদান করিলে যে তাহা সুনিষ্পন্ন হইত না, তাহা বোধ করি বিস্তৃতভাবে বলিয়া দিতে হইবে না। যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে প্রাণপণ চেষ্টাতেও কার্য্য শেষ করিতে পারিবেন না তখন বুদ্ধিমানের মত কার্য্য দেশীয় আমলাদিগের হস্তে দিয়া আলস্যে গা ঢালিয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত স্থির করিলেন। প্রভাতে উঠিয়াই স্বার্থপর দেশীয় লোকদিগের সেলাম গ্রহণ করাই ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির একটি প্রধান কার্য্য ছিল। তাহার পর তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া প্রাতঃকাল এবং মধ্যাহ্নকালের অর্দ্ধেক অংশ কাটাইয়া দিলেন। তাহার পর আহার এবং খেলিবার বন্দোবস্ত করিতেই অবশিষ্ট কাল কাটিয়া গেল। আমরা জানি একজন সিবিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট এক অতিবৃহৎ ডিস্ট্রী:ক্টের চার্জ্জে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। দিবারাত্রই তাঁহার প্রিয় বাদ্যযন্ত্র লইয়া রহিয়াছেন। এখন গবর্ণমেণ্ট হইতে নানা বিষয়ের রিপোর্ট চাহিয়া চিঠি আসিতে লাগিল। তিনি সে চিঠি ছিন্নপত্রের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করিতেন। তাহার পর তাগিদও যতকিছু আসিত সকলেরই সেই একই দশা হইত। যে বিষয়ে তাঁহাকে নিতান্ত ধরপাকড় করা হইত, সে বিষয়ের কোন পত্রের প্রাপ্তি অস্বীকার করিয়া বসিতেন—প্রকৃতই তিনি দেখিতেন না এবং জানিতেন না যে কোন্ বিষয়ের কি চিঠি আসিয়াছে। সে সময়ে সিবিলিয়ানদিগের একটা ভাল কাজ দেখাইয়া

উন্নতির ইচ্ছা ছিল না, কারণ তাঁহারা জানিতেন যে যথানিয়মে তাঁহাদের উন্নতি হইবে। ২

যে সকল সিবিলিয়ান আবার সকল কাজের বাহির, কি ম্যাজিষ্ট্রেট, কি কলেক্টর, কোন কর্ম্মই ভাল করিয়া করিতে পারিতেন না, তাঁহাদিগকেই জজিয়তি দেওয়া হইত, এই কারণে জজের পদ 'হতভাগ্য দিগের আশ্রয়স্থান' বলিয়া কথিত হইত। ক্যাম্বেল সাহেব বলেন 'It seems to be considered that if at this time of life a man is fit for anything at all, he is fit for a judge ; and if he is fit for nothing, better make him a judge and get rid of him ; for once in that office, he has no claim to further promotion by mere seniority alone ; this—speaking of promotion as a matter of course, without reference to qualifications.'

এইবারে সেকালে পুলিসের অবস্থা আলোচনা করা যাক। দারোগাই হলেন পল্লীগ্রামে পুলিসের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। কোন কিছু অন্যায় কর্ম্মের সন্ধান পাইলেই দারোগাই প্রথম তদারকে যান। ফরিয়াদীর সাক্ষ্য শপথ করাইয়া লওয়া হয়। সার জন শোর তাঁহার 'ভারতীয় কার্য্যাবলী সম্বন্ধে টীকা' নামক পুস্তকে সেকালের পুলিস সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন।

তিনি বলেন যে অবৈধ উপায়ে কেহ মরিলে তাহার শব পরীক্ষার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর অনেকবার হুকুমজারী হইয়াছে, কিন্তু

২ The bulk of both services are below the average of educated men at home and it is not difficult to understand why they should be ... They settle down in some civil or military station, as the case may be, where temptations to idleness are always greater than inducements to exertion ; their acquaintance is exceedingly limited ; and they are throughout life absolutely without the stimulants that rouse ability in great communities ; if they live, they rise, and in this conviction they remain in a state of mediocrity and contentment.

বন্দোবস্তের অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠে না। দারোগা তদারক করে। কোন চোরাই মাল আছে বিশ্বাস করিলে তদারক করিতে পারে, কেবল মেয়েদের সরাইবার একটা নোটিশ দেয় মাত্র। হাটবাজারে উপস্থিত থাকিয়া দাঙ্গায় প্রতিরোধ করে। আর দাঙ্গা হইলে দাঙ্গাকারীদিগকে ধরিয়া চালান দেয়। চৌকিদার গ্রামের পঞ্চায়েৎ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলেও পুলিসের অধীনে কার্য্য করে। বাকী খাজনার জন্য ক্রোক করিবার সহায়তা করে। রাস্তার উপর বেদখলী আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে।

দারোগার উপর ছোটোখাটো অপরাধে নিজে যাইয়া তদারকের হুকুম আছে। শুনিতে ভাল বটে, কিন্তু দেখা যায় যে এক একটি দারোগাকে ১৬ মাইল বর্গ পরিমিত স্থান কোথাও বা ২০০ মাইল বর্গ পরিমিত স্থান দেখিতে হয়, সেখানে এরূপ করা কি সম্ভব? অনেক স্থানের মধ্য দিয়া নদী গিয়াছে, বর্ষাকালে খেয়ায় পার হইতে ৪।৫ ঘণ্টা লাগে। ফলে দাঁড়ায় এই যে অনেক স্থলে এক ordinary কনেষ্টবল দ্বারা তদারক করাইতে হয়।

চৌকীদারের জন্য বিলিব্যবস্থা কাগজ পত্রে ভাল আছে কিন্তু ইংরাজ গবর্নমেণ্টের দাবী দাওয়া পরিশোধ করিতে গিয়া গ্রামের মণ্ডল চৌকীদারী জমি আর রাখিতে পারে না, আত্মসাৎ করে। সুতরাং চৌকীদারী ব্যবস্থাও আর থাকে না।

পুলিসের অসীম ক্ষমতা—হত্যা প্রভৃতি বড়ছোট সকল রকম অপরাধেরই অনুসন্ধান (investigation) করিতে পারেন; গোয়েন্দার কথায় যত বড়লোক হউক না কেন, গ্রেপ্তার করিতে পারে, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে চালান দিতে পারে, আবার কয়েক স্থলে জামিনে ছাড়িতে পারে। কিন্তু কোন বিষয়েই শেষ হুকুম দিতে পারে না।

কনেষ্টবল হইতে উচ্চতর কোন পুলিস কর্ম্মচারী তাহার মাহিনাতে জীবনধারণ করিতে পারে না। যে পরিমাণ স্থান তাহাদিগের অধীনে থাকে, তাহাতে দারোগার দুইটা ঘোড়া, কেরানীর একটা এবং জমাদারের একটা কর্ত্তব্য ঠিকমত করিতে গেলে দরকার।

এই ঘোড়ার খোরাকী তাহাদের বেতন ছাড়াইয়া যায়। এই কারণে, যখন তাহারা কর্ম্ম পায়, তখন ধরিয়া লয় যে উপরি পাওনা আছে। কি রকমে পায় নীচে দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে কর একটা হত্যা হইয়াছে, পুলিস কর্ম্মচারী তদারকে গ্রামে চলিলেন। মণ্ডলকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধেক পল্লাবাসীকে ডাকা হইল—তাহাদিগকে একটি ইঙ্গিত দেওয়া হইল যে সকলকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাড়ী যাইতে হইবে। সকলেই এই ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কিছু কিছু ঘুষ দিল। ফরিয়াদীর সহিত কোন সম্পর্কে আসা ঘোর বিপদ বলিয়াই গণ্য হইত।

দুটো বড় গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ঝগড়া লাগিলে পুলিসের পোয়া বার।

পথিক যাইতেছে, চোর তাহার সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া ধরা পড়িল, তবু পথিক বলে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।—কিছু দিয়া ছাড়ান পায়, তাহা না হইলেই ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে চুরি প্রমাণ করিবার জন্য মাসখানেক বাঁধা থাকিতে হইত।

কত লোকে লোকসান সহ্য করিয়াও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির হইতে রাজী হইত না। একদিকে পুলিশকে ঘুষ দিয়া নিজেরা রক্ষা পায়, অপর দিকে পুলিশকে বাঁচাইবার জন্য কাগজে সহি করিয়া দেয় যে তাহাদের কোন চুরি হয় নাই।

রসদ প্রভৃতি জোটান পুলিসের একটি সহজ উপায়। দরকার হইল দশখানা গাড়ী, টানিয়া আনা হইল পঞ্চাশ খানা। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া ৪০ খানা ছাড়িয়া দিয়া দশখানা ম্যাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

অনেক বালক ম্যাজিষ্ট্রেট যে সকল অপরাধে অপরাধী ধরা পড়ে না, সেই সকলে হুকুম দেন! প্রত্যেক স্থান খোঁজা হউক, যদি এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যেও অকৃতকার্য হয়, তবে গ্রামের মণ্ডলকে ও চৌকীদারকে আদালতে পাঠাইতে হইবে। কোন কোন ম্যাজিষ্ট্রেট একেবারে উহাদিগকে ধরিয়া আনিতে বলেন। কেহ বা চৌকীদারকে

এবং কেহ বা নিকটবর্ত্তী পাঁচ ছয়টা গ্রামের মণ্ডলদিগকে ধরিয়া আনিতে বলেন। কখনও কখনও অন্যান্য যে কেহ 'ওয়াকিবহাল' তাহাদিগকে আনিবার আদেশ হয়। ইহার উপর নির্ভর করিয়া পুলিসের লোক যাকে মনে করিত যে কিছু জানে তাহাকেই ধরিয়া আনিত। ইহার ফলে, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে সপ্তাহ কয়েক অপেক্ষা করিয়া ডাক হইল, এবং কোন অনুসন্ধান না করিয়াই মণ্ডলদিগের জরিমানা হইল, চৌকীদারদিগের বেত্রদণ্ড হইল, কারণ গ্রামের মধ্যে একটা চুরি হইয়াছে! সম্ভবত অপর গ্রাম থেকে চোর আসিয়াছিল, কারণ নিজের গ্রামে প্রায় চুরি করে না।

সেকালে সময়ে সময়ে পুলিসের হাতে ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকেও জব্দ হইতে হইত। ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গোয়েন্দাদিগের কথায় ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিত। আর লোকেরা আট আনার ষ্ট্যাম্প কাগজে দরখাস্ত করিলেও এইরূপ হইতে পারিত। তখন পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিতেন।

সকল সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতিরও দোষ ছিল না। তাঁহারা একাধারে ম্যাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর এবং অনেক সময়ে জজ পর্যন্ত। তাহা ছাড়া ট্রেজীয় অফিসার প্রভৃতি এক একটা জিলায় ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক কার্য্যভার ছিল; এত যে পেরে উঠিতেন না। কাজেই নিম্নতন কর্ম্মচারী বা আমলাদিগের দ্বারাও অনেক কাজ করাইয়া লইতে হইত। একজন ম্যাজিষ্ট্রেট নিজের রায় পর্য্যন্ত লিখাইয়া লইয়া সহিমাত্র করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপে হলওয়েল সাহেব খাজানা আদায় হইতে রাস্তা মেরামত প্রভৃতি সমস্তই দেখিতেন। পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাড়ীর এসেস্‌মেণ্ট শুদ্ধ করিতেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে যখন সনন্দ নূতন করিয়া লইবার কথা হয়, তখন উদারতা দেখাইবার জন্য এবং অনেকটা বাধ্য হইয়া ডিরেক্টরবর্গ স্বীকার করিয়াছিলেন যে জাতি নির্বিশেষে এবং ধর্ম্ম নির্বিশেষে দেশীয়দিগকে উচ্চ রাজপদসমূহে নিয়োগ করিবেন। লর্ড

কর্ণওয়ালিশ দেশীয়দিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময় হইতেই প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে দেশীয়দিগকে নিয়োগ না করিলে শাসনকার্য্য আর চলিতে পারে না। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এক আইনের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের চিঠি ছিল। শালিভান সাহেব পক্ষে মত দিলেন এবং মেনভিল সাহেব বিপক্ষে। গবর্ণমেণ্ট কাজ দেশীয়দিগকে দিলেও ডিরেক্টরগণ দিতেন না। '৩৩ খৃষ্টাব্দে নূতন সনন্দে উল্লিখিত দেশীয় নিয়োগবিধি—দেশীয়দিগের প্রশংসামাত্র, বিশেষ কোন কার্য্যের হয় নাই। অবশেষে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে পুলিশ সংস্কারের জন্য এক কমিশন বসে—বার্ড সাহেব তাহার চেয়ারম্যান। দ্বারকানাথ তাঁহার সাক্ষ্যে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন যে দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট চাই—আর যদি ইউরোপীয় বা ইউরেশীয় হয়, তাহাদের দেশের ভাষা জানা চাই। ভদ্রঘরের হওয়া চাই—দারোগা ও কেরাণী-শ্রেণী থেকে লইলে চলিবে না। গবর্ণমেণ্টের নিজের হাতে থাকা চাই। গবর্ণমেণ্ট বিলম্ব না করিয়া ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ কার্য্যে পরিণত করিলেন। প্রথম যে কয়জন ডেপুটি হইয়াছিলেন, হয় তাঁহারা ভদ্রঘরের সন্তান অথবা হিন্দু কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র। যেখানে অপরাধের সংখ্যা অধিক, সেই সকল স্থানে ইহারা নিযুক্ত হইলেন। ফলে অপরাধের সংখ্যা কমিয়া গেল এবং তাঁহাদের বাসস্থান সভ্যতা বিস্তারের কেন্দ্র হইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

জমিদার সভা স্থাপন

কালা আইনের আন্দোলনকালে দ্বারকানাথ ঠাকুর একতার ফল বিশেষ অনুভব করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে কয়েকজন ইংরাজের সমবেতশক্তি কিরূপ কার্য্য করিতে পারে, তাহার বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছিল। তিনি সংবাদপত্র এবং সভার নামের মহিমা বিশেষ অনুভব করিয়াছিলেন। তাই একদিকে যেমন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতেছিলেন, সেইরূপ বঙ্গদেশের জমিদারগণের শক্তি সংহত করিবার জন্য 'জমিদার সভা' নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই সভা স্থাপিত হয়। নিজের বসতবাটীর সন্নিকটস্থ এক বাটীতে ইহার অধিবেশন হইত। 'ইংলিশম্যান' কাগজের সম্পাদক W. C. Hurry ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু দ্বারকানাথই এই সভার প্রাণ ছিলেন। গবর্ণমেণ্টকে এই সভা প্রতিষ্ঠার সংবাদ প্রেরণ করাতে গবর্ণমেণ্ট ইহাকে জমিদারদিগের সহিত কথোপকথনের মাধ্যম (medium) স্থির করিলেন। তখন গবর্ণমেণ্টের সচিব (Secretary) ছিলেন H. Z. Princep—ইঁহারই এক ভাই উইলিয়ম প্রিন্সেপ কার-ঠাকুর কোম্পানীর অংশীদার ছিলেন।

১৯শে মার্চ্চ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এই জমিদার সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে টাউন হলে একটি সভা ডাকা হয়। সেই সভায় যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, ইংরেজদের মধ্যে টি. ডিকেন্স, জি. প্রিনসেপ এবং ডেভিড হেয়ার। রাজা রাধাকান্ত দেব এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

প্রথম বছরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য নির্ব্বাচিত হন। টি. ডিকেন্স, জি. প্রিন্সেপ, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর,

রাজা রামনারায়ণ রায়, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু আশুতোষ দেব, রামরতন রায়, রামকমল সেন, মুন্সী আমীর, কুমার সত্যচরণ ঘোষাল ও রাজা বরদাকান্ত রায়। পরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ সভ্যপদে নিযুক্ত হন—পুঁটিয়ার রাজা ভৈরবচন্দ্র নারায়ণ রায়, শ্রীমতী মহারাণী কৃষ্ণমণি ঠা, কাশীনাথ সান্যাল, রাজসাহী, যশোহরের রাজা বরদাকান্ত রায়, শ্রীমতী রাণী কাত্যায়ণী ঠা দেওয়ান কৃষ্ণপ্রসাদ রায়, নড়ালের বাবু রামরতন রায়, টাকীর রায় কালীনাথ চৌধুরী, রায় রাম বল্লভ, তারাপ্রসাদ রায়চৌধুরী, রানাঘাটের নীলকমল পাল চৌধুরী ও জয়চাঁদ পালচৌধুরী ; নদীয়া জেলার সেবানিবাসের স্বরূপ চন্দ্র সরকার, প্রাণনাথ চৌধুরী, উদয়নারায়ণ মণ্ডল, উমেশচন্দ্র রায় ওরফে শান্তিপুরের মতিবাবু, মথুরামোহন বিশ্বাস, উলার (নদীয়া) বামনদাশ মুখোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তাফী ; বিশ্বনাথ মতিলাল, ঈশানচন্দ্র রায় (শান্তিপুর), মধুসূদন সান্যাল, রঘুনাথ গোস্বামী (শ্রীরামপুর), এ. সি. ডানলপ এস্কোয়ার, ওয়েন জন এলিয়াস, এস্কোয়ার, মেসার্স ডসন্ এণ্ড কোং, মুন্সী গোলাম নবি, মহম্মদ আমীর, ডেভিড হেয়ার এস্কোয়ার, জর্জ প্রিন্সেপ এস্কোয়ার, মেসার্স কার ঠাকুর এণ্ড কোং, ম্যাকিলপ ষ্টুয়ার্ট এণ্ড কোং, টি. ডিকেন্স এস্কোয়ার, আলেকজাণ্ডার বিন্নী এস্কোয়ার, মুন্সী হবিবপ হোসেন, আর জি. বাগশ এস্কোয়ার, সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল আমিনুদ্দীন এবং কলকাতার অন্যান্য সরকারী বেনিয়ানগণ।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩০ নবেম্বর এই সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়—তাহাতে দেখা যায় প্রথম বৎসরেই অনেক গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন—(১) লাখেরাজ বাজেয়াপ্তি, (২) বিচারালয়ে দেশীয় ভাষা প্রচলন, (৩) ভারতীয় ও কানেডীয় তামাকের শুল্কভেদ, (৪) গমস্তাদিগের জামিননামার কোর্টফীর পরিবর্ত্তন, (৫) পিয়াদাদের তলবানা, (৬) চৌকীদারদিগের জন্য কাটিঘর, (৭) পুলিস কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিলে কারাদণ্ড, (৮) ফৌজদারী সাক্ষীর খোরাকী এবং (৯) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সহিত যোগদান।

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশান

রামমোহন রায়ের বন্ধু আডাম সাহেবের সহিত এই যুবকদলের (চক্রবর্ত্তী) বড় মিত্রতা ছিল। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তিনি ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া অনেক কাজ করিতেন। তাঁহার ভবনে মধ্যে মধ্যে যুবকদলের সম্মিলন হইত। আডাম ঠিক কোন সালে স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডে গিয়াও ভারতবর্ষকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রধানত তাঁহারই উদ্যোগে ইংলণ্ডে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। ভারতবাসীর সুখদুঃখ ইংলণ্ডের লোকের গোচর করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই সভা জর্জ্জ টমসন, উইলিয়ম এডনিশ, মেজর জেনারেল ব্রিগস প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিয়া ইংলণ্ডের নানাস্থানে ভারতবর্ষ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়াইতে আরম্ভ করেন। ঐ সভা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাডভোকেট' নামে এক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। আডাম সাহেব তাহার সম্পাদক হইয়াছিলেন। ঐ সভা স্থাপিত হইলেই রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি পত্রযোগে আডামকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিলেন এবং বোধহয় প্রচুর অর্থসাহায্য করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বড় দুর্ভিক্ষ হয়—সেই সংবাদ বিলাতে পৌছায়। জর্জ্জ টমসনও আমেরিকার নিগ্রোদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সবেমাত্র জয়ী হইয়াছেন। তিনি ভারতের প্রজাদিগের উপকার করিবার সর্ত্তে—প্রটেক্‌সান সোসাইটির সহিত যোগ দিলেন। তিনি দেখিলেন যে একটি পৃথক সভা স্থাপন করা আবশ্যক। এই কারণে এই সভা স্থাপনের জন্য একটি অস্থায়ী কমিটি করিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এই সভা লর্ড ব্রুহামের সভাপতিত্বে

লণ্ডনস্থ ফ্রীমেসান হলে সাধারণ সভায় প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টায় বিলাতের চতুর্দ্দিকে ভারতের আলোচনা সভা বসিতে লাগিল। এদিকে 'এডিনবরা রিভিউ'তে তাঁহার উদ্দেশের বিরুদ্ধে লেখনী চালিত হইতে লাগিল। তিনিও 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাডভোকেট' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিলেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির লণ্ডনে প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। প্রতিষ্ঠানে যে প্রস্তাব পাস হইয়াছিল তাহা হইতেই কি আদর্শ দ্বারা তাহা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল বেশ বোঝা যায়। তাহাতে বলা হইয়াছিল—'এই সাম্রাজ্যের অধিবাসীগণ তথা সরকারের সভ্য সমাজের নিকট ভারতের ইংরেজ শাসন যাহাতে এমন নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যাহার ফলে দেশীয় মানুষের সুখ ও উন্নতি রক্ষিত—তাহার জন্য দায়ী।'

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে জর্জ্জ টমসন নামে এক ইংরেজ রাজনৈতিক নেতা ভারতে কল্যাণসাধনে বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছিলেন। এই সময় দ্বারকানাথ বিলাতে ছিলেন। তিনি টমসনকে ভারত দর্শন করিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। তিনি সম্মত হন। এখানে শিক্ষিত ভারতবাসীগণ তাঁহাকে একান্ত আন্তরিকতার সহিত অভ্যর্থনা জানান। প্যারিচাঁদ মিত্র, চন্দ্রশেখর মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁহাদের অন্যতম। মিঃ টমসনের সহিত আলাপ আলোচনার ফলে তাঁহার পরামর্শে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র একটি বঙ্গীয় শাখা স্থাপিত হইল। পরে তাহা ল্যাণ্ড-হোলডর্স সোসাইটির সহিত যুক্ত হইয়া 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান' নামে পরিচিত হইল।

কালা আইনের বিরোধী ইংরাজগণ জয়যুক্ত হইলেন, যে আন্দোলনের ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা থামিয়া গেল। মহামতি বীটন পরলোক গমন করিলেন, কিন্তু দেশীয় শিক্ষিতজনের মনে একটা গভীর অসন্তোষ থাকিয়া গেল। একতা ও আন্দোলনের দ্বারা কি হয় তাহা তাঁহারা চক্ষের উপর দেখিলেন। ইংরাজগণ তাঁহাদের চীৎকার

ধ্বনিতে কিরূপ ভুবন কাঁপাইয়া তুলিলেন, কিরূপে দেখিতে দেখিতে ৩৬০০০ হাজার টাকা তুলিলেন, এ সমুদয় অভিনয় যেন ছায়াবাজীর ন্যায় তাঁহাদের চক্ষের উপর দিয়া হইয়া গেল। রামগোপাল ঘোষ ইংরাজদিগের অবলম্বিত নীতির প্রতিবাদ করাতে 'এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি'তে যেরূপে তাঁহাকে অপমানিত হইতে হইল তাহাও সকলে দেখিলেন। অনেকে সেই অপমানে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিলেন। এই সকল কারণে শিক্ষিত দলের মধ্যে রাজনীতির আন্দোলনের জন্য সম্মিলিত হইবার বাসনা প্রবল হইল। তাঁহারা বুঝিলেন স্বদেশের হিতের জন্য সমবেত হইতে হইবে। সে সময়ে দেশীয় শিক্ষিত দলের মধ্যে দুইটি সভা ছিল। প্রথমটি দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোলডার্স এ্যাসোসিয়েশান' বা বঙ্গদেশীয় জমিদার সভা। কলিকাতায় অশেষ ধনীব্যক্তি ইহার সভ্য ছিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথ বাবুর মৃত্যুর পর ইহা এক প্রকার মৃত্যুদশায় পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় সভাটি জর্জ্জ টমসনের প্রতিষ্ঠিত নব্যবঙ্গের 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'। এইরূপ প্রশ্ন উঠিল উক্ত উভয় সভাকে মিলিত করা যায় কিনা? রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির উদ্যোগে ও উৎসাহে অবশেষে ঐ সম্মিলন-কার্য্য সমাধা হইল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর দিবসে এক সাধারণ সভা আহূত হইয়া উক্ত উভয় সভা সম্মিলিত করিয়া বর্ত্তমান 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান' স্থাপিত হইল। তাহার প্রথম কমিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যাইবে ঐ সভার উদ্যোগকারীগণ কিরূপ সকল শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে সমবেত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উক্ত সভায় প্রথম কমিটিভুক্ত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা নিম্নে দিতেছি:

রাজা রাধাকান্ত দেব—সভাপতি
রাজা কালীকৃষ্ণ দেব—সহ সভাপতি
রাজা সত্যশরণ ঘোষাল
বাবু হরকুমার ঠাকুর

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর
„ রমানাথ ঠাকুর
„ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
„ আশুতোষ দেব
„ হরিমোহন ঘোষ
„ রামগোপাল ঘোষ
„ উমেশচন্দ্র দত্ত (রায়বাগান)
„ কৃষ্ণকিশোর ঘোষ
„ জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়
„ প্যারীচাঁদ মিত্র
„ শম্ভুনাথ পণ্ডিত
„ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সম্পাদক
„ দিগম্বর মিত্র—সহ সম্পাদক।

'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান'এর প্রতিষ্ঠা এই যুগের একটি প্রধান ঘটনা। সভাটি স্থাপিত হইবামাত্র ইহার শক্তি সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন। ইংরাজ রাজপুরুষগণ দেখিলেন দেশীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ আপনাদের অভাব গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনিবার জন্য এবং দেশীয়গণের স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এদেশীয়দিগের প্রতি তাঁহাদের যে উপেক্ষার ভাব ছিল তাহা তিরোহিত হইতে লাগিল। দেশের লোকেও জানিল, তাহাদের হইয়া বলিবার লোক দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং সকল শ্রেণীর দৃষ্টি এই নবপ্রতিষ্ঠিত সভার, দিকে আকৃষ্ট হইল। লোকে আশার নয়নে ইহাকে দেখিতে লাগিল। একথা এখানে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সে সময়ে সে আশা প্রচুর পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছেন। যখন দেশের লোকের হইয়া বলিবার কেহই ছিল না, তখন তাঁহারাই একমাত্র মুখপাত্র ছিলেন। লোকের হইয়া বলিবার ও তাহাদিগকে সর্ব্ববিধ রাজকীয় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারাই একমাত্র শক্তি ছিলেন।

সুতরাং এই সভার প্রতিষ্ঠান্তে সর্ব্বশ্রেণীর মনে হর্ষ ও আশার সঞ্চার হইল।

পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ লাখেরাজ বলিয়া কালেক্টরের কোন ভূমি বাজেয়াপ্ত করিলে, তাহার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়া স্বত্ত্বাস্বত্ত্বের বিচার প্রার্থনা করা যাইত। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট একটি আইন প্রচার করেন, তাহাতে এই নিয়ম হয় যে কয়েক জিলা লইয়া এক একজন বিশেষ কমিশনার নিযুক্ত হইবেন, তাঁহার নিকট কালেক্টরের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিবে ; এবং প্রিভিকাউন্সিলের বিচারযোগ্য স্থান ভিন্ন অন্য সকল স্থলে তিনি যে নিষ্পত্তি করিবেন, তাহা চূড়ান্ত হইবে। যে যে জিলার নিমিত্ত এই কমিশনার নিযুক্ত হইবেন, সেই সেই জিলায় দেওয়ানী আদালতের কালেক্টরের বিচারের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইবে না।

এই আইন বিধিবদ্ধ হইবামাত্র রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার ভূম্যাধিকারীদিগকে লইয়া উহার প্রতিবাদ করিলেন। গবর্ণরজেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। এখানে অকৃতকার্য্য হইয়া বিলাতে আবেদন করা হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেও তাহা গ্রাহ্য হইল না। এজন্য রামমোহন রায় অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন। কি স্বদেশে, কি ইংলণ্ড বাসকালে, উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে তিনি কোথাও ক্ষান্ত হন নাই।

পরিশিষ্ট

ঠাকুর পরিবারের বংশপঞ্জী

৩২ দেবেন্দ্রনাথ
৩৩ কন্যা দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথ বীরেন্দ্রনাথ সৌদামিনী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ
(অল্প বয়সে মৃত)
সুকুমারী পুর্ণেন্দ্রনাথ শরৎকুমারী স্বর্ণকুমারী বর্ণকুমারী সোমেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ বুধেন্দ্রনাথ
২৯ দর্পনারায়ণ
৩০ রাধামোহন গোপীমোহন কৃষ্ণমোহন হরিমোহন প্যারিমোহন
(ত্যজ্য) (ত্যজ্য) (কালা ও বোবা)
লাডলিমোহন মোহিনীমোহন
পীমোহন
৩১ হরকুমার প্রসন্নকুমার এবং আরও ছয়টি পুত্র
৩২ যতীন্দ্রমোহন শৌরীন্দ্রমোহন
৩৩ প্রদ্যোৎকুমার (দত্তক) প্রদ্যোৎকুমার